গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূৰ আৰু মুক্ত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্রম
M. A. in Bengali

প্রথম কাকত (Paper : 1)
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও কাব্য

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

প্রথম বিভাগ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— ষোড়শ শতক পর্যন্ত
দ্বিতীয় বিভাগ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— ১৬০১-১৭৫৭
তৃতীয় বিভাগ ঃ চর্যাপদ (কাহ্নপাদ ও ভুসুকুপাদের পদ;
পদসংখ্যা- ৬, ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৯, ২৩, ৪১)
চতুর্থ বিভাগ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (জন্মখণ্ড ও রাধাবিরহ)

Contributor :

Sri Ratnadip Purkayastha	Department of Bengali Digboi Mahila Mahavidyalaya

Course Co-ordination :

Prof. Pranab Jyoti Das	Director i/c, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor, Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Proof Reading & Language Editing :

Sanjay Chandra Das	Research Scholar Dept. of Bengali, Gauhati University

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor, Study Material GUIDOL

Cover Page Design :

Bhaskar Jyoti Goswami	GUIDOL

ISBN No : 978-81-928318-0-0

Reprint : May, 2016

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work be reproduced in any form, by mimeography or any other means, without permission in writing from the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning. Further information about the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning courses may be obtained from the University's office at IDOL Building, Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning by Prof. Pranab Jyoti Das, Director i/c and printed at Gauhati University Press, Guwahati-14. Copies printed 500

পত্র পরিচিতি

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও কাব্য শীর্ষক পাঠক্রমে অর্থাৎ প্রথম পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই।

এই প্রথম পত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও কাব্য। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথাগত আলোচনা শুরু করার আগে পাঠক্রমের তাৎপর্য বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আসুন আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে প্রথমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

খ্রিস্টিয় দশম শতকের দিকে মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি ভূমিষ্ঠ হল। বাংলা ভাষা এই নতুন সৃষ্ট ভাষাগুলির অন্যতম। চর্যাগানগুলির মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলাভাষার পদচারণার প্রথম সূত্রপাত। হাজার বছর আগে এক বিশিষ্ট ধর্মসাধনার ইঙ্গিত-প্রকরণ ও সাধনা পদ্ধতি ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে তা সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্র ফসল ফলিয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম-ভাবনাশ্রিত জীবনবৃত্তকে ত্যাগ করার ফলে আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য বিষয়গৌরবে ধনী হয়ে উঠল। শুধু বিষয়বস্তু নয়, পরিবর্তন সাধিত হল আঙ্গিক এবং রূপ-রীতিতেও; ছন্দ নির্ভরতার পরিবর্তে বাংলা সাহিত্য আশ্রয় গ্রহণ করল গদ্যের সাবলীলতায়। নব নব ভাব-কল্পনার প্রকাশে, নতুন নতুন প্রতিভার স্পর্শে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের শিরোপা অর্জন করল। কিন্তু সাহিত্য সময় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একক বা স্বয়ম্ভু কিছু নয়। তাই বাংলা সাহিত্যের এই বিশ্ববীক্ষা ও হাজার বছরের এই পরিক্রমায় হাজার বছরের বাঙালির জীবন ছায়াপাত করেছে, বাঙালির দেশ-কাল, সময়-সমাজ, প্রতিবেশ-পরিসর, সংঘাত-সংশ্লেষের ছাপটি মুদ্রিত হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কালপর্বের বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতিগুলির অন্তরঙ্গে ধরা পড়েছে বৃহত্তর বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, তার পালাবদলের ইতিহাস।

বস্তুত আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের যে প্রচার প্রসার ও সমৃদ্ধি তার উৎসটি নিহিত রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাপদের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চর্যাপদের যুগ থেকেই ধর্মের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল মূলত একই ধরনের। মাঝেমাঝে রাজনৈতিক অবস্থা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হলেও বাঙালির জীবনযাত্রা-প্রণালিতে কোনো বৃহত্তর পরিবর্তন আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। যে যুগে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। খণ্ডিত জীবনবোধ, সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামক্ষত মানুষের উচ্চকণ্ঠ বেদনা তৎকালীন সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

তবু, ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের দিনগুলিতেও তৎকালীন সাহিত্যে মানবতা ও জীবনমুখিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং রোসাঙ রাজদরবার কেন্দ্রিক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া অব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নানা শাখার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে বাঙালির ধ্যান ও সাধনা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির সমগ্র চেতনা-প্রবাহ ধরা পড়েছে। বাঙালি জাতি বা বাংলাসাহিত্য নিরালম্ব বা স্বয়ম্ভু নয়। অতএব, আমাদের আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন। আর এই আত্মানুসন্ধানের মানদণ্ডেই আমাদের আলোচ্য পাঠক্রমের উপযোগিতা। এই উদ্দেশ্যে আমরা ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসের এই বিশাল কালপর্বকে দুটি অধ্যয়ে বিভক্ত করেছি। আসুন, এবার আমরা এই পত্রে অন্য দুটি অধ্যায়ের বিষয় আলোচনা করব।

আমাদের এই প্রথম পত্রের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি নিদর্শন পাঠ্যতুলিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে পাঠক্রমের তাৎপর্য বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আমারা কেন পড়ব? আমরা প্রথমেই এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যায় যে, আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের যে প্রচার, প্রসার ও সমৃদ্ধি তার উৎসটি নিহিত রয়েছে মূলত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যেই। প্রাচীনযুগের একমাত্র সাহিত্যিক নির্দশন চর্যাপদের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চর্যাগানগুলি নিয়ে বাংলা সাহিত্য যখন থেকে আপন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল তখন থেকেই ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল মূলত একই ধরনের। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু বাঙালির জীবনযাত্রা-প্রণালিতে কোনো গুরুতর পার্থক্য আসেনি। আমাদের প্রাচীন গ্রামবিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস, শ্রেণি ও বর্ণবিন্যাস, শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সমস্তই গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের নিশ্ছিদ্র প্রভাব সমাজজীবনের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না, বংশকৌলীন্য ও ধর্মীয় কুসংস্কারের মোহে ব্যক্তিত্বের চরম লাঞ্ছনাও সহানুভূতি আকর্ষণ করত না, তাই সে যুগে কালকেতু হওয়ার কোনো অপরাধ নেই, কিন্তু চাঁদ সওদাগর হলে জীবনে সাফল্য অর্জন অসম্ভব। খণ্ডিত জীবনবোধ, সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামক্ষত মানুষের উচ্চকণ্ঠ যে-বেদনা তৎকালীন সাহিত্যে ধরা পড়েছে, ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তা অটল ছিল।

তবে এই পটভূমিতেও বাংলা সাহিত্যে যে কয়টি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তা আমরা এভাবে সূত্রাকারে উল্লেখ করতে পারি—

(ক) অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি,

(খ) ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ,

(গ) ধর্মাশ্রয়ী হলেও তৎকালীন সাহিত্যে মানবতা ও জীবনমুখিতা স্পষ্ট,

(ঘ) ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য।

তাছাড়া অব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নানা শাখার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

উপর্যুক্ত কথাগুলি এইজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এই সমস্ত সমন্বয় ও সংঘাত— সংশ্লেষের ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। সৎ সাহিত্য কখনওই দেশ-কাল-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাঙালি জাতির হাজার বছরের সামগ্রিক ইতিহাস সেই সময়ের সাহিত্যে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। বাংলা সাহিত্য বা বাঙালি জাতি নিরালম্ব বা স্বয়ম্ভূ নয়। আমাদের আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনার প্রয়োজন। আর এই আত্মানুসন্ধানের মানদণ্ডের ওপরেই আমাদের আলোচ্য পাঠক্রমের উপযোগিতা নির্ভর করছে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশাল সাহিত্য-সম্ভার থেকে বিভিন্ন সময়সীমায় রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে দুটি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করেছি। আসুন, আমাদের এই প্রথম পত্রের অধ্যায়গত বিন্যাসটি দেখে নেওয়া যাক—

প্রথম বিভাগ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ষোড়শ শতক পর্যন্ত

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৬০১-১৭৫৭

তৃতীয় বিভাগ ঃ চর্যাপদ (কাহ্ন ও ভুসুকুপাদেব, পাদসংখ্যা- ৬, ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৯, ২৩, ৪১)

চতুর্থ বিভাগ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য (নির্বাচিত অংশ জন্ম এবং বিরহখণ্ড)

বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত সমালোচক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনার শেষে সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির তালিকা সংযোজিত হয়েছে। যেহেতু সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থ আমরা সরবরাহ করতে পারছি না, তাই আশা করব এগুলি আপনারা নিজে সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। বক্ষ্যমাণ পত্রে আলোচনা সংক্ষিপ্তির অনুরোধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা বা বিষয়ের উল্লেখযোগ্য রচনাকার এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতিই শুধু আলোচিত হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পঠন বিভাগের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর (Home Assignment) বাড়ি থেকে তৈরি করে পাঠাতে হবে। আপনাদের সুবিধার্থে প্রত্যেক উপবিভাগেই প্রশ্নের তালিকা সুযোজিত হয়েছে।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে তবু এই উপকরণের অতিরিক্ত পাঠ, আপনাদের নিজস্ব সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রথম বিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— ষোড়শ শতক পর্যন্ত

বিষয় বিন্যাস ঃ

১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ জয়দেব, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১.৩ চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য

- ১.৩.১ মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের অবদান ও প্রভাব
- ১.৩.২ বৈষ্ণব সাহিত্য
  - ১.৩.২.১ চৈতন্য জীবনী
  - ১.৩.২.২ বৈষ্ণব পদাবলি

১.৪ অনুবাদ সাহিত্য

- ১.৪.১ রামায়ণ
- ১.৪.২ মহাভারত
- ১.৪.৩ ভাগবত

১.৫ মঙ্গলকাব্য

- ১.৫.১ মনসামঙ্গল
- ১.৫.২ চণ্ডীমঙ্গল

১.৬ সংক্ষিপ্ত টীকা

১.৭ আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার

১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা

১.৯ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস, এমনকি দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যেও সংস্কৃত প্রভাব ছায়াপাত করেছে। যদিও চর্যাপদেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সূচনা, তবু চর্যার সমকালে বা তৎপূর্বে বাংলাদেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গটিও অল্পবিস্তর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

খিস্টিয় দশম শতক বা তার অল্প কিছুকাল পূর্বে মাগধী অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ করে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। এই অপরিণত ভাষা সাহিত্যকর্মেও কিছু কিছু ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য উৎপত্তির আগে থেকেই সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় বাঙালি সাহিত্যচর্চা করেছে। আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বাংলাদেশে অদ্যাবধি বহমান। তবে প্রাচীন বাংলায় সেনযুগের পূর্বে বিশুদ্ধ সাহিত্যের বেশি নিদর্শন পাওয়া যায় না।

সেনযুগে, বিশেষত লক্ষ্মণসেনের সভায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হয়েছিল - জয়দেবগোষ্ঠী তার প্রমাণ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও সংস্কৃতে লিখিত, কিন্তু পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই কাব্যের প্রভাব বহুদূরবিস্তারী। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হবার পর প্রায় দুই শতাব্দী (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ) ধরে বাংলা সাহিতের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশে তুর্কি-বিজয়। পরবর্তী কালে মধ্যযুগেও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিচাবে আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটিকে পাই।

তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী প্রায় তিনশত বৎসর ব্যাপী সঞ্চিত গ্লানি এবং অপমানের অন্ধকারে থেকে উদ্ধার করে মধুময় বৈষ্ণব পৃথিবীর উদার পরিমণ্ডলে বাঙালি সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে যিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন— তিনি শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে বাঙালির সমাজজীবনে অস্থিরতার দিনগুলিতে জাতি একদিকে দিশাহারা পর্যুদস্ত; অন্যদিকে ইসলাম কর্তৃক ধর্মান্তরিত করণের প্রাবল্য হিন্দু সমাজ বিপন্ন। এই অরাজক অবস্থায় মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে জাতিকে উদ্ধার করে নবজীবন দান করেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যের সমকালে ব্রাহ্মণ্য পথাশাসিত সমাজে উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির মানুষেরা ছিলেন ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও আত্মরক্ষার তাগিদে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি ও ব্যবহার-শাসনের মাধ্যমে যে নব্যন্যায় সমাজে আরোপ করা হয়েছিল, তা শুধু স্বশ্রেণির সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। ধর্ম তখন একটি মাত্র বর্ণের সেই সাধারণ মানুষরা রক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিতই হয়নি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সামাজিক সংহতির সম্ভাবনা সেদিন ছিল না, অবশ্য বর্ণভিত্তিক সমাজে সামাজিক সংহতি সম্ভবই নয়, কারণ ধর্ম সেখানে অনুপস্থিত। বৈষ্ণবেরা একেই বলেছেন ধর্মপরাভব বা ধর্মের প্রবলতা। এই সামাজিক অচলাবস্থা, বৌদ্ধিক শুষ্কতা, ব্যবহাররসে মত্ত জীবনচর্যার মত্ত জীবনচর্যার বিরুদ্ধেই চলিষ্ণু, হৃদয়ধর্মী, মানবমুখীন প্রতিবাদী যে ভক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের আত্মপ্রকাশ সমস্ত ভারতবর্ষে;— বাংলাদেশে চৈতন্য, সেই আন্দোলনের আদর্শ ছিল এক সার্বিক কল্যাণবোধ, মানবতার চেতনা। সমস্ত বর্ণগত, শ্রেণিগত, সম্প্রদায়গত এবং ধর্মগত বিরোধ অতিক্রম করে চৈতন্য আনীত এই আন্দোলন মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকের বাঙালির ইতিহাস এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

স্মার্ত - বিধিকৃত নঞর্থক ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈষ্ণবেরা ধর্মীয় সামাজিক অর্থে সদর্থক ও প্রগতির সহায়ক এক মতাদর্শরূপে ভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উদারতা ও মানবিকতা ছাড়া ধর্মের গ্লানি করা অসম্ভব। স্মার্ত প্রায়শ্চিত্ত নয়, ভক্তির জোরেই পাপস্খালন হয়, - বৈষ্ণবেরা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলেন এবং এই প্রথম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভক্তিতত্ত্বে প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছিল, মানুষের জীবনের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। ভক্তি, উপাস্য দেবতার সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্যোতনা বহন করে। তাতে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য নেই। মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান—

এই ছিল ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত। চৈতন্য ও তাঁর পরিকরগণ মূলত ভাগবতের আদর্শ অনুসরণ করে শাস্ত্রের নিষ্প্রাণ বিধান ইত্যাদির পরিবর্তে সহজ প্রেমের আদর্শ তুলে ধরলেন এবং জীবনগানে তাকে মেলাতে চাইলেন। জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি ও উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সামাজিক অচলায়তনকে এই প্রেমের পথেই তাঁরা মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সর্বপ্রকার সামাজিক গ্লানি, ভেদবিচার ও হিংসাদ্বেষের স্পর্শ থেকে মুক্তির পথ, বিবদমান ধর্মমতগুলির পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের পথও ছিল তাঁদের কাছে এই প্রেমেরই পথ।

তাই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি একটি নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছিল। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরবৃন্দকে অবলম্বন করে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজে নবজাগরণ ঘটেছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সৃষ্টিকর্মের প্রধান ধারাগুলির অন্যতম হচ্ছে অনুবাদ সাহিতের ধারা। অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদেশের উন্নত সৃষ্টি ঐতিহ্যের অসাধারণ নিদর্শনগুলির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় হয়েছে এবং একই সঙ্গে আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার ক্লাসিক মর্যাদায় গৌরবান্বিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকেই এদেশে ইসলাম রাজশক্তির আনুকূল্যে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়। মহাভারতের প্রথম যুগের জনৈক অনুবাদক জানিয়েছেন মুসলমান রাজারা রামায়ণাদির গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। একসময়ে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মমুখী কাব্যগ্রন্থ চর্চার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের সমাজ-নেতারা এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে দুশো বৎসর ব্যাপী পাঠান শাসনে বাংলার হিন্দু সমাজে যে ভাঙন ধরেছে সেই দুর্গতির হাত থেকে হিন্দু-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনকে অতিক্রম করতে হবে এবং সমাজের সর্বত্র পৌরাণিক সাহিত্যগুলির আদর্শ, নীতি ও তত্ত্ব প্রচার করতে হবে। এভাবেই রামায়ণাদি অনুবাদের সম্ভাবনা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছিল। আর এ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল গৌড়ের আবাঙালি রাজন্যবর্গের উৎসাহ ও বদান্যতায়।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ সাহিত্যের শাখার মতো আরও একটি সমৃদ্ধশালী শাখা হ'ল মঙ্গলকাব্যের ধারা। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক লৌকিক সংমিশ্রিত লীলামাহাত্ম্য-ব্যাপক সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলিই মঙ্গলকাব্য বলে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের লিখিত রূপ পঞ্চদশ শতকের আগে পাওয়া না গেলেও ত্রয়োদশ শতক থেকেই মেয়েলি ব্রতকথায় মঙ্গল দেবতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে আর্য আগমনের পর এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা অনার্যগোষ্ঠীগুলির আর্যিকরণের প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে একটি নবোৎপন্ন মিশ্র সংস্কৃতির সাহিত্যিক নিদর্শন এই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল দেব-দেবীরা মূলত অনার্যগোষ্ঠীর দেবতা। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী, যিনি কিনা অনার্য অঁরাও গোষ্ঠীর চাণ্ডিবোঙ্গা; নাগম্মা, মঞ্চাম্মা— যিনি বাংলাদেশের সর্পভীত আর্যেতর জনগোষ্ঠীর সর্পদেবতা; কৃষকদের আরাধ্য লৌকিক 'বাবা শিব', রাঢ়ভূমির লোকজীবনে পূজিত ধর্মঠাকুর, এই আর্যিভবনের

প্রক্রিয়ায় আর্যগোষ্ঠীর দেবতা, যথাক্রমে— মহামায়া, মনসা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেন।

এই সমস্ত দেবতার পূজা মাহাত্ম্যের জন্য প্রচারিত অপৌরাণিক, লৌকিক, পাঁচালি কাব্যগুলির 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণটি যথার্থ কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। যদিও বহু ব্যবহারে 'মঙ্গলকাব্য' নামটিই সাহিত্যসমাজে গৃহীত হয়েছে। মঙ্গল রাগের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বা দ্রাবিড় প্রভাব থেকে মঙ্গল নামটি এসেছে— এরূপ ধারণা এই নামকরণ প্রসঙ্গে অসঙ্গত নয়। আবার জনবিশ্বাস অনুযায়ী এইসব দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্যকীর্তন এমনকি শ্রবণেও মঙ্গল হয়। যে কাব্য মঙ্গলাধার তা ঘরে রাখাও মঙ্গলের, আর বিপরীতটি অমঙ্গলের, আর তাই এসব দেবতায় বিশ্বাস-ভক্তি স্থাপন করলে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ঘটে— এই অর্থেই 'মঙ্গলকাব্য' নামটি সর্বজনীনতা লাভ করেছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ শাসনাবসানে হিন্দু সমাজের পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয় তুর্কি আক্রমণ, এই আক্রমণে বিমূঢ় বাঙালি জাতি হারাল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সমাজ নৈতিকতায় দেখা দিল চূড়ান্ত অবক্ষয়। বিদ্ধস্ত মানুষ এই অরাজক অবস্থায় আশ্রয় চাইছিল এক মহাশক্তির, যিনি মৃতকল্প জাতিকে রক্ষা করবেন। শক্তিসম্পন্ন এই দেবতাকে অতএব হতে হবে ক্রুর প্রতিহিংসাপ্রবণ, আবার যিনি দান করবেন বরাভয়, ভক্তের প্রতি হবেন প্রসন্ন। তুর্ক-বিজয়ের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সময়ে সাধারণ বাঙালি জীবনের স্বল্পতম দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য-চাহিদারই আন্তর অভীপ্সা মূর্ত হয়ে উঠেছে মঙ্গল দেব-দেবীদের রূপায়ণে। তারা তখন শরণ চাইছিল এমন শক্তিধর দেবতার, যিনি ভক্তের কাছে বরাভয় মূর্তিতে হাজির হবেন, আবার ভক্তের কল্যাণের জন্য ভক্তের শত্রুর বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করবেন— শরণাগতকে করবেন ত্রাণ। তুর্ক-বিজয়ের পরবর্তী সামাজিক- রাষ্ট্রীয়- রাজনৈতিক অস্থিরতার সন্ধিক্ষণে ইসলামের ধর্মীয় সর্বগ্রাসিতার প্রবলতর দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাচ্যুত অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রধানদের সৃষ্ট সংস্কৃতি প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে বাঙালি হিন্দু একটা সংহত জাতি হিসাবে দেখা দিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আপোস-সমন্বয়ের ফলে পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটে। সমাজে পৌরাণিক প্রভাব গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলে লৌকিক দেবতাদের আর্যিকরণ ঘটতে লাগল, ফলে মঙ্গল দেবদেবীরাও জাতে উঠলেন, অনার্য ব্যাধ জাতির দেবতা চণ্ডী ক্রমে শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। আর্যমণ্ডল বহির্ভূত সর্পদেবী মনসা সমন্বয়ের যুগে শিবের মানসকন্যা হিসাবে প্রচারিত হলেন, অপৌরাণিক পুরুষ দেবতা ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর সামীপ্য লাভ করলেন। অনার্য কুলসম্ভব এ সব মঙ্গল দেবদেবীর সঙ্গে উচ্চ দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, মোক্ষমুক্তি দানে তাঁদের আগ্রহ নেই। ইহলোকে সুখ, ভোগ অন্তে বৈকুণ্ঠ-গমন— যে বৈকুণ্ঠ রূপে সম্পদে মর্ত-পৃথিবী থেকে উন্নততর এক ভোগপুরী মাত্র। পার্থিব অভাব অভিযোগ দূর করা, ভয়ভীতি নিবারণ করা, বাস্তব কামনাবাসনা চরিতার্থ করাই এই দেবতাদের সার্থকতা। এ সব দেবদেবী একান্তভাবেই মনুষ্যলক্ষণে পুষ্ট। হিংসা-ঈর্ষা-প্রবৃত্তির তাড়না, দারিদ্র্য-দুঃখ জর্জরিত তাঁদের

স্বাভাবিক মানবিক পরিচয় দেবত্বের স্বচ্ছ আবরণে সর্বাংশে আবৃত হয়নি।

মঙ্গলকাব্যের বিষয় এবং গঠনপদ্ধতিগত ঐক্যের ফলে মঙ্গলকাব্য একটা প্রথানুগ কাব্যরীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চদশ শতকেই। মঙ্গলকাব্যের লোকভিত্তি, পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ, মানবিক স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলাদেশের মৌলিক আখ্যানধারা হিসাবে পরিচিত মঙ্গলকাব্যে ঘটনার বিন্যাসে, সংঘাতে, চরিত্রচিত্রণে যুগোচিত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ ছবি পাওয়া যায়। আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সমাজচিত্রকে কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করা ছিল কবিদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় রীতি। এ ছাড়াও নারীগণের পতিনিন্দা, বারোমাস্যা, চৌতিশা ইত্যাদিও ছিল মঙ্গলকাব্যের রীতিগত বৈশিষ্ট্য। দেবখণ্ডে কাহিনির আরম্ভ। সেখানে পুরাণ ও লোককথার মিশ্রণ দেখা যায়। মর্তে পূজাপ্রাপ্তির জন্য মঙ্গলদেবতা কর্তৃক স্বর্গের কোনো অধিবাসীকে শাপদান ও মর্তে প্রেরণ। তারপর নরখণ্ডের শুরু— এখানে পাপস্খালন এবং দেবতার পূজা প্রচারের পর শাপমুক্তি এবং পুনরায় স্বর্গারোহণের মাধ্যমে কাহিনির সমাপ্তি।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের এই বৃহৎ ধারা নানা শাখায় বিস্তার লাভ করেছিল। সাধারণত চণ্ডী, মনসা এবং ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের মানদণ্ডে রসোত্তীর্ণ এবং অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল বলে এই তিনটি শাখাই মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা হিসাবে গণ্য। তবে ভারতচন্দ্রের শিল্প-সাধনায় অন্নদামঙ্গল বিশিষ্টতার গৌরব অর্জন করেছে। যাইহোক, আমাদের এই অধ্যায়ে পঞ্চদশ শতিক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যধারার কবি ও কাবের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

প্রাচীনযুগ বা আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের যাত্রারাম্ভ। চর্যপদ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ।

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার বাঙালি কবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কেন্দ্রিক বিলাসকলা ধারার অনুবর্তন চলেছে বহুকাল, অন্তত চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। বড়ু চণ্ডীদাসও জয়দেবেরই উত্তরসূরি। তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও জয়দেবীয় বিলাসকলারই অনুবর্তন ঘটেছে। আমরা এই অধ্যায়ে জয়দেব, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাধ্যমে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের আদি-পরিচয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করব। সংস্কৃত ভাষার কবি হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের অন্তর্ভুক্তির কারণ অনুসন্ধান করব এবং অনুসরণ করব প্রাচীন যুগ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের রূপরেখা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ষোড়শ শতাব্দীকে ঐশ্বর্যযুগ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। পঞ্চাদশ শতকের শেষে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে

নবগৌরব লাভ করল। চৈতন্য-আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে অনেক নতুন বিষয় যুক্ত হয়, বাংলা সাহিত্য বিবিধ বিচিত্র নতুন ধারায় গতিশীল হয়ে উঠল।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবর্তনের রূপরেখাটি অনুসরণ করব, অনুধাবন করব চৈতন্যাবদানের স্বরূপ, পরিচিত হব চৈতন্য- আবির্ভাবের ফলশ্রুতিজাত বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারা চৈতন্যজীবনের সঙ্গে, বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের প্রধান পদকর্তাদের কাব্যকৃতির স্বরূপটিও আমরা এই পর্বে উদ্‌ঘাটন করব।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান শাখা অনুবাদ সাহিত্যেরে ধারা। অনুবাদের বাঙালি পাঠক এদেশের উন্নত সৃষ্টি-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সর্বভারতীয় পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শ বাঙালির মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টায় উচ্চমার্গের নেতৃত্বে অনুবাদের ধারাটি উদ্ভূত হল। প্রধানত রামায়ণ মহাভারত ও কিছু ভাগবতের অনুবাদই বেশি হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে অনুবাদ সাহিত্যের ধারাটিকেও অনুসরণ করব, অনুসন্ধান করব অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরঙ্গ কারণ পরিচিত হব রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের প্রণিধানযোগ্য অনুবাদকদের রচনাকৃতির সঙ্গে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য সাধারণভাবে এদেশে আর্য আগমনের পর অনার্য গোষ্ঠীগুলির আর্যিকরণের ফলশ্রুতিতে জাত এক মিশ্র সংস্কৃতির সাহিত্যিক ফসল। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালি জাতির অবক্ষয় ও দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিহাসকে মঙ্গলকাব্যগুলি ধরে রেখেছে।

আমরা এই অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হব। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের প্রেক্ষাপটটিও আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পর্যায়ে আমরা বিশিষ্ট রচনাকারদের কাব্যকৃতির পরিচয়টিও গ্রহণ করব, মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক উপধারার বিশিষ্টতার প্রসঙ্গটিও আমরা আলোচনা করব।

১.২ জয়দেব, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার বাঙালি কবি। তিনি সংস্কৃত কবি হলেও উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর রচনার প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এখন আমরা কবি জয়দেব সহ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

জয়দেব ও বাংলাসাহিত্য ঃ

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার কবি, লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন। বাঙালি সারস্বত সাধনার ইতিহাসে তিনি উমাপতিবধর, শরণ, গোবর্ধন আচার্য ও ধোয়ীর সতীর্থ

ছিলেন। এঁরা সকলেই সংস্কৃত ভাষার বাঙালি কবি, কিন্তু জয়দেব বাংলা সাহিত্যের কবি, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে রচিত তাঁর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের যুগের বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। জয়দেব প্রধানত তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করেছেন।

জয়দেবের পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে ভোজদেব এবং বামাদেবী, তাঁর জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রাম। বীরভূম জেলার অজয় তীরবর্তী কেঁদুলি গ্রামের ঐতিহ্য এ বিষয়ে সুপ্রাচীন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে - বিহারে এবং ওড়িশার পুরীর কাছে কেন্দুলি বা কেন্দ্রবিল্ব গ্রামের দাবি ক্রমশ উপস্থাপিত হয়েছে। অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার কেন্দুল গ্রামও একসময়ে জয়দেবীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল।

কবির ব্যক্তি পরিচয়ের পরে এবার আমরা তাঁর কাব্য পরিচয় সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে পারি। জয়দেব রাজসভার কবি, তিনি কাব্য রচনা করেছেন। দেবভাষায় অর্থাৎ সর্বভারত স্বীকৃত সংস্কৃত ভাষায়। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। ভাষার দিক থেকে জয়দেবের কাব্যে বাংলা সাহিত্যের জীবনধারার বলিষ্ঠতর রূপ প্রত্যাশা করা হয়তো ঠিক হবে না, কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তরঙ্গে মনোলোকে তাঁর চিরকালীন প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুবর্তী ভক্তচিত্তের অনুরাগসূত্রে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি এবং অপরাপর বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে চৈতন্যদেব জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' আস্বাদন করতেন, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'তে জানিয়েছেন —

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।'

এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় অভিন্নতর হয়ে পড়েছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এই বৈষ্ণব সাহিত্যের অচ্ছেদ্য শোভা-সম্পদ। তাই প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলির শিরোভূষণ হিসাবেই বাংলা পদাবলি, তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি জয়দেবের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রবেশ।

'গীতগোবিন্দ' আদিরসাত্মক, পদাবলি সাহিত্যের প্রধান উপাদান এই আদিরস। জয়দেবের কাব্যে দেখা যায় কৃষ্ণকে সখীগণের সঙ্গে বিহার করতে দেখে রাধার অভিমান হয় এবং তিনি অন্যকুঞ্জে অবস্থান করেন। মান-অভিমানের এই যে মধুর বিরহ-মিলন, এতে 'গীতগোবিন্দ'র একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত। 'গীতগোবিন্দ'তে প্রতিষ্ঠিত এই লৌকিক মান-অভিমান, মিলন-বিরহের ধারা বৈষ্ণব পদাবলির বুকে স্বর্গীয় সুরভিত সুন্দর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ'ই বৈষ্ণব পদাবলির সূতিকাগার। বিশিষ্ট সমালোচক তাই যথার্থই বলছেন, 'মেঘদূত যেমন অজস্র কবিকে 'দূত' কাব্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে গীতগোবিন্দও তেমনি অসংখ্য কবিকে 'গীত' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।'

'গীতগোবিন্দ' যেন আদি অন্ত রহিত তুষারাবৃত বিশাল ভূমি। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্রোতধারা এই তুষারগলা জলে পরিপুষ্ট হয়ে বিপুল বেগে কুলপ্লাবী বন্যায় দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। তাই দেখি সুদূর অতীতে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে আধুনিক কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সর্বত্রই 'গীতগোবিন্দ'র মধুরকোমলকান্তপদাবলির সুকোমল সুরটি অপূর্ব সুরমূর্ছনায় গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাঠামোটি গড়ে উঠেছে 'গীতগোবিন্দ'র ভাবসম্পদকে কেন্দ্র করেই। কেবল ভাব নয়, মাঝে মাঝে বড়ু চণ্ডীদাস 'গীতগোবিন্দ'র অনেক অংশকেই ভাষান্তরিত করে আপন কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন। যে পদাবলি সাহিত্য বাঙালির চিত্তভূমিকে দীপালোকের মতো মনোরম আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল করে তুলেছে, এই 'গীতগোবিন্দ'ই তার উৎসভূমি।

বাঙালি চিত্তের সঙ্গে 'গীতগোবিন্দ'র সুরধারার যে ঐকান্তিক যোগ আছে তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ এই যে, একমাত্র 'গীতগোবিন্দ' প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলা সাহিত্যকে এবং বাঙালি মানসভূমিকে রসের অফুরন্ত ধারায় সঞ্জীবিত এবং গীতস্পন্দনে আন্দোলিত করে আসছে। এর মধ্যে প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তা এই শ্যামল বাংলারই, যে নদীর বিবরণ পাওয়া যায় তাও এই নদীমাতৃক বাংলাদেশেরই। ভাব এবং বর্ণনার দিক থেকে 'গীতগোবিন্দ' সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের সমগোত্রীয়।

গভীরতর ভাবস্বরূপের সন্ধান ছেড়ে কেবল বাহ্য রূপশৈলীর বিচার করলেও দেখা যাবে, জয়দেবের ভাষাভঙ্গি সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্রের অনুসারী হলেও অন্তরঙ্গে তা বাংলা ভাষা শৈলীর সমান স্বভাবযুক্ত। 'গীতগোবিন্দ'র সংস্কৃতের মধ্যে অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির পরিমাণ এত কম যে এর ভাষা মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাংলা পদ বলেই ভ্রম হয়। বস্তুত জয়দেবীয় রচনায় এই অসংস্কৃত স্বভাব লক্ষ করে পণ্ডিতদের কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কবি আসলে তাঁর কাব্যটি সমসাময়িক বাংলাদেশে প্রচলিত 'প্রাকৃত' ভাষায়ই রচনা সংস্কৃত রূপান্তরিত করেন। ড° সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'গীতগোবিন্দ'র পদাপলি অংশ মূলত প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হওয়ার সম্ভাবনার উপরেই জোর দিয়েছেন। অতএব ভাষাগত বিচারে জয়দেবের পদাবলি যে পরিমাণে সংস্কৃত, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে সদ্যজাত বাংলা সাহিত্যেরই স্বধর্ম বিশিষ্ট — এ কথা মনে করতে বাধা নেই।

'গীতগোবিন্দ'র ছন্দ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে এ ছন্দ সংস্কৃত অনুগামী নয়, এই কাব্যের ছন্দ পাদাকুলক। এই পাদাকুলক ছন্দ থেকে পরবর্তীকালের বাংলা কব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছন্দ পয়ারের উৎপত্তি। সংস্কৃতের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে লোকভাষার মাত্রাবৃত্ত ছন্দই জয়দেব গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যে। পয়ার ছাড়া বাংলা কাব্যের আর একটি বলিষ্ঠ ছন্দ ত্রিপদী— তারও পূর্বাভাস 'গীতগোবিন্দ'তে সূচিত হয়েছে। এ ছাড়া আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জয়দেবের কাব্যে প্রতি চরণে যে অন্ত্যমিল দেখা যায় তা সংস্কৃত পাওয়া যায় না। এই অন্ত্যানুপ্রাস বাংলা কাব্যছন্দের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি এবং রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিপ্রধান কবিতাবলির সঙ্গে জয়দেবের কবিতার এক নিকট সম্পর্কও অদ্ভুত মিল লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপে জয়দেবের 'বদসী যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী'— এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছে এ কি সন্ন্যাসী।" এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়— সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘস্বর 'দ্বিমাত্রিক' হয় না কিন্তু প্রাকৃতে এবং বাংলায় তা হয়। সংস্কৃতে রচিত 'গীতগোবিন্দ'র বহুস্থানেই এই দ্বিমাত্রিক স্বরের প্রকাশ ঘটেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাব, ভাষা, ছন্দ সকল দিক দিয়েই 'গীতগোবিন্দ'তে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যেগুলি একান্তভাবেই প্রাচীন বাংলা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন বাংলার পালাগান এবং মঙ্গলকাব্যের— কিছু গান, কিছু বর্ণনা কিছু, কথোপকথন এই ত্রিবিধ আঙ্গিক বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে 'গীতগোবিন্দ'তে যে পালাগানের রূপ ফুটে উঠেছে তা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। পরবর্তীকালে বাংলার লোকজীবনে যে পালাগানের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল 'গীতগোবিন্দ' থেকে তার সূত্রপাত। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর মানবায়িত রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বীজও 'গীতগোবিন্দ'র বুকেই নিহিত। এ ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লৌকিক আলৌকিকের যে নিরন্তর সংমিশ্রণ দেখা যায় 'গীতগোবিন্দ'তেই তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছে।

চর্যাপদ ঃ

বাংলা সহ আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবার গ্রন্থগার থেকে আরও কয়েকটি পুথির সঙ্গে চর্যাপদের একটি পুথি আবিষ্কার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃত পুথির অনুসন্ধানী গবেষক। এই গ্রন্থগুলি পেয়ে এগুলির ভাষা প্রাচীন বাংলা বলে মনে হয়েছিল তাঁর। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'— এর পুথি ছাড়া তালপাতায় লেখা আরো দু'খানি প্রাচীন পুথি পেয়েছিলেন তিনি— সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যের নামে দুটি দোহাকোষ। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এগুলির সঙ্গে পূর্বাবিষ্কৃত ডাকার্ণবের গ্রন্থটি সম্পাদনা করে হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে একটি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত করেন শাস্ত্রী। ডাকার্ণব সম্পর্কে একটু সংশয় প্রকাশ করলেও বাকিগুলোর ভাষা প্রাচীন বাংলা বলেই দাবি করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার শেষে একমাত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' - এর ভাষাকেই প্রাচীন বাংলা বলে স্বীকার করেছেন।

চর্যার গ্রন্থাবিষ্কারের পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গবেষণার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হল। এর আগে পণ্ডিতদের অনুমান ছিল ডাক ও খনার বচন, নাথধর্মের গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী- গোপীচন্দ্রের গান, প্রাচীন প্রবাদ-প্রবচন এগুলিই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা গেছে শূন্যপুরাণ, গোপীচন্দ্রের গান কিংবা লোকগাথা-রূপকথাগুলির যে ভাষাছাঁদ, তা কোনো অবস্থাতেই

সপ্তদশ শতকের আগের নয়। অতএব চর্যাপদই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের সটীক পুথি আবিষ্কার করলেও টীকাকারের নাম তিনি জানতে পারেননি। পরবর্তীকালে চর্যাপদের পুথিটির একটি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী। এই অনুবাদ থেকে জানা গেল চর্যার পুথিটি গীতিসংগ্রহ নয়, মূলত টীকার পুথি, গ্রন্থে সংস্কৃত টীকা যিনি প্রস্তুত করেছেন, তাঁর নাম মুনিদত্ত।

চর্যাপদের পুথিটির প্রকৃত নাম কী ছিল, এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ করা গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথিটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ঃ' বলে উল্লেখ করেছেন। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ এই নাম গ্রহণ করেননি। ড. বাগচী তিব্বতি অনুবাদ পাঠ করে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামটি গ্রহণ করেছেন। এই সমস্যা তৈরি হয়েছে একারণেই যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথির ভেতর কোথাও কোনো নাম ছিল না। তবে নেপাল রাজদরবারে রক্ষিত পুথির আবরণে চর্যাচর্যনিশ্চয় নামটি লেখা ছিল। ড. সুকুমার সেনের মতে শুদ্ধ নামটি হবে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'।

অন্যদিকে জানা যায় মুনিদত্ত রচিত গ্রন্থের নাম চর্যাগীতিকোষবৃত্তি। টীকার নাম যদি চর্যাগীতিকোষবৃত্তি হয় তবে মূল গ্রন্থের নাম হবে চর্যাগীতিকোষ। তবু কোনো স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় গবেষকরা গ্রন্থটির নাম হিসাবে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন। সংক্ষেপে এগুলিকে চর্যাপদ বলা হয়। চর্যার গানগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচার আচরণ নির্দেশক গ্রন্থ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদের সটীক পুথিটির শেষে গীতিসংখ্যা ৫০ হলেও পঞ্চাশটি সম্পূর্ণ পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ। পুথির তিনটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি পুরো এবং একটি পদের শেষাংশ পাওয়া যায়নি। ড. সুকুমার সেনের মতে পদসংখ্যা ৫১; একটি পদের কোনো টীকা মুদিদত্তও তৈরি করেননি। চর্যাপদের মোট কবি সংখ্যা ২৪ জন। ২৪ জন কবির অধিকাংশই শৈব নাথধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কথিত চুরাশি সিদ্ধার অন্যতম 'সিদ্ধা' বা গুরু। ভণিতায় অধিকাংশ কবি নিজের নাম লিখে গেছেন। কারো কারো ভণিতায় গৌরবসূচক 'পা' শব্দটি প্রযুক্ত। প্রধান পদকর্তারা হলেন কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, সরহপাদ, শবরপাদ ও লুইপাদ। এদের মধ্যে কাহ্নপাদ সর্বাধিক ১৩ টি পদ রচনা করেছেন।

চর্যাপদের ভাষা দুরূহ। বিষয়বস্তুও সহজবোধ্য নয়। এই পদগুলিতে সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধন ভজন সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডের নির্দেশ আছে। সহজিয়া সাধনা গুরু পরম্পরায় চলে আসছিল। চর্যার কবিদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট; কবিতার আকারে লেখা সাধন সংক্রান্ত গূঢ় নির্দেশগুলি যাতে শিষ্য ছাড়া অন্যরা বুঝতে না পারেন এবং দ্বিতীয়ত হিন্দু পুনরুত্থানের যুগে ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণদের শ্যেন দৃষ্টি এড়াতে বাধ্য হয়েই তাঁদের গ্রহণ করতে হয়েছিল এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা, যা সাধারণের কাছে হেঁয়ালি বলেই প্রতিপন্ন হয়। বৌদ্ধ সাধনার পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত এই ভাষাকে ঐতিহাসিকেরা

'সন্ধ্যাভাষা' বলেছেন। সন্ধ্যার আলো-আঁধারির রহস্য-পারিবেশের সঙ্গে রহস্যময় বিষয়ের তুলনা যথার্থ। আবার যে ভাষার অর্থ সম্যক ধ্যানের দ্বারা (সম্-ধৈ) বুঝতে হয়, এই অর্থেও সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষা শব্দটি সুপ্রযুক্ত।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের গানগুলি ঠিক করে রচিত হয়েছিল. তা সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, চর্যার রচয়িতাদরে সম্পর্কেও কোনো নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায় না। কোনো কোনো কবি যদিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু তাঁদের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। অতএব অন্য সুনির্দিষ্ট উপাদানের অভাবে চর্যাগীতির রচনাকাল বিচারে ভাষার প্রমাণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি। চর্যার ভাষায় যদিও শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব রয়েছে তবু এই ভাষার ভিত্তি মাগধী অপভ্রংশের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, মহাযান সাধনায় তান্ত্রিকতার প্রবেশ ইত্যাদি ইতিহাস পর্যালোচনা করে পালবংশের পতন ও সেনবংশের অভ্যুত্থানের সময়কে ধরলে চর্যাপদকে দশম-দ্বাদশ শতকে স্থাপন করতে হয়। আবার অন্যদিকে ড. শহিদুল্লাহর মতে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সপ্তম-অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু ড. সুকুমার সেন ও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ সাধকদেব জীবনের অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল বলে মত প্রদান করেছেন। মুনিদত্তের অনুলিখিত পুথিটির লিপি বিচার করে রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে চতুর্দশ শতকের শেষপাদ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে কোনো এক সময়ে পুথিটি অনুলিখিত হয়েছিল। তবে চর্যাপদের কাল নির্ণয়ে অনুলিখিত পুথির লিপি বিচার না করে ভাষাতত্ত্বের বিচারই অধিক সঙ্গত। সামগ্রিক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগেই চর্যার গানগুলি রচনা সমাপ্ত হয়েছিল এবং মুনিদত্তের অনুলেখন চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগের পরে সংঘটিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। চর্যাপদের যুগে বৃহত্তর বাংলাদেশে বা গৌড়ে পালবংশের পতন ও সেন-বর্মন বংশের প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাস বলে, পালযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজশক্তি ছিল বৌদ্ধধর্মের অনুকূলে, সেনযুগে হিন্দুদের নবোত্থান হয় বিপুল শক্তিতে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের শৈব, নাথযোগী ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়ে; ফলে মহাযান সাধনায় কায়াসাধনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। চর্যাগান এই তান্ত্রিক সহজিয়াদের গোষ্ঠীচেতনার ফসল বলে রূপক উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের যতই বৈচিত্র্য থাকনা কেন, মূল বক্তব্য বিষয় বা পদগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বিচারে একটা সাধনপদ্ধতির গূঢ় সংকেতবাহী এই কবিতাগুলোতে, আমাদের দেহস্ত ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ি দিয়ে প্রবাহিত বহির্মুখী চিত্তবৃত্তির বোধিচিত্তাবস্থা প্রাপ্তি ও নির্বাণ লাভের সাধন পদ্ধতিই বিভিন্ন কবিতায় সংকেতিত। সর্ববিধ দ্বৈতবোধ পরিহার করে অবধূতিকা মার্গের পথ ধরে বোধিচিত্তকে মস্তিষ্কস্থিত মহাসুখকমলে সাধন-বলে উপস্থিত করে সিদ্ধি পেতে চেয়েছেন বৌদ্ধ সহজিয়ারা, মহাসুখ বা সহজসুখ এঁদের কাম্য।

চর্যাপদের কবিরা শুধুই সাধক ছিলেন না, তাঁরা কবিও; শিল্প সাহিত্যের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন, তাই গূঢ় সাধনপ্রণালি সম্বলিত উপদেশমূলক কবিতাগুলোতে সে সুগের বাংলাদেশের জীবনযাত্রা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতিচর্চা, সামাজিক অবস্থান, বর্ণাশ্রম, মানুষের বৃত্তি- স্বভাব-বিলাস-ক্রীড়ার সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। আছে যৌতুক নিয়ে নিচুজাতির কন্যাকে বিয়ে করার ছবি, আছে ব্যাধবৃত্তির চিত্রকল্প কিংবা জলদস্যুর লুণ্ঠনের কাহিনি— যা একটি যুগকে ধরে রেখেছে। চর্যাতে আছে — "নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ"— অথচ এই নিচু জাতের দেহপোজীবিনীর যৌবনসায়রে ডুব দিতে নেড়ামাথা বামুনও ছুটে যেতেন — "ছই ছোই যাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ"। কিংবা আছে বাঙালি কৃষকের ঘরের চিরায়তকালের ছবি— টিলার উপর ঘর, ঘরে 'হাড়ীত ভাত নাঁহি ' কিন্তু শেষ নেই অতিথির, এমনি দুঃসময়ে কৃষকের ঘরের ফসল নষ্ট করে ইঁদুর এসে। তবু এদের গৃহিণীরা চুলে বনফুলের মালা জড়িয়ে তাম্বুলরসে অধর রঞ্জিত করে মেতে ওঠে নৃত্যগীত— বিলাসচর্চায়; পুরুষরা মাতে দাবাখেলায়— এদিক দিয়ে চর্যার সাহিত্যিক মূল্যও অপরিসীম। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে অলৌকিক চরিত্র, গীতিপ্রবণ প্রাণের রোমান্টিক আকুতি এসেছে দেবতা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। তুলনায় আদিযুগের চর্যাপদে পাই, ব্রাত্যজনের জীবনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখের অনুপম ছবি— কবির ব্যক্তিক অনুভূতির মাধুরিমায় রঙিন হয়ে ওঠা সে ছবি, তাই তো দেখি শবর শবরীর মিলনের পরিবেশে বনভূমিতে আগমন ঘটেছে বসন্তের আর ময়ূরপুচ্ছে তনুদেহটিকে সুসজ্জিত করে গ্রীবায় গুঞ্জার মালা পরে প্রিয়সমাগমের প্রতীক্ষায় রয়েছে শবরী তরুণী। তত্ত্বকথা যাই হোক না কেন — চিত্র হিসাবে এগুলি যে কবির ব্যক্তিক অনুভূতির স্পর্শে অপরূপ গীতিমূর্ছনায় মদির করে — সন্দেহ নেই। চর্যার কবিদের এই রসাত্মক বাক্যসৃষ্টির পেছনে সক্রিয় ছিল তাঁদের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' — একথা স্বীকার করতেই হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ

বাংলা সাহিত্যের লিখিতরূপের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাগানগুলিতেই বাংলা সাহিত্যের যাত্রারম্ভ, চর্যাপদই আদিযুগের বাংলা ভাষার শেষ রেখা। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক — যে ছয়শত বৎসর জুড়ে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার মধ্যযুগ চিহ্নিত হয়েছে, তার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী গবেষক শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাংলা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক কৃষকের গোয়ালঘরের মাচা থেকে একটি জীর্ণ কীটদষ্ট পুথি আবিষ্কার করেন, এবং কয়েকবছর পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, এই বইটিই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রাচীনতম বাংলা কাব্য।

পুথিটি অক্ষত অবস্থাত পাওয়া যায়নি বলে শিরোভাগে বইটির কোনো নাম ছিল কিনা— এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কৃষ্ণ সংক্রান্ত সকল পদই যেহেতু 'কীর্তন' বলে

খ্যাত, তাই বোধকরি সংকলক বসন্তরঞ্জন এটিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম দিয়েছেন. কিন্তু এই পুথির ভিতর একটি চিরকুট পাওয়া গেছে, যে চিরকুটে বইটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লেখা আছে। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় যা-ই প্রমাণিত হোক না কেন, সম্পাদক প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটিই বহুচর্চিত। একে এখন অন্য নামে অভিহিত করা প্রায় অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস, ভণিতায় ও কাব্যের ভিতরে বহুবার কবি বড়ু চণ্ডীদাস বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন, ছন্দের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে শুধু 'চণ্ডীদাস' লিখলেও ইনি পদাবলিখ্যাত দীন চণ্ডীদাস কিংবা দ্বিজ চণ্ডীদাস থেকে আলাদা, বড়ু চণ্ডীদাসই, তাঁর সম্পর্কে অন্য কোনো ঐতিহাসিক তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে পুথিতেই তিনি নিজেকে বাশুলীর গণ বলে উল্লেখ করেছেন। "গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে" ইত্যাদি পদ থেকে এই মনে হয়, তিনি শাক্ত দেবী বাসলী বা বাশুলীর সেবক ছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এই গ্রন্থটি ঠিক করে রচিত হয়েছিল, তা প্রমাণ করা দুষ্কর। অনেকেই প্রাপ্ত পুথির প্রাচীনতায় সন্দেহ করেছেন। বইটির প্রাচীনতা সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তি সাজানো যায় সেগুলি হল—

(১) রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গল্প অবলম্বন করে এতে যে স্থূলরুচির পরিচয় আছে, তা পরবর্তীকালের চৈতন্য-প্রভাবিত লীলা-পদাবলি থেকে পৃথক।

(২) চৈতন্য অনুচর সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী' গ্রন্থে বইটির কোনো কোনো খণ্ডের উল্লেখ আছে।

(৩) প্রাপ্ত পুথিটি মূল পুথি নয়, এটি একাধিক ব্যক্তির দ্বারা মূল পুথি থেকে অনুলিখিত। লিপিবিশারদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন বসন্তরঞ্জন আবিষ্কৃত পুথিটি ষোড়শ শতক বা তার আগে অনুলিখিত, অতএব মূল পুথিটি নিশ্চয়ই আরো আগের।

(৪) ভাষার দিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থের আগে এবং চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে স্থাপন করতে হয়।

এই সমস্ত সূত্র থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অন্তত চৈতন্যাবির্ভাবের কয়েক দশক আগেই রচিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্পটি তেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ। এতে ভূভার হরণের জন্য গোলোকের বিষ্ণুর মর্তে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ ও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর রাধারূপে বৃন্দাবনে জন্ম থেকে শুরু করে কংস নিধনার্থে কৃষ্ণের মথুরা গমন এবং প্রণয়িনী রাধার কৃষ্ণ-বিরহে হাহাকার পর্যন্ত বিবৃত। দেবতার চেয়ে এখানে স্থূলরুচির মানুষের অভিজ্ঞতাই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র বিশেষ প্রভাব বইটিতে লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিরসের বড়ো বাড়াবাড়ি, এতে তুর্কি আক্রমণোত্তর অরাজক বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল

সমাজ-পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর লাম্পট্যের কাহিনিই যেন বলা হয়েছে। শ্রীরাধার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বড়ু চণ্ডীদাস অদ্ভুত মুনশিয়ানা ও জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছেন। রচনাগুণে রাধা-কৃষ্ণ সেকালের নরনারীর প্রতীক রূপেই অংকিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি ১৩টি খণ্ডের ১২টিই 'খণ্ড' বলে আখ্যায়িত হলেও শেষেরটিতে খণ্ড শব্দটি নেই। এতে কেউ কেউ অনুমান করেছেন শেষ খণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু দেহমন্থনের মধ্য দিয়ে এক প্রেম-বঞ্চিতা নারীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেমচেতনার উন্মেষ যেভাবে হয়েছে, বড়ু চণ্ডীদাসের সেই সূত্র অনুসরণ করলে রাধাবিরহের বেদনাঘন গানগুলি 'বংশীখণ্ডের' পরবর্তী স্বাভাবিক 'খণ্ড' বলেই প্রতিভাত হবে।

এই কাব্যে ভাগবতের সামান্য অনুসরণের পরিকল্পনা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি মূলত ভক্তি-ধর্মের স্থায়ী আদর্শের অভাবে। জয়দেবের রচনায় ভক্তি ছিল না, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কান্তাভাবের সাধনা কিংবা চৈতন্য পরবর্তী রাগানুগা বৈষ্ণবধর্মের কোনো প্রভাব পূর্ববর্তী কবি বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করতে পারি না। তবে এ কথা ঠিক যে বড়ু চণ্ডীদাস অন্তত শেষের দিকে পদাবলির আত্মনিবেদনে গিয়ে পৌঁছেছেন। পদাবলির চণ্ডীদাসের ভাবের আভিজাত্য ও লিরিকগুণ বড়ু চণ্ডীদাসে নেই, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলি বড়ু চণ্ডীদাসেরই উত্তরাধিকার।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা দুরূহ হলেও চর্যার তুলনায় বোধের কাছাকাছি। বড়ু চণ্ডীদাসে কোনো কোনো পদে রাধার হৃদয়বেদনা চিরন্তর প্রেমিকা নারীর বিরহ-ব্যথাকেই প্রকাশ করেছে—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন।"

এই ভাষা পদাবলির ভাষার মতো সহজ না হলেও দুর্বোধ নয়। বড়ু চণ্ডীদাসের আন্তরিকতার গুণে, কাহিনি উপস্থাপনের চিত্রধর্মিতা ও নাটকীয়তায়, গাল্পিক গাঁথুনিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মানবপ্রেমের অসাধারণ কাব্য হয়ে উঠেছে, - রুচির দোষ কেবল কবির নয়, এ কবির কালের ফসল; মঙ্গলাকাব্যেও আমরা খুব উচ্চ জীবনাদর্শ ও সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় পাই না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শুধু প্রণয়কাব্য নয়; ভাবে, ভাষায় ও সমাজচিত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়কেই এই কাব্য ধরে রেখেছে।

১.৩ চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য

তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী প্রায় তিনশত বৎসর ব্যাপী সঞ্চিত গ্লানি এবং অপমানের অন্ধকারে থেকে উদ্ধার করে মধুময় বৈষ্ণব পৃথিবীর উদার পরিমণ্ডলে বাঙালি সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে যিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন— তিনি শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে বাঙালির সমাজজীবনে অস্থিরতার দিনগুলিতে জাতি একদিকে দিশাহারা পর্যুদস্ত;

অন্যদিকে ইসলাম কর্তৃক ধর্মান্তরিত করণের প্রাবল্য হিন্দু সমাজ বিপন্ন। এই অরাজক অবস্থায় মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে জাতিকে উদ্ধার করে নবজীবন দান করেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যের সমকালে ব্রাহ্মণ্য পথাশাসিত সমাজে উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির মানুষেরা ছিলেন ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও আত্মরক্ষার তাগিদে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি ও ব্যবহার-শাসনের মাধ্যমে যে নব্যন্যায় সমাজে আরোপ করা হয়েছিল, তা শুধু স্বশ্রেণির সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। ধর্ম তখন একটি মাত্র বর্ণের সেই সাধারণ মানুষরা রক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিতই হয়নি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সামাজিক সংহতির সম্ভাবনা সেদিন ছিল না, অবশ্য বর্ণভিত্তিক সমাজে সামাজিক সংহতি সম্ভবই নয়, কারণ ধর্ম সেখানে অনুপস্থিত। বৈষ্ণবেরা একেই বলেছেন ধর্মপরাভব বা ধর্মের প্রবলতা। এই সামাজিক অচলাবস্থা, বৌদ্ধিক শুষ্কতা, ব্যবহাররসে মত্ত জীবনচর্যার মত্ত জীবনচর্যার বিরুদ্ধেই চলিষ্ণু, হৃদয়ধর্মী, মানবমুখীন প্রতিবাদী যে ভক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের আত্মপ্রকাশ সমস্ত ভারতবর্ষে;— বাংলাদেশে চৈতন্য, সেই আন্দোলনের আদর্শ ছিল এক সার্বিক কল্যাণবোধ, মানবতার চেতনা। সমস্ত বর্ণগত, শ্রেণিগত, সম্প্রদায়গত এবং ধর্মগত বিরোধ অতিক্রম করে চৈতন্য আনীত এই আন্দোলন মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকের বাঙালির ইতিহাস এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

স্মার্ত - বিধিকৃত নঞর্থক ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈষ্ণবেরা ধর্মীয় সামাজিক অর্থে সদর্থক ও প্রগতির সহায়ক এক মতাদর্শরূপে ভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উদারতা ও মানবিকতা ছাড়া ধর্মের গ্লানি করা অসম্ভব। স্মার্ত প্রায়শ্চিত্ত নয়, ভক্তির জোরেই পাপস্খালন হয়,— বৈষ্ণবেরা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলেন এবং এই প্রথম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভক্তিতত্ত্বে প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছিল, মানুষের জীবনের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। ভক্তি, উপাস্য দেবতার সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্যোতনা বহন করে। তাতে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য নেই। মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান— এই ছিল ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত। চৈতন্য ও তাঁর পরিকরগণ মূলত ভাগবতের আদর্শ অনুসরণ করে শাস্ত্রের নিষ্প্রাণ বিধান ইত্যাদির পরিবর্তে সহজ প্রেমের আদর্শ তুলে ধরলেন এবং জীবনগানে তাকে মেলাতে চাইলেন। জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি ও উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সামাজিক অচলায়তনকে এই প্রেমের পথেই তাঁরা মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সর্বপ্রকার সামাজিক গ্লানি, ভেদবিচার ও হিংসাদ্বেষের স্পর্শ থেকে মুক্তির পথ, বিবদমান ধর্মমতগুলির পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের পথও ছিল তাঁদের কাছে এই প্রেমেরই পথ।

তাই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি একটি নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছিল। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরবৃন্দকে অবলম্বন করে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজে নবজাগরণ ঘটেছিল।

১.৩.১ মধ্যযুগের সমাজ - সাহিত্য - সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের অবদান ও প্রভাব

মধ্যযুগের পরিচিত হিন্দুর পুজাবিধির রূপটি ছিল মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমে শাস্ত্রবিহিত উপাচার সহযোগে দেবার্চনা। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মসাধনায় এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল নগরকীর্তন। হিন্দুর ধর্মাচরণে কীর্তন নিয়ে এল এক সংঘবদ্ধতার ভাব, ধর্মসাধনা উচ্চকণ্ঠ প্রচারে রূপান্তরিত হল। সাধারণ মানুষ অসংকোচে এতে যোগ দিলে। নামগানকে চৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ পূজা হিসাবে বিদান দিয়েছিলেন। ধর্মসাধনাকে ব্রাহ্মণ্য রীতির পূজা পদ্ধতি থেকে বিযুক্ত করার কাজে নামকীর্তন সহায়ক হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেব তাঁর প্রবর্তিত ধর্মসাধনায় হিন্দুর বর্ণাশ্রমের সমস্ত বাধা ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যেই জন কৃষ্ণভজে, সে মোর ঠাকুর," "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ন"। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব মোহান্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের মানুষও ছিলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য বর্ণের মানুষেরা যে গুরু ও মোহান্ত রূপে শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার সাধন করেছিলেন, তাও এক গুরুতর ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। চৈতন্য আনীত ধর্মান্দোলনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য — "...দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না; দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সংগীত প্রণালী তৈরি করিল, আর কোনো সংগীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়া ছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।"

বাংলার সমাজে চৈতন্য প্রভাবের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, সখীতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্মীয় তত্ত্ব সমাজের ধর্মীয় রূপের ক্ষেত্রে সংযোজিত হল। এই সংযোজন সমকালীন সমাজে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকে সজীব করে তুলেছিল।

চৈতন্যদেবের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করল। এটি হল জীবনীসাহিত্য : শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন, ভক্ত কবিদের তাঁর জীবনী রচনায় প্রণোদিত করল। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে মানুষের দ্বারা মানুষের জীবনকথা লিখিত হল। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে যে জীবনীকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হল বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। কবিরাজ গোস্বামী কৃত জীবনচরিতে শুধু চৈতন্য জীবনকথাই বর্ণিত হয়নি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্বও এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে, রচিত হয়েছে দার্শনিক তত্ত্বের দৃঢ় পৃষ্ঠভূমি। শ্রীচৈতন্য আচরিত ধর্ম প্রধানত নামজপ ও কীর্তন নির্ভর। আনুষ্ঠানিকতা বিহীন বৈষ্ণবধর্মের ভাব-প্রবাহকে সুদৃঢ় দার্শনিক ও রসভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে এলেন চৈতন্যের উপযুক্ত ভক্ত শিষ্য শ্রীরূপ, সনাতন, ও শ্রীজীব গোস্বামী। রচিত হল ভক্তিশাস্ত্র। বৈষ্ণবীয় অংলকারশাস্ত্রে লৌকিক শৃঙ্গাররসের তাত্ত্বিক উর্দ্ধায়ন ঘটল 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' ইত্যাদি গ্রন্থে।

চৈতন্যদেব স্বয়ং এক ধরনের ধর্মাশ্রয়ী কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলার কৃষ্ণযাত্রার পরবর্তীকালে এই ভক্তিবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সংগীতের জগতে বৈষ্ণব কীর্তন এক বৈপ্লবিক সংযোজন। প্রাচীন ভারতীয় রাগসংগীতের সঙ্গে লোকসংগীতকে মিশ্রিত করে এই বাংলা কীর্তনই প্রথম কাব্যসংগীতের ভিত্তি স্থাপন করে। 'উজ্জ্বলনীমণি'তে প্রতিপাদিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তিরসতত্ত্বের মানদণ্ডেই পদাবলি সাহিত্যে ও কীর্তনগানে রসপর্যায়ের উৎপত্তি। একে বলা যায় বাংলার নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যপর্বেই জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ উচ্চমানের কবিদের আবির্ভাব ঘটেছে। কৃত্তিবাসের সংস্কৃত থেকে অনূদিত রামায়ণ চৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিরসে পুষ্ট বাঙালির নিজস্ব রামায়ণ হয়ে উঠেছে।

চৈতন্য পূর্ববর্তীকাল থেকে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারাও চৈতন্যযুগে ভক্তিরসাপ্লুত কোমলতা লাভ করে। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেবে সর্পদেবীর রূঢ়তা ও হিংস্রতা চৈতন্যযুগের বা তৎপরবর্তী কাব্যগুলিতে অন্তর্হিত। কাহিনিকাব্যেও পদাবলির গীতিলালিত্য দেখা দিল। ভাগবত অনুবাদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যপ্রধান কাহিনির পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের লালীপ্রধান কাহিনি লিখিত হল। রামপ্রসাদে শাক্ত পদাবলির ক্ষেত্রেও বৈষ্ণবীয় ভক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শাক্ত পদে রূঢ় শক্তির প্রত্যাশিত প্রকাশকে রামপ্রসাদ ভক্তিবিগলিত বাৎসল্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত কবিগানেও বৈষ্ণব পদাবলি এবং পালাকীর্তনের যুগপৎ প্রভাব অনুভূত হয়। এমনকি ইসলামি সাহিত্যেও চৈতন্য প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। ইসলামি সাহিত্যের নায়িকাদের বিরহ ব্যাকুলতা প্রকাশে রাধা-বিরহের সুরটি অনেকাংশে ধ্বনিত।

বস্তুত, চৈতন্যদেবের পূত জীবন ও তাঁর আনীত ধর্মান্দোলন বাঙালির সমাজ-সাহিত্য, ধর্ম-সংস্কৃতিতে এমন গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তা মধ্যযুগের সময়সীমা অতিক্রম করে আধুনিক যুগেও প্রবিষ্ট হয়েছে।

১.৩.২. বৈষ্ণব সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। পঞ্চদশ শতকের উপান্ত দশকে (১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ) শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য নবগৌরবে অভিষিক্ত হল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে একত্রিত হওয়া পার্ষদ-পরিকর, গোস্বামী - দার্শনিকদের নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্য বিবিধ বিচিত্র নতুন নতুন ধারায় গতিশীল হয়ে উঠল। বাংলা ও বাঙালির জীবনে চৈতন্যাবির্ভাবকে অনেকে চৈতন্য রেনেসাঁস বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই নবজাগরণ ও চেতনার বিস্ফোরণ বাংলা সাহিত্যের প্রকাশে ধরা পড়েছে। চৈতন্য পূর্ব যুগের পুরাণের গল্প, দেবতার মাহাত্ম্য কাহিনি, কৃষ্ণলীলা পদাবলির তুচ্ছতা ও রহস্যময়তা থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলা সাহিত্য এই সময় উদারতার পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের যে শাখাটির পরিবর্ধন এবং ভাব ও রূপান্তর ঘটেছিল তা হল বৈষ্ণব সাহিত্য।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য একটা প্রবল ভাবান্দোলনের ফসল। এই সময় নানা শাখায় বৈষ্ণব সাহিত্য বিপুল শক্তিতে বিকশিত হয়ে উঠল। কাব্য-কবিতায়, কীর্তনগানে, চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালিতে এই সময়ের সাহিত্য সর্বস্তরের জনসমাজে বিস্তৃত হল। বৈচিত্র্য এবং বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষও বৃদ্ধি পেল। আবেগপ্রধান রচনার পাশাপাশি মননশীলতা এবং তথ্যনিষ্ঠা, গীতিকবিতার সঙ্গে জীবনীসাহিত্য, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ বৈষ্ণব সাহিত্যধারাকে আশ্রয় করেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিসর বৃদ্ধি করল। এই বৈষ্ণব সাহিত্যধারার প্রধান দুটি উপশাখার একটি হল চরিত সাহিত্য বা চৈতন্যজীবনী এবং অন্যটি বৈষ্ণব পদাবলি।

১.৩.২.১ চৈতন্যজীবনী

চৈতন্যদেব তাঁর জীবৎকালেই ঈশ্বরের অবতাররূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তাঁর পূত চরিত্রকে অবলম্বন করে সংস্কৃত কাব্য, নাটক এবং বাংলা গান ও কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। বস্তুত চৈতন্যের জীবনকথাকে আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্য দেবতার নন্দনকানন থেকে মানুষের জীবনভূমিতে অবতরণ করল। চৈতন্যদেবের আগে অতীত ইতিহাস দুরস্থান, সমসাময়িক ইতিহাসেরও কোনো উপাদান সাহিত্যসৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়নি। ষোড়শ শতক থেকে এই প্রথম কোনো জীবিত ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের বিষয়ীভূত হল। চৈতন্যজীবনী রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক উন্মোচন হল। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের প্রভাবে আলোড়িত সমকালেই তাঁকে নিয়ে কাব্য-কবিতা রচনার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে যে ধর্মান্দোলন তরঙ্গিত হচ্ছিল সেই প্রেরণাই চৈতন্যকে কাব্যের বিষয় করে তুলেছে। চরিতকাব্য রচয়িতারা সকলেই সচেতনভাবে তাঁর আবির্ভাবকে স্বয়ং ভগবানের মর্তাবির্ভাব বলে বিশ্বাস করতেন। তাই শুধু তাঁর ব্যক্তিমহিমার প্রভাব নয়, ধর্মীয় প্রেরণাতেই এই কাব্যশাখার উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রগ্রন্থগুলিই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বুদ্ধিভিত্তিক রচনা।

চৈতন্যকে কেন্দ্র করে রচিত জীবনীকাব্যগুলি অনেকাংশেই অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। জীবনীকারেরা চৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ একথা প্রমাণ করার জন্য বাস্তব ঘটনাকে অলৌকিকতার মোড়কে পরিবেশন করেছেন। তবু এই জীবনীকাব্যগুলিতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বৈষ্ণব সমাজ ও সমাজের বাইরে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলেই জীবনীকাব্যগুলি শুধু জীবনীমাত্র হয়নি। এতে গৌড়, বিশেষত নবদ্বীপ, শান্তিপুর, নীলাচল ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস বিকাশ পরিণতি সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যের যেরূপ সমাহার ঘটেছে— মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার্য। মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এই জীবনীকাব্যগুলির সাহায্য অপরিহার্য।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে মধ্যযুগের জীবনীকাব্যগুলিকে অনেকে যথার্থ জীবনীর মর্যদায় ভূষিত করতে চান না। চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিকে জীবনীগ্রন্থ বলে মেনে নেবার

পক্ষে প্রধান বাধা এই যে, ভক্তের দৃষ্টি দিয়ে মহাপ্রভুকে দেখার ফলে জীবনীকারগণ কখনো চৈতন্যের জীবনে অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার কাঠামোয় চৈতন্যলীলা পরিবেশন করতে গিয়ে ভক্ত কবি নিছক বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। কিন্তু লক্ষ করার মতো বিষয়টি হল— কবিরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোথাও সত্যের অপলাপ করেননি, বরং তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁরা যথাসম্ভব উৎস নির্দেশ করেছেন। এই উল্লেখে কবিদের সত্যনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যজীবনীকারগণ সকলেই তাঁর ভক্ত ও পার্ষদ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন "কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা।" এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে নরলীলা স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যজীবনের অতিলৌকিক ও অবাস্তব ঘটনার মানদণ্ডে বিচার করলে জীবনীকাব্যগুলিকে সাধারণভাবে মহাপুরুষজীবনী বলা যেতে পারে। কারণ সাধারণের জীবনের সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনের কিছু মৌলিক পার্থক্য সর্বকালে স্বীকৃত। মহাপুরুষদের জীবনের বাহ্যিক বাস্তবতা কখনোই চরম সত্য বলে স্বীকৃত হয় না। অধ্যাত্মলোকের অলৌকিক ঘটনাকে বর্জন করলে তাঁদের জীবনের কোনো মাহাত্ম্য অবশিষ্ট থাকে না। এবিষয়ে প্রাজ্ঞ সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের অভিমতটি গ্রহনযোগ্য - " চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলি Hagiography বা সন্ত-সাধক জীবনীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এতে নিছক বাস্তব কাহিনী কখনোই একমাত্র উপাদান বলে স্বীকৃত হতে পারে না— অলৌকিক, অধ্যাত্মালোকের রহস্যময় ব্যঞ্জনা মহাপুরুষ-জীবনীর প্রধান উপাদান বলে সর্বযুগেই গৃহীত হয়েছে। এই কথাগুলি মনে রাখলে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলি যথার্থ জীবনী হয়েছে, কি হয়নি— এই নিয়ে অর্থহীন বাগ্‌বিতণ্ডায় মত্ত হবার প্রয়োজন হবে না।"

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত জীবনীকাব্যগুলি হল— বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লোচনাদাসের চৈতন্যমঙ্গল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা এবং চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়। আসুন এগুলি এক এক করে আলোচনা করা যাক।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ঃ

মধ্যযুগের বাংলা জীবনীকাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অতি জনপ্রিয়, কাব্যগুণান্বিত এবং সুপরিচিত হল বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'। বৃন্দাবনদাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চৈতন্যচরিত রচনা করেন, কিন্তু সেখানে নিজের জীবনবৃত্তান্ত কিছু দেননি। তিনি কেবল জানিয়েছেন যে, তিনি চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়ণীর পুত্র। সম্ভবত ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে) তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিক অতিবাহিত হয় দেনুর গ্রামে। কবি বাল্যকালেই গুরু নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষিত হন। এই গ্রন্থটি রচনা করে বৈষ্ণব সমাজে তিনি 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' নামে খ্যাত হয়েছেন। বৃন্দাবনদাস সর্বপ্রথম চৈতন্য-জীবনীকাব্য গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন 'চৈতন্যমঙ্গল'। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটিতে শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে চৈতন্য চরিত্রের

রূপায়ণ করা হয়েছিল বলে পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এর নাম বদল করে রাখলেন 'চৈতন্যভাগবত'।

গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন ১৫৩৩, কেউ ১৫৪৮ আবার কেউ বলেছেন ১৫৭৪ সালে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ডঃ বিনানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোধানের অল্প কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের পরে এর রচনা সম্পর্ণ হয়। গ্রন্থটি আদিখণ্ড (পনেরো অধ্যায়), মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ অধ্যায়), অন্ত্যখণ্ড (দশ অধ্যায়)— এই তিন খণ্ডে একান্নটি অধ্যায় নিয়ে সুবৃহৎ আকার ধারণ করেছে। আদিখণ্ড চৈতন্য জন্ম থেকে গয়া গমন, মধ্যখণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত, অন্ত্যখণ্ডে আছে নীলাচল গমন এবং সেখানকার কয়েকটি ঘটনার আংশিক বিবরণ মাত্র। অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ। কেউ কেউ বলেন কবি বৃদ্ধ বয়সে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন এবং তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থটি অসমাপ্ত থেকে যায়। চৈতন্যজীবনীর অধিকাংশ উপাদনা গুরু নিত্যানন্দের কাছে এবং চৈতন্যের বাল্য-কৈশোর লীলা বোধহয় গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছে শুনেছেন তিনি। অনেকে মনে করেন চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্য বৃন্দাবনদাস পাননি, তাই অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ। তাঁর কাব্যটির আঙ্গিক তথা পরিকল্পনায় 'মুরারিগুপ্তের কড়চা'র (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বৃন্দাবনদাস।

নিত্যানন্দের অনুগামী বৈষ্ণব ভক্ত বৃন্দাবনদাস ভাগবতের লীলার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই নবদ্বীপের গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করেছেন। আর তাই - ই কাব্যটিতে বালক চৈতন্যের লীলায় কৃষ্ণের বাল্যকাহিনি উঁকি দিয়েছে। জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজিদলন যেন মথুরা ও কুরুক্ষেত্রেরই অনুরূপ হয়েছে। আর এর কারণ হল বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের চৈতন্যভক্ত পার্ষদদের মতোই মনে করতেন যে যুগ প্রয়োজন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, অংশ হয়ে নন, সম্পূর্ণ ভগবানরূপে এবং অবশ্যেই ধর্মসংস্থাপনার্থে। চৈতন্যজীবনকে কৃষ্ণজীবনের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে গিয়েই কবি কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন, ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনি ও চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আবার নানা স্থানে কবি চৈতন্য বিরোধীদের প্রতি নানা কটুক্তিও করেছেন। জীবনীগ্রন্থ শুধু বিশুদ্ধ ও নিরপেক্ষ তথ্যচয়ন মাত্র নয়, সেখানে জীবনীকারের জীবনভাষ্যও জড়িয়ে থাকে। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি তারই উদাহরণ। আর তাই - ই গ্রন্থটিতে পাই শ্রীচৈতন্যের মানবমূর্তি ও ভাগবতমূর্তির পাশাপাশি সমকালীন নবদ্বীপের বাস্তব বর্ণনা। এখানে তাঁর ইতিহাসচেতনার দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক নবদ্বীপের জনসংখ্যা, নবদ্বীপবাসীদের সম্পদ সমৃদ্ধি এবং শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
বিবিধ বৈসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ।।

এখানে তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ভক্তের আকুতির সঙ্গে মিলেমিশে গেছে, এর ফলে এবং সহজ-সরল পরিচ্ছন্নতার জন্য কাব্যটি সর্বজনচিত্তাকর্ষী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া গ্রন্থটিতে চৈতন্যদেবের বাল্যকালের দুরন্তপনা, গঙ্গাঘাটে স্নানার্থীদের বিব্রত করা, তাঁর তীক্ষ্ম মেধা, সহাপাঠীদের বিদ্রুপ করা, পাণ্ডিত্য, দুঃসাহসী নেতৃত্বের দৃঢ়তা ইত্যাদির সঙ্গে ভক্তির প্রাবল্য, অলৌকিকে বিশ্বাস প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যের মানবরূপটিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পরিশেষে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়— "শ্রীচৈতন্যভাগবত শুধু মহাপুরুষের ভাগবত জীবনালেখ্য হয়নি, কবির বর্ণনায় সময়সাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দিক দিয়ে এই জীবনীকাব্যের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হবে।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ঃ

শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একখানি অনবদ্য শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও জনপ্রিয়। কেন-না গ্রন্থটিতে জীবনীকাব্যের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি পণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ১৪৫০ শকাব্দ, ইংরাজি ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে কাছাকাছি সময়ে বর্ধমান জেলার ঝামাটপুর গ্রামে এক বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতার নাম সুনন্দাদেবী। কবির ছয় বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং কিছুদিন পর মাতৃবিয়োগও ঘটে। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম শ্যামদাস। আত্মীয়স্বজনের কাছেই তিনি বড়ো হন। শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত -শিষ্ট ও গম্ভীর প্রকৃতির এবং অল্পবয়স থেকেই তাঁর ভক্তিনত চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। একদা তিনি স্বপ্নে বলরামবেশী নিত্যানন্দের আজ্ঞা পেয়ে বৃন্দাবনে চলে যান এবং বৈষ্ণব - সন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণ করে যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস - এই ছয়জন বিখ্যাত গোস্বামী ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। চৈতন্যদেবের দেহরক্ষার কিছুদিন পর মদনগোপালের আজ্ঞা পেয়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। তবু মনে করা যায় গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ১৫৩৮ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপঞ্চমীতে। সমাপ্তির সময় কবির বয়স ছিল ৯০ বছরের কাছাকাছি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনকাহিনি উপস্থাপিত করেছেন গ্রন্থটিতে, এমনকি পুরীলীলা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য এবং পূর্ণাংঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন। তাছাড়া গ্রন্থটিতে আমরা অনেক নতুন তথ্য পাই, যা পূর্ব চরিতকারেরা দেননি। তিনি অনেক পুরোনো ভ্রান্তি দূর করেছেন, আবার আগের ফাঁকগুলিও ভরাট করেছেন। গ্রন্থটি বৃন্দাবনদাসের মতোই তিনখণ্ডে বিভক্ত। আদিলীলা সতেরো পরিচ্ছেদ, তার প্রথমদিকে বিস্তৃতভাবে বৈষ্ণব দর্শনের নানা দিক আলোচিত হয়েছে এবং পরে সংক্ষেপে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। কেননা বৃন্দাবনদাস এ অংশটি পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পঁচিশ পরিচ্ছেদ যুক্ত মধ্যলীলায় স্থান পেয়েছে বৃন্দাবন ভ্রমণের

পর চৈতন্যের নীলাচল প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অংশ। অন্ত্যলীলা বিশ পরিচ্ছেদের এবং সেখানে প্রভুর নীলাচলবাসের সতেরো-আঠেরো বছরের অর্থাৎ শেষজীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কবি মহাপ্রভুর দেহাবসানের কথা উল্লেখ করেননি।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত অংশগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রদ্ধাবশত 'চৈতন্যচরিতামৃত' —এর পূর্বাধের কাহিনি হিসাবে ধরে নিয়ে সূত্রকারে লিখেছেন। কিন্তু যে অংশ বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেননি, সেই অংশগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অকৃপণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অবশ্যই চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ অনুযায়ী। যেমন চৈতন্যদেবের নীলাচললীলা প্রত্যক্ষকারী পার্ষদ স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথ দাসের কাছ থেকে নীলাচললীলা চৈতন্যের প্রেমভাব-বিগলিত রূপ তথা ভাববিহ্বল জীবনচর্যার ইঙ্গিতটিকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা, ব্যাখ্যান ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পূর্ণাবয়ব দান করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাই অন্যান্য চরিতগ্রন্থ থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় এই গ্রন্থটিকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথা বৃন্দাবনের চৈতন্যভক্তদের কাছে চৈতন্যদেব হলেন রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ নামে দ্বাপরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বাপরে তাঁর রসাস্বাদনের তিনটি বাসনা অপূর্ণ থাকে। যেমন প্রথমত, রাধাপ্রেমের স্বরূপ আস্বাদ দ্বাপরে কৃষ্ণ পাননি, কারণ সেখানে কৃষ্ণ বিষয় এবং রাধা তাঁর আশ্রয় হয়েছিলেন। তাই রাধাপ্রেমের স্বরূপ আস্বাদনের জন্য; দ্বিতীয়ত, রাধার প্রেমপূর্ণ চিত্ত কৃষ্ণের যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদ করে— তাই-ই বা কীরকম এবং তৃতীয়ত, এই প্রেমের স্বাদ রাধাকে কীরূপ আনন্দ দেয়— এই তিনিটি বাসনা পূরণার্থেই স্বয়ং কৃষ্ণ রাধিকার ভাবকান্তি অস্বীকার করে নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন—

"রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।।

* * * *

পিতামাতা গুরুগণে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি।।
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধদুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু।।"

এই গ্রন্থটি শুধু চরিতকাব্যই নয়, একে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্পুটও বলা হয়ে থাকে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিতামৃতম', স্বরূপ দামোদরের কড়চা, দাস গোস্বামীর স্তবমালা প্রভৃতি এবং রূপ-সনাতন, দাস গোস্বামী প্রমুখ গৌর পার্ষদদের মৌখিক উক্তি কবিরাজ গোস্বামীর অবলম্বন ছিল বলে একে সমস্ত গোস্বামী শাস্ত্রের সার বলা হয়ে থাকে। গ্রন্থটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, রাগানুগাভক্তি এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব, বেদান্তবিচার, তাছাড়া কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব আদি তত্ত্বকথাগুলি সুপরিস্ফুটভাবে ফুটে উঠেছে। বৃন্দাবনে প্রচলিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক মতগুলি নানা প্রসঙ্গে কবি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করছেন। কবি গ্রন্থটিতে ৭৬৩ টি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এর ১০১ টি শ্লোক নিজের আর বাকিগুলি শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদগীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, রঘুবংশম, নৈষধ, কিরাতার্জুন, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ থেকেই কবির পঠনের পরিধি এবং বোধের ক্ষিপ্রতা পরিমাপ করা যায়। কিন্তু গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুরে লুণ্ঠিত হওয়ায় জরাতুর কবি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। অবশ্য গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের কাছে পাওয়া গিয়েছে।

লোচনাদাসের চৈতন্যমঙ্গল ঃ

বিশিষ্ট পদকর্তা লোচনদাসের সম্পূর্ণ নাম লোচনানন্দ দাস। তাঁর রচিত চৈতন্যজীবনচরিত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটির শেষে দেওয়া তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, নিবাস ছিল কোগ্রামে। তাঁর পত্নী কাঞ্চনার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন নির্বাহের পরিবর্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন চৈতন্য-ভজন পূজনের পথ। বাল্যকালে তিনি ফিরিঙ্গির দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন এবং চৈতন্যানুচর নরহরি সরকার তাঁকে উদ্ধার করে দীক্ষা দেন। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটি ১৫৬০, থেকে ১৫৬৫ সালের মধ্যে লেখা। কাব্যটি চার খণ্ডে বিভক্ত। তার সূত্রখণ্ড প্রায় ১৮০০, আদিখণ্ড প্রায় ৩৩০০, মধ্যখণ্ড প্রায় ৪৩০০ এবং শেষখণ্ড প্রায় ১৬০০— সব মিলে ছত্রসংখ্যা প্রায় ১১০০০। সূত্রখণ্ডের বিষয় তীর্থযাত্রার বর্ণনা একান্ত অসম্পূর্ণ। বিশেষত অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রোতার রুচি অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যের ঢঙে, পাঁচালি রীতিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মিশ্রনে গান করবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। তাই গ্রন্থমধ্যে নানা দেব-দেবীর তথা পৌরাণিক বিষয়ও অতি সহজেই এসে পড়েছে। তিনি বাক্যটি রচনায় তথ্যের দিক থেকে মুরারি গুপ্ত এবং ভাবের দিক থেকে 'গৌরনাগরী' মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা নরহরি ঠাকুরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য এবং গৌরনাগরী মতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি অনেকটাই সত্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তবু শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্যজীবন বর্ণনা, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শচীমাতার বিলাপে করুণরস উদ্রেক— ইত্যাদি অভিনবত্বের জন্য এবং তার কবিত্বশক্তির বলে যে গীতিমূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে তারই জন্য গ্রন্থটির কিছু মূল্য রয়েছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস-সম্ভাবনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপের একটু অংশ উদ্ধার করে আমরা এই আলোচনা শেষ করব—

"দুনয়নে বহে নীর ভিজিয়া হিয়ার চীর
বক্ষ বহিয়া পড়ে ধার।
চেতনা পাইয়া চিতে উড়ে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে বারবার।।"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ঃ

আধুনিককালে আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটির বৈষ্ণব সমাজ

এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে অপ্রচারিত ও অনুল্লিখিত থাকলেও চৈতন্যের জীবনকথা ও সমসাময়িক বাংলাদেশের কিছু কিছু বাস্তব চিত্র আছে বলেই অনেকে গ্রন্থটির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিতভাবেই কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী। মধ্যরাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে তাঁদের নিবাস ছিল। জয়ানন্দ যখন শিশুমাত্র তখন তাঁদের এই বাড়িতেই পুরী থেকে বাংলায় ফিরবার সময় ক্লান্ত চৈতন্যদেব কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আর তখনই চৈতন্যদেব জয়ানন্দের কুৎসিত 'গুইয়া' নামের বদলে জয়ানন্দ নাম রাখলেন। নিত্যানন্দের প্রধান অনুচর অভিরাম দাস ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের আশীর্বাদ, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আজ্ঞা ও চৈতন্যের অনুগ্রহ— ইত্যাদির বলে জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটি রচনা করেন আনুমানিক ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এবং অবশ্যই বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র পরে, হয়তো লোচনাদসের সমকালে। কাব্যটির ছত্রসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে তেরো হাজার। ছোটো, মাঝারি এবং বড় মিলিয়ে আদি, নদিয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ, তীর্থ, বিজয় ও উত্তর— এই নয় খণ্ডে রচনাটি বিভক্ত। গ্রন্থটিতে আদ্যাশক্তির বন্দনা, কালীমূর্তির বর্ণনা নিঃসন্দেহে মঙ্গলকাব্যের মতো, যা কোনো নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব করতেন না। অবশ্য জনমনোরঞ্জনের জন্যই তাঁকে এপথ নিতে হয়েছিল। কাব্যটিতে কাব্যলক্ষণের পরিবর্তে আছে নতুন নতুন তথ্য। যেমন নবদ্বীপের রাজনৈতিক দুর্বিপাকের কথা, হাবশি শাসনের ফলে গৌড়ে নানা বিশৃঙ্খলা— যা ইতিহাসসম্মত। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ ওড়িয়া ছিলেন, পরে ওড়িশার রাজা কপিলেন্দ্রদেব বা ভ্রমণের অত্যাচারে শ্রীহট্টে পালিয়ে যান। অবশ্য এই অভিনব তথ্যের কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাদান না থাকায় এটির ঐতিহাসিক মূল্য নেই। যেখানে চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে অন্যান্য জীবনীকার মিতবাক, সেখানে কবি জয়ানন্দ বেশ বাস্তবঘেঁষা মৃত্যুকাহিনি লিখে গেছেন। তাঁর মতে আষাঢ় মাসে রথের সামনে নৃত্যকালে ইষ্টকখণ্ডে আহত হয়ে প্রভুর মৃত্যু হয়। সম্প্রতি পুরনো ওড়িয়া জীবনীগ্রন্থগুলিতে এরকম প্রমাণ কিছুটা পাওয়া যায়। অবশ্যে এহেন তথ্য বৈষ্ণব মণ্ডলীতে এখনও স্বীকৃত হয়নি।

কাব্যটিতে পালাগানের আদর্শ এবং জনরুচির ঘটনার বর্ণনা থাকায় ইতিহাসের মর্যদা অনেকটাই ক্ষুন্ন হয়েছে। তবু বলা যায় জয়ানন্দের সহজ কবিত্বশক্তি ছিল, অনুশীলন ছিল যার ফলে অনেক স্থানেই গীতিকবিতার ঝংকার শোনা যায়। বাল্যক্রীড়ারত নিমাইয়ের ছবিটিতে বাৎসল্যের প্রকাশও লক্ষ করা যায়। যেমন—

"দেখ মিশ্র -পুরন্দর আনমনে নাঞি।
খাইতে শুইতে ডাকে বাপুরে নিমাঞি।।
ঘন করে করতালি হাসি হাসি নাচে।
কাকুর চুম্বন লইয়া মা বাপেরে যাচে।।
খনে গড়ি দিঞা কান্দে ধূলায় ধূসর।
দেখিঞা আনন্দে শচী মিশ্র-পুরুন্দর।।"

গোবিন্দদাসের কড়চা ঃ

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুরের ভক্তবৈষ্ণব জয়গোপাল গোস্বামী সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে একটি পাঠ্য কবিতাকারে চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ পায়। প্রকাশের পর থেকেই এর অকৃত্রিমতা এবং প্রামাণিকতা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বাদানুবাদের ঝড় শুরু হয়। গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন এবং জয়গোপাল গোস্বামীর পুত্র বনোয়ারিলালের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য ৩০ বছর পরও এর প্রামাণিকতা নিয়ে একই রকম বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়।

গ্রন্থ মধ্যে কবি-পরিচয় থেকে জানা যায় যে বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুরে কবির বাস, পিতার নাম শ্যামাদাস, মাতা মাধবী। তিনি 'অস্ত্র হাতা বেড়ি' ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি কর্মকার বংশীয় ছিলেন। তাঁর নাম গোবিন্দদাস কর্মকার। স্ত্রী শশিমুখীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কবি গৃহত্যাগ করে মহাপ্রভুর ভৃত্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রভুর সঙ্গেই পুরী, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ পথের কাহিনি গোবিন্দদাস প্রতিদিন দিনলিপির আকারে লিখে রাখতেন, আর এটাই হল 'গোবিন্দদাসের কড়চা'। একাধিক ভক্ত গোবিন্দদাসের নাম জানা গেলেও কোনো চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে কর্মকার বংশীয় গোবিন্দদাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাছাড়া এর ভাষাও অনেকটা আধুনিককালের স্পর্শ প্রাপ্ত। তাই অনেকে মনে করেন গ্রন্থটি জয়গোপাল গোস্বামীরই রচিত, তিনি কল্পিত গোবিন্দদাসের নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি জয়গোপাল গোস্বামীর রচনা না হলেও কিছুটা বা বেশিরভাগ অংশেই তিনি অন্যায় ও অনুচিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। একথা তিনি নিজে এবং পরবর্তী সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেনও স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া গ্রন্থটিতে চৈতন্য পরিপন্থী ঘটনারও উল্লেখ আছে। আবার দু-একটি আধুনিক শহর ও জলাশয়ের নামও লক্ষ করা যায়। ফলে যুক্তি তর্কের ওপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব। তবু প্রভুর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণের মনোজ্ঞ চিত্র এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা, প্রভু কর্তৃক পাপী-তাপী-গণিকা উদ্ধার ইত্যাদি অভিনব বিষয়গুলি রীতিমতো প্রশংসার দাবি রাখে।

চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয় ঃ

চৈতন্যজীবনী হিসাবে 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থটি যার অপর নাম 'ভুবনমঙ্গল' — এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। চূড়ামণিদাসের প্রাপ্ত পুথিটির প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা নষ্ট হয়েছিল এবং শেষের দিকের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নেই। গ্রন্থটি তিনখণ্ডে বিভক্ত ছিল, শুধু আদি খণ্ডটিই পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অংশের ছত্র সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। কবি ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্য অনুচর নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন। তিনি গুরুর কাছে ও গুরু ভ্রাতা গদাধর দাস ও রামদাসের কাছ থেকে চৈতন্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতেন।

মনে হয় ১৫৪২ থেকে ১৫৫০ অব্দের মধ্যে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরীর তপস্যা, শান্তিপুরে, নবদ্বীপে ও খলপপুরে মাধবেন্দ্রপুরীর গমনাগমন, শিশু নিমাইকে দর্শন ইত্যাদি বিষয় অভিনব। গ্রন্থটির আদিখণ্ডে চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোরলীলার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য।

১.৩.২.২ বৈষ্ণব পদাবলি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের বিপুল সময়সীমা জুড়ে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি। প্রাক চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব পদাবলির উৎসার ঘটলেও, বস্তুত চৈতন্যের সমকাল এবং চৈতন্যোত্তর যুগেই বৈষ্ণব পদাবলি উৎকর্ষের শিখরদেশ স্পর্শ করে। এই বিস্তৃত সময়সীমায় অগণিত পদকারের নাম ও কবিকৃতি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস — বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় এই চারজন পদকর্তার জীবন ও কবিকৃতি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

বিদ্যাপতি ঃ

'মৈথিল কোকিল', 'অভিনব জয়দেব' মধ্যযুগের 'কবিসার্বভৌম' বিদ্যাপতি বাঙালি না হয়েও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। তিনি একছত্রও বাংলা পংক্তি রচনা করেননি। তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলি। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মধ্যযুগে তিনি বাংলাদেশেই অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের অনির্বাণ আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরণের মানদণ্ডে বাংলার বৈষ্ণব পদসাহিত্য থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর পদাবলি বিশ্লেষণ করে কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে 'কস্‌মিক্‌-ইমাজিনেশনে'র অধিকারী বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অন্তর্ভুক্তির ফলে বিদ্যাপতির উপর বাঙালির দাবির প্রসঙ্গটি অবধারিতভাবেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমরা এই প্রসঙ্গে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতার বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

বস্তুত বিদ্যাপতির কবিতা ভাব ও ভাষা উভয় দিকেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বিদ্যাপতিকে বাঙালি ভক্তি ও প্রেমের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছে। বিদ্যাপতির পদগুলি বাংলাদেশে বহুদিন থেকে জনপ্রিয়। স্বয়ং চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলি আস্বাদন করতেন। বাঙালির 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' থেকে শুরু করে কিশোর রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পর্যন্ত বিদ্যাপতির অখণ্ড প্রভাব, তাঁর নামে হরগৌরী বিষয়ক পদই অধিক প্রচলিত। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি আবিষ্কৃত এবং বাঙালির অন্তর্লোকে গৃহীত না হলে খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে আরোহণের শেষতম সোপানটি বিদ্যাপতির অনতিক্রম্যই

থাকত — সন্দেহ নেই। বাঙালি বিদ্যাপতিকে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব দান করেছে। বিদ্যাপতি পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক হয়েও বাঙালির কাছে বাংলা ভাষায় বাঙালির হৃদয়ের কবি হিসাবেই গৃহীত। বাংলার কবি জয়দেব যেমন বাঙালি হয়েও সমগ্র ভারতে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, ঠিক তেমনি বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হয়েও দীর্ঘকাল বাঙালির হৃদয়ে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সমাজে কবিরূপে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। বিদ্যাপতির পদাবলির উৎস সম্পর্কেও বলা যায় যে, বাংলদেশের, পদসাহিত্য, সংস্কৃত চূর্ণ প্রেম কবিতা, বিশেষ করে জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিদ্যাপতির এই জাতীয় কবিতা রচিত হয়েছে। কারণ মিথিলার সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ঐশ্বর্যাত্মক পুরাণ-স্বীকৃত বিষয়ের অনুগমন করেছে। যেহেতু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন তাই পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজে কীর্তনীয়াঙ্গজ্ঞ সম্প্রদায়ের পদসংগ্রহে বিদ্যাপতির বহুপদ গৃহীত হয়েছিল। বৈষ্ণব সমাজের বাইরেও ভক্তির গান হিসাবে এই পদগুলি বাংলার শিষ্ট সমাজে প্রচলিত ছিল।

বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এ রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন — "বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবি শ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবী করিতে ছাড়ি না; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক বাঙালী ছাত্র মিথিলায় যাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আসিতেন ... অতএব যখন বাংলাদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন যে কবি জয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দের' অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সঙ্গীত বাংলাদেশের ধর্ম প্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বাংলাদেশের প্রাচীন কবি প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তিভরে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না।" আলোচ্য বক্তব্যে আবেগ-বাহুল্য থাকলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমি এখানে প্রকাশিত।

চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হবার ফলেই বিদ্যাপতির পদাবলি বাংলাদেশে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। তাঁর পদাবলির মানদণ্ডেই বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে ভাব ও ভাষাগত এক নতুন রসমান সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঐতিহ্যের অনুসরণে বহু ভক্তকবি বৈষ্ণব কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। নরহরিদাস, গোবিন্দদাস, বৈষ্ণবদাস প্রমুখ কবিরা নানা স্থানে বিদ্যাপতির বন্দনা করেছেন এবং স্বয়ং গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে গুরু বলে গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাপতি এবং তাঁর পদাবলি আর বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক মূলত পারম্পরিকতার সূত্রে অন্বিত।

বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর আবির্ভাবকাল ইত্যাদি প্রসঙ্গ নানা অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা। নানা প্রশাসনিক ইঙ্গিত থেকে তাঁর সময় সম্পর্কে মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সুহৃদ ছিলেন। তিনি ছিলেন মৈথিলি ভাষার বিখ্যাত পদকার এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। রাজপরিবারের সঙ্গে জড়িত থাকার

সূত্রে মিথিলার একাধিক রাজার সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক ঘটনা এবং তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় — দ্বারভাঙার মধুবনী মহকুমার বিসফী গ্রামে চতুর্দশ শতকের শেষভাগে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম হয়। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে তাঁর তিরোধান ঘটে বলে অনুমান করা হয়। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহের রাজত্বকালীন (১৪০২—১৪০৪ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে রাজার কীর্তিকাহিনি-বর্ণনামূলক অবহট্ট ভাষায় লিখিত 'কীর্তিলতা' নামক কাব্যে নিজেকে 'খেলন-কবি' অর্থাৎ কিশোর কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ থেকে ১৪০২ - ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে কবি সম্ভবত নবযৌবনের অধিকারী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। সুতরাং চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর জন্ম — এইরূপ অনুমান করা যায়। তাঁর কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থে সনের উল্লেখ আছে। ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর রচিত কোনো গ্রন্থের নাম না পাওয়া যাওয়ায়, বৃদ্ধ কবি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের পর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না বলেই অনুমান করা হয়।

বার বার মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের ফলে মিথিলার হিন্দু সংস্কৃতি বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। স্মৃতিসংহিতা ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পৌরাণিক ও স্মৃতি গ্রন্থাদি রচনা এবং প্রচার করে মিথিলার বিপর্যস্ত সংস্কৃতি ও সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কবি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কর্ণধার ছিলেন। যদিও কবি কৌলিক দিক থেকে শৈব উপাসক ছিলেন, তবু বিভিন্ন গ্রন্থে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব— সমস্ত মতের প্রতিই তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁকে পঞ্চোপাসক হিন্দু হিসাবেই গ্রহণ করতে হয়। তাঁর অন্তরের নিবিড় আবেগ রাধা-কৃষ্ণ পদাবলিতেই সূক্ষ্ম কলারূপ ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধিতে ভাষারূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

মিথিলা ও তাঁর চারপাশের অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদগুলির ভাষা শুদ্ধ মৈথিলি। তাঁর ভণিতায় কিছু বাংলা পদও পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর এক বাঙালি বৈষ্ণব কবি ছোটো বিদ্যাপতি নামে বিদ্যাপতির ঢঙে কিছু পদ রচনা করেছিলেন; বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি এই বাঙালি কবির রচনা বলেই অনুমান করা হয়। চম্পতি নামে এক ওড়িয়া কবিও বিদ্যাপতির আদর্শে কিছু পদ লিখেছিলেন। বাংলায় বিদ্যাপতির যে সমস্ত পদ পাওয়া গেছে সেগুলির ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলি নয়, অনেক বাংলা শব্দ তাতে অনুপ্রবেশ করেছে। এই বাংলা-মৈথিলি মিশ্র ভাষাটি ব্রজবুলি নামে চিহ্নিত।

মিথিলার অন্যতম প্রাচীন ভাষা অবহট্টে বিদ্যাপতি পদ ও কাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও স্মৃতিসংহিতায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু পূর্বভারতের কবি সার্বভৌম হিসাবে বিদ্যাপতির যে খ্যাতি, তা তাঁর পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য নয়; তাঁর পদাবলিই তাঁকে চিরস্মরণীয়তা দান করেছে। কবিত্ব, রচনারীতি, বৈদগ্ধ, সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনা ইত্যাদির বিচারে তাঁর রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি এক অনন্যসাধারণ মহিমায় ভাস্বর।

রাধাকৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখযুক্ত বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা পাঁচশতাধিক। তাঁর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিত্বযুক্ত পদই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রনিষ্ঠ বিদ্যাপতি অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক-নায়িকা প্রকরণ অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রথম মিলন, বাসকসজ্জা, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ, পুনর্মিলন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলনলীলা বর্ণনা করেছেন। পদগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত হলেও এগুলির মধ্যে এক ঐক্যসূত্রও বর্তমান। তাঁর পদাবলিতে কৃষ্ণবিষয়ক পুরাণাদির প্রভাব কম। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র দ্বারাই তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এজন্যই তিনি 'অভিনব জয়দেব' আখ্যায় মিথিলায় পরিচিত লাভ করেছিলেন। জয়দেবের রাধার সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধার চরিত্রগত সাদৃশ্যও বর্তমান। তাঁর পদাবলির প্রথম দিকে রাধার মধ্যে যে প্রেমঘন চাঞ্চল্য, দেহজ কামনার লাবণ্য-উৎসার, সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের যে উচ্ছলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা কবির সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পবোধের পরিচায়ক। বিদ্যাপতির রাধা নিপুণা নাগরী। তাঁর রাধা বয়সন্ধিতে ব্রীড়াকুণ্ঠিতা, যৌবনে চতুরা। মিলনে রাধা যেমন অপরূপ, বিরহে তেমনি বেদনা-বিষণ্ণ; তার বিরহ তীব্র গগনবিদারী—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নাগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী।।

পরিপূর্ণ মিলনের আনন্দে বিদ্যাপতির রাধা বলেন —

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল —
টুটল সবহু সন্দেহা।।

বিদ্যাপতির কবিকল্পনা বহিরাশ্রয়ী। তাঁর পদে চাঞ্চল্য, লাবণ্য, ঝংকারের প্রবলতা। ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতার দিকে কবিপ্রাণের নিরুদ্দেশযাত্রা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়নি। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদে বাস্তবধর্মী শৃঙ্গাররসেরই আধিক্য। ভাবগভীর ভক্তি ও অধ্যাত্মরসের ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যে কমই প্রকাশিত। বিদ্যাপতির রাধার পরিণাম বিচারে বলা যায় তাঁর পদে আদিরসই ভক্তিরসে পরিণত হয়েছে। ভারতে শৃঙ্গাররস ভক্তির প্রধান উপাদান বলেই গৃহীত। যে ভক্তি আদিরসকে ভিত্তি করে শৃঙ্গারকে উচ্চতর লোকে প্রতিষ্ঠা দেয়, বিদ্যাপতি সেই পথের পথিক। তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক কয়েকটি পদে অন্তিম আকুতি প্রকাশে তাঁকে বৈষ্ণব ভক্ত বলেই মনে হয়। —

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।।
গণইতে দোস গুণলেস না পাওবি
জব তুহু করবি বিচার।—

কবির এই আর্ত আবেদন ভক্ত হৃদয়ের অতল থেকে উত্থিত। চৈতন্য যুগের আদর্শে তাঁকে বৈষ্ণব বলা না গেলেও রাধা কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। পরবর্তীকালের

বৈষ্ণব পদসাহিত্য তাঁর অসাধারণ প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি। ভাষা-ছন্দ-অলংকার, গীতিধর্মিতায় তাঁর পদ পূর্বভারতে শীর্ষস্থানীয়। বৈষ্ণব পদের জন্যই ভিনদেশীয় বিদ্যাপতি বাঙালির পরমাত্মীয়ের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

চণ্ডীদাস ঃ

বিদাপতির পরবর্তী যে কবির পদাবলির সুরমূর্ছনায় আপামর বাঙালি জাতি মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট, — তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে পদাবলির চণ্ডীদাস নামে বিখ্যাত। চৈতন্য জীবনীকারের সাক্ষ্য অনুযায়ী — চৈতন্যদেব চণ্ডীদাস নামক জনৈক কবির পদাবলির রসাস্বাদন করতেন। আর এ সূত্রেই বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব। চণ্ডীদাসের অত্যন্ত জনপ্রিয়তার ফলে পদাবলি সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়েছে। চণ্ডীদাস কয়জন, কার পরে কার আবির্ভাব, চৈতন্যদেব কোন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা সাহিত্য যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সর্বজনসম্মত কোনো সমাধান না পাওয়া গেলেও এ কথা অসংশয়ে বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যদেবের পূর্ব রচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত স্থূলতা ও রসাভাসদোষের জন্য চৈতন্যদেব এ কাব্য পাঠ করে কখনো তৃপ্তি পেতেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন তিনি পদাবলির চণ্ডীদাস। এই চণ্ডীদাসের পদই চার-পাঁচশত বৎসর ধরে বাঙালির হৃদয় মন অধিকার করে রেখেছে।

চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন, সারা বাঙালি সমাজ যাঁর গানে মন্ত্রমুগ্ধ তিনি প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদকার। তাঁর কোনো বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না। বীরভূমের নানুর গ্রামে তাঁর বাস ছিল বলে শোনা যায়। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামকেও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে পদাবলির চণ্ডীদাস, যাঁর গানে সারা দেশ মুগ্ধ; তিনি নানুর গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদে নানুর গ্রামের উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাস সম্পর্কে এতদ্ভিন্ন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, শুধু বলা যায় যাঁর পদাবলি চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন, যাঁর গানে বাঙালি আজও মোহিত, তিনি চৈতন্যদেবের পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

পদকর্তা চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভা মধ্যযুগের পটভূমিতে একান্ত অভিনব। তাঁর পদাবলির স্থায়ী সুর আক্ষেপানুরাগ ও বেদনার সুর। নিছক দেহকেন্দ্রিক মিলন পদাবলির চণ্ডীদাসে নেই। শ্রীরাধা চরিত্রের জন্য কবি - সাধক চণ্ডীদাস যে অপার্থিব উপাদান অবলম্বন করেছেন তাতে সমস্ত স্থূলতা সূক্ষ্ম মিস্টিসিজমের আবরণে ঢাকা পড়েছে। তাঁর রাধা নন কোনো মর্ত-মানবী। তিনি অধ্যাত্মতীর্থগামী। রাধার কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি চণ্ডীদাসের কাছে শুধু প্রেমের আকর্ষণ নয়, তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ অনন্ত আকাঙ্খার প্রতীক, অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে অন্বিত। শ্রীরাধা কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।

তাঁর রাধার প্রেম বস্তুবোধের রাজ্যে ভ্রমণ করে না। চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম বস্তুত আমিত্ব বিলোপের সাধন, বৃহত্তর জীবন-উপলব্ধির সাধন। চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমানুভূতি অনির্বচনীয় ও ইন্দ্রিয়াতীত। প্রেমের গভীর রাজ্যে যেখানে ইন্দ্রিয় চেতনার স্পষ্টাতা ও স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য, সেখানেই রাধার প্রেম রূপ পরিগ্রহ করে। রাধা বলেন—

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।।

চণ্ডীদাস সরল কথায় ও সহজ ত্রিপদী ছন্দে, সাধারণ অলংকার ব্যবহারের মাধ্যমে রাধার অন্তর্বেদনাকে পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমে মর্তের রূপক-প্রতীকে প্রকাশ করা যায় না, তাই তাঁর রাধার প্রেম অনেকটাই অব্যক্ত। চণ্ডীদাসের রাধা যখন বলেন --

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।

তখন এই প্রেম ভাগবতী উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়। অপার্থিব লাবণ্য, অতৃষ্ণ আবেগ, অচঞ্চল আর্তি সৃষ্টি করে চণ্ডীদাস রাধা চরিত্রের যে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন তা অতুলনীয়। চণ্ডীদাসের ভাষাভঙ্গি, ছন্দ প্রকরণ, বাক্‌রীতি সরল। 'কানুর পিরীত চন্দরে রীতি ঘষিতে সৌরভময়', 'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিয়ে দেহ', 'বদন থাকিতে না পারে বলিতে তেই সে অবলা নাম', 'বণিক জনার করাত যেমন দুদিকে কাটিয়ে যায়', -- ইত্যাদি উক্তিগুলি প্রাত্যহিক জীবন থেকেই উত্থিত, অথচ এরমধ্যেই অসাধারণের ব্যঞ্জনাও প্রস্ফুটিত। সুখের কথায় চণ্ডীদসের অধিকার নেই, দুঃখ-শোক-আক্ষেপ- চণ্ডীদাস তাঁর অতি সাধাবণ ভাষায় তাকেই আমাদের আত্মার দোসর করে তুলেছেন। চণ্ডীদাসের গভীর, স্তব্ধ, নিরুচ্ছ্বসিত, শান্ত ও সংযত রচনারীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন -- "চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর। ... চণ্ডীদাস আসিয়া চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।" রূপ থেকে অরূপের তথা ভাবের দিকে তাঁর যাত্রা, আর সেই যাত্রার চিরন্তন সৌন্দর্য এবং প্রেম-কামনার ও বিরহের সুতীব্র, সুগভীর আর্তিই চণ্ডীদাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

জ্ঞানদাস ঃ

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে যে কয়জন পদকার চিরকালীন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, জ্ঞানদাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনকথা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যের বিশেষ

অভাব আছে। নিত্যানন্দের ভক্তদের তালিকায় তাঁর নাম আছে। জানা যায় তিনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী ও বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত ষোড়শ শতকের তৃতীয়- চতুর্থ দশকে কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়। খেতুরীতে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্মিলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর ভণিতায় প্রায় ৪০০ টি পদ প্রচলিত।

জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর বাংলা পদের তুলনায় ব্রজবুলি পদের কাব্যিক উৎকর্ষ কিছুটা কম। জ্ঞানদাসের প্রতিভা, কবিকৃতি ও গৌরব তাঁর বাংলা পদেরই উপর নির্ভরশীল। বাংলা পদের ক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাসকে এবং ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছিলেন। ব্রজবুলির পদগুলিতে অনুকরণের অতীত কোনো কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করতে জ্ঞানদাস সক্ষম হননি। জ্ঞানদাসের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় এই শ্রেণির পদে নেই। কবির আবেগ যেখানে বহিরঙ্গ ভাষাগত প্রসাধনকে অতিক্রম করেছে, যেখানে তাঁর প্রতিভা উৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করেছে। কবি যখন কৃত্রিম কবিত্ব সংস্কার ত্যাগ করতে পেরেছেন তখনই সারল্য ও আন্তরিকতার গুণে তা শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠেছে। এখানেই চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। অবশ্য চণ্ডীদাসের মতো ইন্দ্রিয়াতীত ও রহস্যময় সুক্ষ্মতম চেতনার ইঙ্গিত জ্ঞানদাস দিতে পারেননি। তাঁর বাংলা পদেও কিছু কিছু চেষ্টাকৃত কবিত্ব লক্ষ করা যায়।

জ্ঞানদাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি বৃন্দাবনের তত্ত্ব-চিন্তার প্রথানুগ প্রকাশ। তাঁর অঙ্কিত শ্রীরাধার বাল্যলীলায় কল্পনার কিছুটা অভিনবত্ব আছে। রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে বর্ণবিন্যাসের প্রতি কবির বিশেষ আগ্রহ ছিল। জ্ঞানদাসের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রসোদগার প্রভৃতি পর্যায়ের কয়েকটি পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে অতুলনীয়। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব গ্রন্থের নির্দেশানুযায়ী বিভিন্ন ভাব পর্যায়ের পদ তিনি রচনা করেছেন। রূপকল্প সৃষ্টি ও প্রথম শ্রেণির কবিকৃতির উজ্জ্বল সাক্ষর হিসাবে নিম্নোক্ত পদগুলি উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে –

(১)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে।।

(২)

তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে।।

(৩)

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।

জ্ঞানদাসের বিশেষ সাফল্য পূর্বরাগ ও অনুরাগ, বিশেষত রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে। এই দুই পর্যায়েই রাধার অন্তরার্তি প্রকাশিত। জগৎ ও জীবন, প্রেমের অনুভূতি, তাঁর বেদনা ও চিত্তচাঞ্চল্যকে কবি রাধার দৃষ্টিতেই প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের কল্পনার রাধিকার সঙ্গে জ্ঞানদাসের আপন চিত্তের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীদাসের মতো তাঁর রাধাও অনেকখানি কবির অন্তরসত্তারই নারীরূপ। রাধার বেদনাবাণী তাঁর হৃদয়ের ঝংকার তুলেছে। এই অর্থে জ্ঞানদাসের গীতিকার অভিধা সার্থক। জ্ঞানদাস হৃদয়ার্তিকে রূপচিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করেন, তিনি ভাবের বর্ণে বস্তুর ছবি আঁকেন। উপমা অলংকারের সীমা ছড়িয়ে যাওয়াই তাঁর স্বভাব। চণ্ডীদাসের মতো তিনি অলংকার বিরল নন, আবার বিদ্যাপতি- গোবিন্দদাসের মতো অলংকারবহুল কবিও তিনি নন। বস্তুত তাঁর অলংকার অতীতের অভিমুখী, আর এখানেই তাঁর কবিধর্মের স্বাতন্ত্র্য।

গোবিন্দদাস ঃ

বৈদ্যবংশোদ্ভূত গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁর বিস্ময়কর কারুনির্মিতি, উদ্বেল আবেগ ও ধ্বনি কেন্দ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বারা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ও রসিক পাঠক সমাজে এক চিরস্মরণীয় ও শ্রদ্ধার্হ আসন লাভ করেছেন। নানা বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁর জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। ষোড়শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন, অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ। পণ্ডিত ও ভক্ত রামচন্দ্র প্রথম যৌবনে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জ্ঞানদাস প্রথম জীবনে শাক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিও বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব পদ রচনা করে বাংলার বাইরে পরিচিতি লাভ করেন। গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত। গবেষকগণের মতে তিনি একমাত্র ব্রজবুলিতেই পদ রচনা করেছিলেন; বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলি অন্য কবির লেখা। গোবিন্দদাসের ভাষা ঝংকারমুখর। ছন্দের বিস্ময়কর কারুকর্ম, শব্দ প্রয়োগ ও চিত্রকল্পের নিপুণ ব্যবহার, কল্পনার আকাশস্পর্শী উৎসার ও আবেগর বিপুল উল্লাস তার কাব্যকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য।

গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত প্রায় ৮০০ টি পদ ড° বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সংকলিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'সংগীতমাধব' নামে একটি সংস্কৃত নাটকও রচনা করেন। কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। বৈচিত্র্যের অনুরোধে তিনি সংস্কৃতেও দু-একটি পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর জীবৎকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বিস্তৃত বলে অনুমান করা হয়। খেতুরী উৎসবে তাঁর রচিত পদ গীত হলে বৈষ্ণব আচার্যগণ কর্তৃক তিনি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন।

গোবিন্দদাসের পদে তৎসম এবং অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগ খুব বেশি। অলংকার ব্যবহারের দিকেও তাঁর বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়। তিনি আদর্শ হিসাবে বিদ্যাপতির কাব্যরীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' অভিধায়

ভূষিত করেছেন। তবে বিদ্যাপতির রাজকীয় আভিজাত্য ও রুচিশিথিলতা, বুদ্ধির দীপ্তি এবং তির্যকতা গোবিন্দদাসে অনুপস্থিত। তাঁর গাম্ভীর্য এবং তত্ত্বচিন্তা সম্পূর্ণ নিজস্ব। ভক্তি গভীরতায়ও তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষাকে আত্মস্থ করে তার সঙ্গে চৈতন্যযুগের ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে এবং অভিনব গীতিধারা সৃষ্টি করেছিলেন। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে তাঁর রচিত গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির বাক্‌মূর্তি ও আবেগ অতুলনীয়। রাধাকৃষ্ণের নানা লীলাপর্যায় অবলম্বন করে তাঁর রচিত পদগুলির মধ্যে আপাত বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে এক সূক্ষ্ম কাহিনিধারাও বর্তমান। মূলত তিনি চিত্ররসের কবি। ভক্তি-আবেগ-আকুলতাকে তিনি চিত্ররূপে সংহত করেছেন। তাঁর চিত্র চিত্তলোকের নয়, বস্তুলোকের। দেহরূপ, গতিভঙ্গি, বস্তুবিশ্ব, প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন যে সব পর্যায়ের কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সেখানেই গোবিন্দদাস স্বচ্ছন্দ। তাই আক্ষেপানুরাগ, মাথুরের তুলনায় অভিসার ও রূপানুরাগের পদে তাঁর সাফল্য অধিক।

বিদ্যাপতির রাধার নবানুরাগে দেহের ভাব অধিক, বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাসের রাধার মধ্যে দেহের সঙ্গে আছে হৃদয়ের অতল রহস্য-ব্যঞ্জনা। গোবিন্দদাসের রাধার অভিসারের পদগুলি বৈষ্ণব পদসাহিত্যে অমরতা অর্জন করেছে। প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধার অভিসারযাত্রার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধরণযোগ্য -

(১)

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ।।
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপি।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপি।।

(২)

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।

কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারেও গোবিন্দদাস অনন্য। শব্দশ্বর্য, অলংকার, ছন্দ ইত্যাদির দ্বারা গোবিন্দদাস আবেগকে সৌন্দর্যলোকের চরম শীর্ষে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। নিম্নোক্ত পংক্তিনীচয়ে ধ্বনিগত সংগীতমাধুর্য প্রকাশিত--

নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন
গন্ধ নিন্দিহ অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।।

এই সমস্ত শব্দগুচ্ছ সুষম অলংকার বিন্যাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, অনুপ্রাসের পরিকল্পনাও প্রশংসনীয়। অবশ্য কবি মাঝে মাঝে শব্দঝংকারের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দু-

একটি কৃত্রিম ধ্বনিগুচ্ছের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অনেক পদে বৈষ্ণব সাধ্যসাধনার 'মঞ্জরী' ভাবের বিশেষ প্রভাব আছে। এই পর্যায়ের পদগুলিকে কবি অপূর্ব ছন্দ, বিস্ময়কর অলংকার, প্রগাঢ় আবেগ অনুভূতির দ্বারা এক শিষ্ট সারস্বত মূল্য দিয়েছেন। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন - "গোবিন্দদাস সাধনার অঙ্গ রূপে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।" কবির ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার আভাস তাঁর পদের ভণিতাতেই লক্ষণীয়। চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের সমস্ত বৈষ্ণব কবি একাধারে কবি ও সাধক, -- গোবিন্দদাস এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

১.৪ অনুবাদ সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সৃষ্টিকর্মের প্রধান ধারাগুলির অন্যতম হচ্ছে অনুবাদ সাহিতের ধারা। অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদেশের উন্নত সৃষ্টি ঐতিহ্যের অসাধারণ নিদর্শনগুলির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় হয়েছে এবং একই সঙ্গে আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার ক্লাসিক মর্যাদায় গৌরবান্বিত হয়েছে। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতক থেকেই এদেশে ইসলাম রাজশক্তির আনুকূল্যে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়। মহাভারতের প্রথম যুগের জনৈক অনুবাদক জানিয়েছেন মুসলমান রাজারা রামায়ণাদির গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। একসময়ে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মমুখী কাব্যগ্রন্থ চর্চার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের সমাজ-নেতারা এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে দুশো বৎসর ব্যাপী পাঠান শাসনে বাংলার হিন্দু সমাজে যে ভাঙন ধরেছে সেই দুর্গতির হাত থেকে হিন্দু-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনকে অতিক্রম করতে হবে এবং সমাজের সর্বত্র পৌরাণিক সাহিত্যগুলির আদর্শ, নীতি ও তত্ত্ব প্রচার করতে হবে। এভাবেই রামায়ণাদি অনুবাদের সম্ভাবনা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছিল। আর এ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল গৌড়ের অবাঙালি রাজন্যবর্গের উৎসাহ ও বদান্যতায়। আমরা অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান তিনটি ধারাকে সংক্ষেপে অনুসরণ করব।

১.৪.১ রামায়ণ

মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান ধারাটি হচ্ছে রামায়ণ অনুবাদের ধারা। এই গ্রন্থই সর্বপ্রথম সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। আসুন, রামায়ণ অনুবাদকগণের কাব্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

কৃত্তিবাস ঃ

রামায়ণই প্রথম সংস্কৃত মহাকাব্য যা বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। এই অনুবাদকর্মের প্রথম কর্মকুশল কবি কৃত্তিবাস ওঝা। বাঙালি পাঠক যে বাংলা রামায়ণ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত তা ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসেরই শ্রমের ফসল, এই মহাগ্রন্থে বাঙালির ধ্যান-ধারণা

ও জীবনাদর্শের প্রতিটি অধ্যায় বিবৃত। কৃত্তিবাস আদিকবি বাল্মীকির সাতকাণ্ড রামায়ণকে বাঙালির জীবনের মহাকাব্যে পরিণত করেছেন। বিগত পাঁচশত বৎসর ধরে বাংলাদেশে কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৃহজীবনের পরিচিত আদর্শকে মহত্তর মূল্য দিয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্রের সংস্পর্শে আসে ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক। হরিশচন্দ্র মিত্রের "কৃত্তিবাস পরিচয় সংগ্রহ" পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ কৃত্তিবাসের পরিচয় সর্বপ্রথম মুদ্রণ-প্রসাদ লাভ করে। ১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করলেও কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় শীর্ষক একটি বড়ো কবিতা আছে। কিন্তু পুরাতন পুথির আত্মপরিচয় শীর্ষক শ্লোকগুলির সঙ্গে মুদ্রিত আত্মপরিচয়ের পার্থক্যগুলি দেখে মনে হয় যাঁরা কৃত্তিবাসের উক্ত আত্মজীবনী ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন তাঁরা অনেক জায়গাতেই অনাব্যশক কলম ছালিয়েছেন। ফলে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী নরসিংহ ওঝা স্বগ্রামে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে নিরাপদ আশ্রয়ের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গীতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধর মুরারি ওঝা, তৎপুত্র বনমালী, বনমালীর জ্যেষ্ঠপুত্র কৃত্তিবাস মাঘমাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মলাভ করেন এবং বারো বৎসর বয়সে উত্তরবঙ্গে পদ্মাতীরে বিদ্যালাভের জন্য যাত্রা করেন। গুরুগৃহে দশ-বারো বছর অধ্যয়ন সমাপ্তির পর প্রথম যৌবনে গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মান লাভ করেন এবং মাতা-পিতা ও গুরুর আদেশে রামায়ণ পাঁচালি রচনা করেন। কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর বিবরণে আছে —

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।"

কিন্তু সেটা কত শকাব্দ তা বলেননি কবি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ শাস্ত্রের নানা গবেষণার শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আনুমানিক ১৩৮৬ থেকে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দেদের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যোগেশচন্দ্রের অনুমান ছিল ১৩৭৭ শকাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কিন্তু এ গণনায় ত্রুটি ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় গণনায় দেখা গেল কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে। কিন্তু তাঁর এই গণনাও সংশয়মুক্ত ছিল না।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে তিনি কোনো মুসলমান নবাবের দরবারে যাননি, গিয়েছিলেন হিন্দুরাজার সভায়। যদি আমরা এ সত্যকে মেনে নিই ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম তাহলে একথাও অনুমান করতে হয় তিনি অন্তত ২০, ২২ বছর বয়সে (আনুমানিক ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে) কোনো গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন। তখন নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়ের সুলতান। কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর বিবরণমূলক শ্লোকের "পূর্ণ মাঘ মাস" অনুসারে গণনা করলে গৌড়ের সিংহাসনে কোনো হিন্দু রাজাকে পাওয়া না। যেহেতু পুরাতন বাংলা লিপিতে 'পুণ্য' এবং 'পূর্ণের' মধ্যে লিপিগত বিশেষ পার্থক্য থাকত না তাই

যোগেশচন্দ্র ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুরোধে 'পূর্ণ' শব্দকে 'পুণ্য' ধরে গণনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ। তিনি অন্তত ২০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গৌড়েশ্বরের সভায় যান। তখন রাজা গনেশ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন কৃত্তিবাস কোনো হিন্দু রাজার সভায় যাননি, গিয়েছিলেন পাঠান সুলতান রুক্‌নুদ্দিন বরবকশাহের সভায়। তবে যোগেশচন্দ্রের গণনা এ অনুমানকে পুষ্ট করে কৃত্তিবাস গনেশের সভায় গিয়েছিলেন। তবু এ ব্যাপারে মতদ্বৈধতা আছে। কারো-কারো মতে এই গৌড়েশ্বর গনেশ নন, তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ।

গৌড়েশ্বরের রাজসভা থেকে ফিরে গিয়ে কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ শুরু করেন। ৩০ বৎসর বয়সে রামায়ণের অনুবাদকর্ম শেষ হয়েছে এবং অনুবাদ করতে অনন্ত ৫ বৎসর লেগেছে। যদি ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ তাঁর গৌড়েশ্বরের রাজসভা গমনের কালহিসাবে চিহ্নিত হয়, তবে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে কৃত্তিবাস ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই রামায়ণ অনুবাদ শেষ করেছিলেন।

কৃত্তিবাস সে যুগেই খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তার প্রমাণ এই যে তাঁর রামায়ণের অনেকগুলো পুথি পাওয়া গেছে। কিন্তু এতে বহু লোকের হস্তাবলেপের ফলে কৃত্তিবাসের ভাষা মূল থেকে অনেকখানি বদলে গেছে। কবি কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিনিটিকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর রামায়ণকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই সঙ্গত। কাব্যের শোভাবর্দ্ধনের মহৎ উদ্দেশ্যে মূল বাল্মিকী রামায়ণ ছাড়াও অন্যান্য রামায়ণ অথবা অন্য সংস্কৃত কাব্য থেকে ধর্মীয় উপদেশমূলক বহু লৌকিক-পৌরাণিক কাহিনি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন কবি কৃত্তিবাস। কিছু স্বতন্ত্র স্বকল্পিত কাহিনিও তাঁর কাব্যে সংযোজন করেছিলেন তিনি। এই কাব্য বাল্মীকির অনুকরণ নয় অনুসরণ। ঘটনা ও চরিত্রে শৈথিল্য থাকলেও কাহিনিগত কিছু ঐক্যও এতে বিদ্যমান। বাল্মীকি রামায়ণ যেরূপ গতিশীল; বীররস ও করুণরসের অভূতপূর্ব মিশ্রণে সমুজ্জ্বল; তার তুলনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ বহুলাংশেই নিষ্প্রভ, কারো কারো মতে এই কাব্য নিতান্তই শিশুরঞ্জক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের ফলশ্রুতি হচ্ছে করুণরস, অযোধ্যকাণ্ডে রাম-নির্বাসন থেকে শুরু করে উত্তরকাণ্ডের সীতা-নির্বাসন ও সীতার পাতাল প্রবেশ — সর্বত্রই করুণরসের প্রাধান্য। সেকালের বাঙালি চিত্তে করুণরসের আবেদনই মুখ্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালিও এর ব্যতিক্রম নয়, সেকালের বাঙালি সমাজ রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম জেনে ভক্তি নিবেদন করেছে। কৃত্তিবাসের হাতে বীর রামচরিত্র ভক্তের ভগবানে রূপান্তরিত হয়েছেন। এমনকি রাবণও যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষারত অবস্থায় রামচন্দ্রের অঙ্গে ব্রহ্ম সনাতনকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন এবং অন্তিম প্রার্থনা জানালেন —

"অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।"

এই ভক্তি বাঙালির নিজস্ব সংস্কার, এই জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামচন্দ্রের মধ্যে বাল্মীকির রামচন্দ্রকে অনুসন্ধান করলে ব্যর্থ হতে হবে। সর্বংসহা বাঙালি বধূরূপী সীতার চরিত্রে তৎকালীন জনগণ নিজস্ব স্ত্রী সমাজকেই প্রত্যক্ষ করেছে। কৃত্তিবাসের কাব্যে অল্পস্বল্প বীররস আছে বটে কিন্তু তা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। তাঁর হাস্যরসিকতা প্রশংসনীয়, তৎকালীন বাঙালি সমাজের উপযোগী রঙ্গকৌতুক পরিবেশনে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হনুমান চরিত্রে যে রঙ্গরস দেখি তা বাঙালি জীবন থেকেই উঠিয়ে আনা। সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত বিদগ্ধ পাঠক হয়তো আদিকবির শিল্প-সমুৎকর্ষ কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাবেন না, তবু এর বাঙালিত্বের জন্যই কৃত্তিবাস ওঝা ও তাঁর কাব্য বাঙালি পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসের পাঁচালি কাব্যমূলের অবিকল অনুসরণ নয়। তিনি যেখানে বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করে অন্য উৎস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করেছেন তার নির্দেশও দিয়েছেন, মূল বাল্মীকি রামায়ণ বর্হিভূত অন্য উৎস সঞ্জাত নানা ছোটো-বড়ো ঘটনা বাদ দিলে কৃত্তিবাসের রচনায় ভক্তির যে স্পষ্ট প্রভাব আছে, তা-ই হচ্ছে তাঁর মৌলিক অবদান।

আমরা যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত তাঁর থেকে একটু নমুনা নিলেই অনুধাবন করা যাবে কৃত্তিবাস কী সহজভাবেই বাল্মীকির মহাকাব্যকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন—

কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।
মন বুঝিবারে বুঝি আমরা জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।।"

এই ভাষা একালের না হোক কখনোই পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের নয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উপর বহু কলমের আচঁড় পড়েছে ঠিকই কিন্তু গোটা কাব্যে শিল্পী কৃত্তিবাসের পরিচয়টিও পাওয়া যায়। বাল্মীকির গম্ভীর রামকাহিনি কৃত্তিবাসের হাতে পাঁচালির তরল বিষয় হয়ে উঠলেও কৃত্তিবাসে আর্য রামায়ণ কাব্যকে বাঙালির জাতীয় কাব্য করে তুলেছেন— এখানেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

সপ্তদশ শতকে রচিত রামায়ণের দু-একটি পালা পাওয়া গেছে, যেগুলির বিশেষ কোনো কাব্যগুণ নেই, তবে এই শতকের রামায়ণ অনুবাদকরূপে অদ্ভূত আচার্য ছিলেন অনেকাংশে সম্ভবনাসম্পন্ন।

১.৪.২ মহাভারত

সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে মহাভারতের চর্চা বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় মহাভারত অনুবাদের প্রচেষ্টা শুরু

হয়। বাল্মীকির রামায়ণ মুখ্যত রাজবংশের কাহিনি এবং আর্যবিজয়ের ইতিহাস হলেও এই কাব্যে লোকায়ত গার্হস্থ্য জীবনরসের উপাদানও ছিল প্রচুর, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারত যেন শুধুই আর্যরাজবৃত্তের সংগ্রামশীল ভাঙাগড়ার ইতিহাস। ফলে সাধারণ বাঙালি চিত্তের তুলনায় রাজরাজড়াদেরই যেন এ কাব্যের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। আর, তাই রাজপ্রতিনিধির কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত কাব্য অনূদিত হয়েছিল। এই কাব্যের প্রাচীন ও আদি অনুবাদক হিচাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী ও সঞ্জয়।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ

মহাভারতের বাংলা অনুবাদক হিসাবে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ব্যক্তি পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের সময়ে চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ হিন্দুদের গ্রন্থাদির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে এমনভাবে মহাভারত অনুবাদ করতে বললেন, যাতে একদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ কাহিনি শোনা যায়। পরমেশ্বর খুব সংক্ষেপে সরল ভাষায় মহাভারতের একটি অনুবাদ উপস্থাপিত করেছিলেন। সম্ভবত হুসেন শাহের গৌড় সিংহাসন লাভের সময় থেকে (১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের রাজত্বকালের (১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে কবীন্দ্রের মহাভারত রচিত হয়। এটিই প্রথম বাংলায় মহাভারত অনুবাদ।

পরমেশ্বরের রচিত সংক্ষিপ্ত 'পাণ্ডববিজয়' নামক ভারতকথা, ব্যাস মহাভারত অবলম্বনে বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে বিবৃত একটি ভাবানুবাদ। তাঁর রচনায় বিশেষ কোনো শিল্পচাতুর্য লক্ষ করা যাবে না। তাঁর রচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কবীন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, স্বতঃপ্রবহমানতা। তাঁর পরিচ্ছন্ন অনলঙ্কৃত সুখপাঠ্য বর্ণনা প্রসাদগুণে সরস হলেও অভূতপূর্ব কবিত্বের বিচ্ছুরণ তাতে নেই। তবে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত পয়ার ছন্দে রচিত বিবৃতিমূলক ছত্রগুলির বর্ণনায় তিনি কিছু কিছু উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে চিত্রধর্মিতা সৃষ্টি করেছেন। কর্ণ ও কৃষ্ণের সংলাপ কবীন্দ্র অল্পকথায় নাট্যরস সঞ্চার করেছেন।

শ্রীকরনন্দী ঃ

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কিছুকাল পরে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকরনন্দী নামে আর এক হিন্দু কবি জৈমিনি ভারত অনুসরণে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। ছুটি খানের সভায় হিন্দু পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত জৈমিনির অশ্বমেধপর্বের আলোচনা শুনে ছুটি খান পাণ্ডদের বিজয় কাহিনি বাংলায় অবগত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। জৈমিনির নামে প্রচারিত অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে রচিত শ্রীকরনন্দীর অনুবাদ আক্ষরিক নয়, শাসকের বোধগম্য ভাষায় মূল গঠনকে বর্ণনা করে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের

অনুগ্রহ অর্জন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকরনন্দী শুধু অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেছিলেন বলে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে মূলকে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। হাস্যরসে শ্রীকরের বেশ অধিকার ছিল, ভীম ও কৃষ্ণের ব্যঙ্গোক্তি, কৌতুকমিশ্রিত তীক্ষ্ণ বাক্‌রীতি অনেকটা ভারতচন্দ্রের মতো। জৈমিনি ভারতে ভীম ও কৃষ্ণের আহার ও রঙ্গরসের বর্ণনা শ্রীকরনন্দীর অনুবাদে মূলের অনুগত। তবে তাঁর কাব্যের সৌষ্ঠব কিছুটা ম্লান। তাঁর বর্ণিত সত্যভামার উক্ত নিছক রঙ্গ পরিহাসের ব্যাপার। দ্রৌপদী-বাসুদেব সংক্রান্ত কোনো ইঙ্গিত তাঁর কাব্যে নেই, এদিকে থেকে বাঙালি কবির রুচি প্রশংসনীয়। শ্রীকরের ভাষা ইষৎ লঘু ধরনের, ভাষায় বিশেষ অলঙ্করণ নেই। কাশীরামের মতো না হলেও অনুবাদক হিসাবে শ্রীকরনন্দী গুরুত্বহীন নন।

সঞ্জয় ঃ

সঞ্জয় নামে আরেকজন কবির মহাভারত পাওয়া গেছে। কারো কারো মতে সঞ্জয় কোনো আলাদা কবি নন, তিনি কবীন্দ্রের মহাভারতের একজন লিপিকর। আবার অন্য মতে সঞ্জয় নামে একজন কবি ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়ই মহাভারতের প্রথম অনুবাদ, সঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে পরমেশ্বরের রচনার সাদৃশ্য বহুলাংশে বর্তমান।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ সঞ্জয়ের এক পুথি থেকে উদ্ধার করেছেন —

"দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার।
সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালি প্রকার।।

অতএব সঞ্জয় নামক কোনো স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার গবেষণান্তে প্রমাণ করেছেন কবীন্দ্রই আসল অনুবাদক, সঞ্জয়ের নামে কোনো মহাভারত পাওয়া যায়নি।

সঞ্জয়ের গ্রন্থের রচনাকাল জানা যায়নি। কবীন্দ্র এবং শ্রীকরনন্দীর তুলনায় তাঁর ভাষা অর্বাচীন, রচনাভঙ্গি বেশ সহজ, সরল। সঞ্জয়ের মহাভারতের দ্রোণপর্বে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' শীর্ষক একটি আখ্যান পাওয়া গেছে। নারীদের যুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা ধর্মমঙ্গল ভিন্ন মধ্যযুগের অন্য কোনো কাব্যে বিরল।

বিজয়পণ্ডিত ঃ

উনিশ শতকের শেষে নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক বিজয়পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি মহাভারতের আদি অনুবাদক রূপে ঘোষিত হন। কিন্তু বিজয়পণ্ডিতের নামে আবিষ্কৃত পুথিতে তাঁর কোনো ভণিতা ছিল না। অন্যদিকে বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলি মহাভারতের হুবহু সাদৃশ্য বর্তমান। পরাগলি ভারত সংক্ষিপ্ত, অন্যদিকে বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত বিস্তারিত। মহাভারত অনুবাদের ইতিহাসে কবীন্দ্র এবং বিজয়পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল অর্থাৎ কে কার পূর্বজ এবিষয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি

হয়েছে তার নিরসনে গবেষকগণের প্রচেষ্টায় জানা যায় পরাগলি মহাভারতে 'বিজয় পাণ্ডব' সংক্রান্ত ভণিতার অংশটুকু লিপিকর প্রমাদে 'বিজয় পাণ্ডব' থেকে বিজয়পণ্ডিতে রূপান্তিত হয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদকদের কেউই মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেননি। বাংলায় মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদের প্রয়াস সপ্তদশ শতকের প্রতিভাধর কবি কাশীরাম দাসই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। কাশীরামের আগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, মহাভারতের কয়েকটি পর্ব অনুবাদ করেছেন তবে এসব রচনার সাহিত্যগত গৌরব নেই বললেই চলে। কেবল নিত্যানন্দ ঘোষের একটি মহাভারতে বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকে নকল করা নিত্যানন্দের একটি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

১.৪.৩ ভাগবত

মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ভাগবত অনুবাদের ধারাটি অত্যন্ত ক্ষীণ। রামায়ণ মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের কাহিনি বাঙালি পাঠক সমাজে ততটা জনপ্রিয় হতে পারেনি। মধ্যযুগে শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু।

মালাধর বসু ঃ

মালাধর বসুই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের কিয়দংশ মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। ভাগবতের যে অংশে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনি বিবৃত আছে, মালাধর সেই দুটি অধ্যায় অর্থাৎ ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের সংক্ষেপে অনুবাদ করে এদেশে বৈষ্ণব মতের প্রথম সূচনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায় বর্ধমানের প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রামের বিখ্যাত কায়স্থবংশে তাঁর জন্ম হয়; তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। চৈতন্যাবির্ভাবের কয়েক বছর আগে মালাধর ভাগবতের দুই স্কন্ধের সরল সংক্ষিপ্ত অনুবাদ উপস্থিত করেন। তিনি চৈতন্যদেবের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অংশটিকে নিপুণতার সঙ্গে সরল বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর। তাঁর কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

মধ্যযুগের সাহিত্যধারায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন —

> "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
> চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।"

অর্থাৎ ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মালাধর তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে গৌড়ের তৎকালীন সুলতান রুকন্‌উদ্দিন বরবকশাহ তাঁকে

'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —

"গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খাঁ।"

কবির লক্ষ্য ছিল পুরাণ কথিত হিন্দুধর্মের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। কৃষ্ণকথা ভাষায় বলে কবি লোকনিস্তার করতে চেয়েছেন ধর্মীয় আদর্শে। কিন্তু সমকালে যবন-শাসন ও অত্যাচারের কথাও উল্লিখিত হয়েছে—

"ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম পালিব,
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব।"

মুসলমান ধর্মের প্রসার রোধ করার সংকল্পে হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শ জনগণের মধ্যে বিস্তারের চেষ্টা— মালাধরের অনুবাদের পশ্চাতে অর্ধচেতনভাবে হলেও সে ভাবনা উপস্থিত ছিল।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বিখ্যাত গ্রন্থ হলেও বৈষ্ণব সমাজের বাইরে এর বিশেষ প্রচার ছিল বলে মনে হয় না। কাব্যনামের 'বিজয়' শব্দটিকে কবি শ্রীকৃষ্ণের গৌরবকাহিনি বা শোভাযাত্রা বা মঙ্গলকথা অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি যে দুটি স্কন্ধের অনুবাদ করেছিলেন তাতে জনরুচির দিকে নজর রাখতে গিয়ে কাহিনিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তত্ত্বাংশ অবহেলিত হয়েছে। এই কাব্য চৈতন্যদেব কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। এই কাব্যেই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" ছত্রে পরবর্তী যুগের রাগানুগামার্গীয় সাধনার ইঙ্গিত ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব সমাজেও মালাধর অদ্যাবধি পূজিত। সরল পয়ার-ত্রিপদীতে ঘটনাবস্তু বিবৃত করা ছাড়া এই কাব্যে আর কোনো বিশেষ গুণের সন্ধান না পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে চৈতন্য প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ-সাহিত্যে যে নবজাগরণ শুরু হয় তার কিছু আভাস শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে। শিল্পবস্তু হিসাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় অসাধারণ গুণসম্পন্ন না হলেও এটি যে বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্যের প্রবেশক গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে — একথা অনস্বীকার্য।

১.৫ মঙ্গলকাব্য

বাংলাদেশে খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক লৌকিক সংমিশ্রিত লীলামাহাত্ম্য-ব্যাপক সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলিই মঙ্গলকাব্য বলে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের লিখিত রূপ পঞ্চদশ শতকের আগে পাওয়া না গেলেও ত্রয়োদশ শতক থেকেই মেয়েলি ব্রতকথায় মঙ্গল দেবতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে আর্য আগমনের পর এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা অনার্য গোষ্ঠীগুলির আর্যিকরণের প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে একটি নবোৎপন্ন মিশ্র সংস্কৃতির সাহিত্যিক নিদর্শন এই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল দেব-দেবীরা মূলত অনার্য গোষ্ঠীর দেবতা। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী,

যিনি কিনা অনার্য অঁরাও গোষ্ঠীর চাণ্ডিবোঙ্গা; নাগম্মা, মঙ্কাম্মা— যিনি বাংলাদেশের সর্পভীত আর্যেতর জনগোষ্ঠীর সর্পদেবতা; কৃষকদের আরাধ্য লৌকিক 'বাবা শিব', রাঢ়ভূমির লোকজীবনে পূজিত ধর্মঠাকুর, এই আর্যিভবনের প্রক্রিয়ায় আর্যগোষ্ঠীর দেবতা, যথাক্রমে— মহামায়া, মনসা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেন।

এই সমস্ত দেবতার পূজা মাহাত্ম্যের জন্য প্রচারিত অপৌরাণিক, লৌকিক, পাঁচালি কাব্যগুলির 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণটি যথার্থ কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। যদিও বহু ব্যবহারে 'মঙ্গলকাব্য' নামটিই সাহিত্যসমাজে গৃহীত হয়েছে। মঙ্গল রাগের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বা দ্রাবিড় প্রভাব থেকে মঙ্গল নামটি এসেছে— এরূপ ধারণা এই নামকরণ প্রসঙ্গে অসঙ্গত নয়। আবার জনবিশ্বাস অনুযায়ী এইসব দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্যকীর্তন এমনকি শ্রবণেও মঙ্গল হয়। যে কাব্য মঙ্গলাধার তা ঘরে রাখাও মঙ্গলের, আর বিপরীতটি অমঙ্গলের, আর তাই এসব দেবতায় বিশ্বাস-ভক্তি স্থাপন করলে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ঘটে— এই অর্থেই 'মঙ্গলকাব্য' নামটি সর্বজনীনতা লাভ করেছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ শাসনাবসানে হিন্দু সমাজের পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয় তুর্কি আক্রমণ, এই আক্রমণে বিমূঢ় বাঙালি জাতি হারাল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সমাজ নৈতিকতায় দেখা দিল চূড়ান্ত অবক্ষয়। বিদ্ধস্ত মানুষ এই অরাজক অবস্থায় আশ্রয় চাইছিল এক মহাশক্তির, যিনি মৃতকল্প জাতিকে রক্ষা করবেন। শক্তিসম্পন্ন এই দেবতাকে অতএব হতে হবে ক্রুর প্রতিহিংসাপ্রবণ, আবার যিনি দান করবেন বরাভয়, ভক্তের প্রতি হবেন প্রসন্ন। তুর্ক-বিজয়ের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সময়ে সাধারণ বাঙালি জীবনের স্বল্পতম দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য-চাহিদারই আন্তর অভীপ্সা মূর্ত হয়ে উঠেছে মঙ্গল দেব-দেবীদের রূপায়ণে। তারা তখন শরণ চাইছিল এমন শক্তিধর দেবতার, যিনি ভক্তের কাছে বরাভয় মূর্তিতে হাজির হবেন, আবার ভক্তের কল্যাণের জন্য ভক্তের শত্রুর বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করবেন— শরণাগতকে করবেন ত্রাণ। তুর্ক-বিজয়ের পরবর্তী সামাজিক- রাষ্ট্রীয়- রাজনৈতিক অস্থিরতার সন্ধিক্ষণে ইসলামের ধর্মীয় সর্বগ্রাসিতার প্রবলতর দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাচ্যুত অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রধানদের সৃষ্ট সংস্কৃতি প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে বাঙালি হিন্দু একটা সংহত জাতি হিসাবে দেখা দিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আপোস-সমন্বয়ের ফলে পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটল। সমাজে পৌরাণিক প্রভাব গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলে লৌকিক দেবতাদের আর্যিকরণ ঘটতে লাগল, ফলে মঙ্গল দেবদেবীরাও জাতে উঠলেন, অনার্য ব্যাধ জাতির দেবতা চণ্ডী ক্রমে শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। আর্যমণ্ডল বহির্ভূত সর্পদেবী মনসা সমন্বয়ের যুগে শিবের মানসকন্যা হিসাবে প্রচারিত হলেন, অপৌরাণিক পুরুষ দেবতা ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর সামীপ্য লাভ করলেন। অনার্য কুলসম্ভব এ সব মঙ্গল দেবদেবীর সঙ্গে উচ্চ দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, মোক্ষমুক্তি দানে তাঁদের আগ্রহ নেই। ইহলোকে সুখ, ভোগ অন্তে বৈকুণ্ঠ-গমন— যে বৈকুণ্ঠ রূপে সম্পদে মর্ত-পৃথিবী থেকে উন্নততর এক ভোগপুরী মাত্র। পার্থিব অভাব অভিযোগ দূর করা, ভয়ভীতি

নিবারণ করা, বাস্তব কামনাবাসনা চরিতার্থ করাই এই দেবতাদের সার্থকতা। এ সব দেবদেবী একান্তভাবেই মনুষ্যলক্ষণে পুষ্ট। হিংসা-ঈর্ষা-প্রবৃত্তির তাড়না, দারিদ্র্য-দুঃখ জর্জরিত তাঁদের স্বাভাবিক মানবিক পরিচয় দেবত্বের স্বচ্ছ আবরণে সর্বাংশে আবৃত হয়নি।

মঙ্গলকাব্যের বিষয় এবং গঠনপদ্ধতিগত ঐক্যের ফলে মঙ্গলকাব্য একটা প্রথানুগ কাব্যরীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চদশ শতকেই। মঙ্গলকাব্যের লোকভিত্তি, পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ, মানবিক স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলাদেশের মৌলিক আখ্যানধারা হিসাবে পরিচিত মঙ্গলকাব্যে ঘটনার বিন্যাসে, সংঘাতে, চরিত্রচিত্রণে যুগোচিত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ ছবি পাওয়া যায়। আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সমাজচিত্রকে কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করা ছিল কবিদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় রীতি। এ ছাড়াও নারীগণের পতিনিন্দা, বারোমাস্যা, চৌতিশা ইত্যাদিও ছিল মঙ্গলকাব্যের রীতিগত বৈশিষ্ট্য। দেবখণ্ডে কাহিনির আরম্ভ। সেখানে পুরাণ ও লোককথার মিশ্রণ দেখা যায়। মর্তে পূজাপ্রাপ্তির জন্য মঙ্গলদেবতা কর্তৃক স্বর্গের কোনো অধিবাসীকে শাপদান ও মর্তে প্রেরণ। তারপর নরখণ্ডের শুরু— এখানে পাপস্খালন এবং দেবতার পূজা প্রচারের পর শাপমুক্তি এবং পুনরায় স্বর্গারোহণের মাধ্যমে কাহিনির সমাপ্তি।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের এই বৃহৎ ধারা নানা শাখায় বিস্তার লাভ করেছিল। সাধারণত চণ্ডী, মনসা এবং ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের মানদণ্ডে রসোত্তীর্ণ এবং অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল বলে এই তিনটি শাখাই মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা হিসাবে গণ্য। তবে ভারতচন্দ্রের শিল্প-সাধনায় অন্নদামঙ্গল বিশিষ্টতার গৌরব অর্জন করেছে। আমরা বর্তমান পত্রে একে একে এই চার প্রকার মঙ্গলকাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১.৫.১ মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম কাব্য। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেই এর সূত্রপাত। প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে মঙ্গলকাব্যের এই একটি ধারাই বিকশিত হয়েছে। জলজঙ্গলের বাংলাদেশে এসে আর্যরা সর্পদেবীর পূজাকে অস্বীকার করতে পারলেন না, তাঁকে শিবের অযোনিজা কন্যারূপে স্বীকার করে নিলেন। মঙ্গলকাব্যের সামান্য গঠনরীতি অনুযায়ী মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের কাহিনি চারভাগে বিভক্ত। দেববন্দনা, সৃষ্টিপত্তন, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, আত্মপরিচয়, শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম ইত্যাদি গতানুগতিকতা বাদ দিলে দেবখণ্ডে মহাদেবের মানসকন্যা মনসার জন্ম, চণ্ডী-মনসার কলহ, মনসার কৈলাসত্যাগ ইত্যাদি বিবৃত। দ্বিতীয় খণ্ডে মনসার পূজা গ্রহণের চেষ্টা ও হাসান হোসেন জয়, চাঁদ সদাগরের মনসাপূজায় আপত্তি ও দেবীর ঘটভাঙা, ধন্বন্তরিবধ, চাঁদের ছয়পুত্রের প্রাণনাশ, সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, চৌদ্দডিঙা নিমজ্জন, লক্ষ্মীন্দরের জন্ম— বহু দুর্যোগশেষে চাঁদের প্রত্যাবর্তন থেকে লখাই-বেহুলার বিয়ে ও লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগ

দংশন ও মৃত্যু; তৃতীয় খণ্ডে সতীত্বের জয়ধারা উড়িয়ে মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলার দেবপুরে যাত্রা, দেবতার প্রীতিসম্পাদন, লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবন, ছয়পুত্রের জীবনদান, চৌদ্দডিঙা উদ্ধার ও প্রত্যাবর্তন; শেষখণ্ডে চাঁদের অন্তর্দ্বন্দ— পরিশেষে সকলের অনুরোধে বামহাতে মনসার পূজা, মর্তে পূজা প্রচারান্তে উষা-অনিরুদ্ধের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে কাহিনির সমাপ্তি।

যদিও চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই মনসামঙ্গল কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল, তবু চৈতন্য পরবর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যই প্রথম মুদ্রণ প্রসাদ লাভ করেছিল (১৮৮৪)। অন্তত, তিনজন শক্তিমান কবি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কাব্যরচনা করেছেন। এঁদের দুজন বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব পূর্ববঙ্গের এবং বিপ্রদাস পিপলাই পশ্চিমবঙ্গের কবি, তবে এঁদের পূর্বে মনসামঙ্গলের আদিকবি বলে খ্যাত কানা হরিদত্তের পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

কানা হরিদত্ত ঃ

ইনি মনসামঙ্গলের আদিকবি। ইনি কবি কি গায়েন এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, এর কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কানা হরিদত্তকে বিজয়গুপ্তের শতাব্দীপূর্বে স্থাপন করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে তিনি একজন ব্যালাড লেখক, ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন কানা হরিদত্ত অষ্টাদশ শতকের একজন বৈদ্য। তবে কানা হরিদত্তর অস্তিত্ব যে মনসামঙ্গল যুগের প্রথমদিকের— তা এই কাব্যধারায় প্রথম যুগের কবি বিজয়গুপ্তের একটি পদে জানা যায়—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।

হরিদত্তের "দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী", ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে "পদ্মার সর্পসজ্জা" শীর্ষক বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ছএকে দীনেশচন্দ্র সেন বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

বিজয়গুপ্ত ঃ

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ গ্রন্থখানি বাংলা ১৩০৩ সনে প্যারীচরণ দাসগুপ্তের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বৈদ্য বংশজাত কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা (ফুল্লশ্রী) গ্রামের লোক; এই গ্রামে তাঁর পূজিত বলে কথিত একটি পিতলের মনসামূর্তি আছে। বইটিতে সম্ভবত প্যারীচরণবাবু কলম চালিয়েছেন, কিছু আধুনিক শব্দ এতে লক্ষ করা গেছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে রচনাকাল নির্দেশক যে পদগুলি আছে

তাতে পরস্পর অনৈক্য রয়েছে। যেমন— (ক) ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত (১৪১৬ শক = ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ), (খ) ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক (১৪০০ শক= ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ), (গ) ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক (১৪০৬ শকাব্দ =১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। গ্রন্থের বিভিন্নত্র পৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালের উল্লেখ থাকায় (১৪৯৩-১৫১৮) প্রথম সময়জ্ঞাপক পদটিকেই যথার্থ বলে গ্রহণ করতে হয়। বিজয়গুপ্তকে কেউ কেউ মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বললেও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণদেবের তুলনায় বিজয়গুপ্তের মুদ্রিত গ্রন্থকে অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল বলে মনে করেন।

বিজয়গুপ্তের কাব্যে উৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় নেই— "চন্ডীমনসা-গঙ্গার কোন্দল কলহবিদ্যা পটিয়সী জনপদবধুদিগকেও লজ্জা দিবে।" মনসামঙ্গলের শিব ব্যভিচারী হলেও নৈতিক দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন না; কিন্তু বিজয়গুপ্তের কামলোলুপ শিবের মধ্যে সেই চারিত্রিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। চাঁদ সদাগরের মতো দৃঢ় চরিত্রও বিজয়গুপ্তের হাতে কামলোলুপ হয়ে উঠেছে। চৌদ্দডিঙা হারিয়ে "চারিপন" কড়ি পেয়ে চাঁদ ভাবছেন—

একপন কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আরেক পন কড়ি দিয়া চিরা কলা খাব।।
আরেক পন কড়ি নিয়া নটী বাড়ি যাব।
আরেক পন কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব।।

মনসা চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে ঈর্ষাতুর নীচতা, তবে বেহুলার রূপ ও বেশভূষা বর্ণনায় কবি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দু-একটি পংক্তি জনজীবনে বহুল প্রচলিত প্রবচনের মর্যাদা পেয়েছে।

নারায়ণদেব ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় সুকবিবল্লভ নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ কাব্য বাংলা ও আসামে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কেউ কেউ নারায়ণদেবকে প্রাচীন অসমিয়া কবি বলতে চান। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে নকল করা তাঁর একটি পুথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। নারায়ণদেব জাতিতে কায়স্থ, তাঁর পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ ছেড়ে মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার 'বোর' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির মতে কবির জন্ম বোর গ্রামে হলেও তিনি শ্রীহট্টের নগর গ্রামে বাস্তু উঠিয়ে আনেন। নারায়ণদেবের কাল নিয়েও বিতর্ক আছে। তাঁর কাব্যে হুসেন শাহের উল্লেখ না থাকায় হুসেনি রাজত্বের পূর্ববর্তী সময়ে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের একজন কবি বলে তাঁকে ধরে নেওয়া হয়েছে। নারায়ণদেব শক্তিশালী কবি। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত পুরাণ, মহাভারত, এমনকি বৈষ্ণব ধর্মেরও খানিকটা প্রভাব রয়েছে। দেবখণ্ডটিকে তিনি প্রায় পুরাণের আকার দিয়েছেন। হাস্য ও করুণরসের অভিব্যক্তিতে ইনি বিশেষ পারদর্শী, ব্যঙ্গের তির্যকতা তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য গুণ। ডুমুনী বেশিনী চণ্ডীর প্রতি মহাদেবের কামাসক্তি দেখে দেবীর ব্যঙ্গোক্তিটি হাস্যোদ্রেক করে—

'ডুমুনি বোলে দাড়ি পাকাইলা কি কারণ।
....নারীর উপরে এখনেহ মন।।
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকা বেল।।'

চন্দ্রধর চরিত্রে দৃঢ়তা কোমলতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন আমাদের কবি। পুত্রের মৃত্যুর শোক দুর্বলতার চরম মুহূর্তে চাঁদ হাহাকার করে উঠে, কিন্তু তারপরেই—

"চান্দো বলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে
বিচারিয়া চাহি নাগ কোনখানে আছে।।"

পদ্মার প্রতি মন্দ বচন বলা, মৃত পতির সঙ্গে দেবপুরে যেতে বেহুলা চাঁদের কাছে কলার ভেলা চাওয়ায়—

"চান্দো বলে এক দুঃখ মৈল আমার বেটা।
তাহা হৈতে অধিক দুঃখ কলা যাইব কাটা।"—

চাঁদ সদাগরের এইতো স্বভাব-চিত্র। শোকে সে উন্মাদ, হিংসায় সে অসুর, স্বার্থে সংকীর্ণচিত্ত। যে চাঁদ— "কণ্ঠে থাকিতে জান না পুজিবোঁ লঘু কানি" বলে, সেই চাঁদকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বলতে হয়েছে— "পিঠ দিয়া বাম হাতে তোমারে পুজিবোঁ।" চাঁদ সদাগরের ট্র্যাজেডি এখানে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

বিপ্রদাস পিপ্‌লাই ঃ

ইনি আদি-মধ্য যুগের মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রাচীন কবি, সুকুমার সেনের মতে আদি ও অকৃত্রিম কবি। বিপ্রদাসের কাব্যের নাম মনসাবিজয়। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কাহিনিটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ; ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন এবং উৎকট-আতিশয্য বর্জিত। বিপ্রদাসের মনসা অপেক্ষাকৃত কোমল ও ভক্তবৎসলা, চাঁদের চরিত্রও মোটামুটি সংগত। ছেলের বিবাহে আনন্দিত বাবার চিত্রটি বড়ো অদ্ভুত—

"চাঁদো রাজা নাচে কান্ধে হেঁতালের বাড়ী
ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁপ দাড়ি।"

কাব্যশেষে চাঁদ মনসার কাছে তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আবেদন করলে মনসা তাঁর মাথায় পদাঘাত করেন— এ ব্যাপারটিও অভিনব।

এই তিনজন কবি ছাড়াও মনসামঙ্গলের অসংখ্য কবিদের মধ্যে যে কয়জন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন চৈতন্য পরবর্তী যুগের পশ্চিমবঙ্গের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, উত্তরবঙ্গের তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল, পূর্ববঙ্গের ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও বাইশ কবি মনসামঙ্গল বা 'বাইশা' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আমরা এইসব কবি ও তাঁদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

চৈতন্য পরবর্তীকালে যেসকল মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়, পূর্ববর্তী কাব্যের তুলনায় গৌরবে সেগুলি হীনতর। এই যুগের সমস্ত কাব্যই কিছু নিষ্প্রাণ এবং গতানুগতিক। মঙ্গলকাব্য রচনা এযুগে একটা প্রথানুগ শিল্পরীতি হয়ে দাঁড়াল, কবিত্বই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রধান প্রেরণা রূপে দেখা দিল। ধর্মবিশ্বাস প্রকাশিত হল গৌণ প্রেরণা রূপে। চৈতন্য-প্রভাবে এক মধুর-কোমল বৈষ্ণবীয় প্রভাব মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করল। ভক্তি, শক্তির স্থান লাভ করল।

১.৫.২ চণ্ডীমঙ্গল

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই মাতৃকা মূর্তির পূজা হয়ে আসছে। বাংলাদেশে কিরাত, ব্যাধ ইত্যাদি অনার্য গোষ্ঠীর পূজিতা দেবী চণ্ডীকার বিস্তৃত বিবরণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে। আদিতে স্বর্ণগোধিকা লাঞ্ছিতা চণ্ডী আর্যদের সমাজেই পূজিতা ছিলেন। পরে এর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এবং মেয়েলি ব্রতকথা মিশে যায়; একে ঘিরে কালকেতু ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনি গড়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীকা আদিতে যাই থাকুন না কেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী, শিবের পার্বতী এবং ব্রতকথার মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে মিলে গিয়ে তিনি একটি বিমিশ্র ধর্ম-চেতনার ফসল। বর্তমানকালে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ছাড়া চণ্ডীপূজা বিরল হয়ে গেছে।

বাংলা চণ্ডীকাব্য দুটি খণ্ডে পাওয়া যায়, আক্ষেটি খণ্ডে ব্যাধ কালকেতুর গল্প এবং বণিকখণ্ডে ধনপতির গল্প। কালকেতুর গল্পে প্রথমদিকে হর পার্বতীর ঘর গেরস্থালির পর ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের অভিশপ্ত হয়ে কালকেতুরূপে এবং পত্নী ছায়ার ফুল্লরারূপে ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ, মর্তে যথারীতি তাদের বিবাহ, ব্যাধ কালকেতুর শিকারযাত্রা ও শিকার না পাওয়া, পথে পড়ে থাকা সুবর্ণ গোসাপের উপর ক্রোধ, গোসাপকে বেঁধে বাড়ি আনা, দেবীর ছলনা ও স্বমূর্তি গ্রহণ, কালকেতুকে ধন প্রদান, অতঃপর কালকেতুর নগর প্রতিষ্ঠা, ভাঁড়ু দত্তের ছলনা ও কলিঙ্গ-গুজরাট যুদ্ধ, কলিঙ্গ রাজ্যের কারাগারে কালকেতুর বন্দীদশা এবং দেবীকর্তৃক কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন প্রদর্শন, কালকেতুর মুক্তি, দেবীর পূজা প্রচার এবং কাল পূর্ণ হলে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের কাহিনি বর্ণিত। এই অংশে ব্যাধের নিকট দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠা হল, আর পরবর্তী বণিকখণ্ডের গল্পে সমাজের উন্নত শ্রেণির বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবী চণ্ডী স্বীকৃতি পেলেন। অভিশপ্ত স্বর্গ-নর্তকী খুল্লনার সঙ্গে ধনপতি সদাগরের বিবাহ, সতীন লহনার হাতে লাঞ্ছনা, বনে চণ্ডীপূজা দেখে খুল্লনার চণ্ডীপূজা এবং পরিণতিতে ধনপতির ফিরে আসা, — এটুকু কাহিনির প্রথমাংশ। ধনপতির দ্বিতীয়বার বাণিজ্যযাত্রার সময় খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় চণ্ডীপূজা করল। এতে শৈব ধনপতির ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে চণ্ডীর ঘটভাঙা, এরজন্য পথে খুব শাস্তিভোগ ও নৌকাডুবি, অনেক কষ্টে সিংহলে পৌঁছানোর পথে কমলেকামিনী মূর্তি দর্শন, সিংহল রাজার কাছে বিবৃতি, সিংহলরাজের অবিশ্বাস, কমলেকামিনী প্রদর্শনে ব্যর্থতা ও বন্দী হওয়া; অনেকদিন

পর পিতার সন্ধানে খুল্লনাপুত্র শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা, পথিমধ্যে কমলেকামিনী দর্শন, কিন্তু একইভাবে সিংহলরাজকে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হওয়া, শ্রীমন্তকে শূলে চড়ানোর আদেশ, কারাগারে পিতাপুত্রের মিলন, দেবীর কৃপায় শ্রীমন্তের রক্ষা পাওয়া, তার সঙ্গে সিংহলরাজের মেয়ের বিবাহ, পিতা-পুত্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং ধনপতি কর্তৃক ভক্তিভরে চণ্ডীপূজা। এখানেও মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী কাল পূর্ণ হলে স্বর্গারোহণের কাহিনি বর্ণিত।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম গল্পটি বেশ সংহত, কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটি ক্লান্তিকর। প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই চণ্ডীকাব্য রচনার শুরু। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্য এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব যুগের চণ্ডীকাব্যের কোনো নিদর্শন অদ্যাবধি অজ্ঞাত। ষোড়শ শতকে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিই সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে। আমরা এই কাব্যের প্রধান কয়েকজন কবি ও তাঁদের কাব্যকৃতির বিষয়ে আলোকপাত করছি।

মাণিক দত্ত ঃ

মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি। ইনি সম্ভবত মালদহের লোক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এই কবির কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। মুকুন্দরাম তাঁর অভয়ামঙ্গলে একাধিকবার মাণিক দত্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন—

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।"

—এতে মাণিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর নামে প্রাপ্ত পুথির ভাষা একেবারে হাল আমলের হওয়ায় তাঁর প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। আধুনিককালে মাণিক দত্ত সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বলা যায় মাণিক দত্তের কাব্যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে। তাঁর কাব্যের সৃষ্টিপত্তন অংশের তুলনায় কালকেতু ও ধনপতির আখ্যান সংক্ষিপ্ত। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র বাদ দিলে মাণিক দত্তের কাব্য পাঁচালির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেন।

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য ঃ

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য নামে পরিচিত একজন কবির চণ্ডীকাব্য উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামে সুপরিচিত। চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত পুথি অনুযায়ী দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তবে কবি নিজে তাঁর কাব্যকে কোনো কোনো স্থলে সারদাচরিত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পুথিতে প্রাপ্ত সময়জ্ঞাপক শ্লোক থেকে রচনাকাল এবং আকবরের নাম পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য রচিত হয়। কিন্তু এই সময়ে আকবরের কোনোপ্রকার প্রভাব চট্টগ্রামে সঞ্চারিত হয়নি।

অতএব রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। কবির ব্যক্তি পরিচয় নিয়েও গণ্ডগোল আছে।

দ্বিজমাধবের কাব্য চট্টগ্রামে 'জাগরণ' নামেও পরিচিত। আটদিন ধরে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে এই গান শোনা হত বলেই কাব্যের এই নাম। কবি খুব সংক্ষেপে কালকেতু ও ধনপতি আখ্যান বর্ণনা করেছেন। মুকুন্দরামের তুলনায় তাঁর কাব্য যথেষ্ট নিকৃষ্ট। ভাড়ু দত্ত ছাড়া আর কোনো চরিত্রই কৃতিত্বের দাবিদার নয়; যদিও দেবী চণ্ডী কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধের ব্যাপারটি তাঁর কাব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর হাস্য পরিহাস বেশ কৌতুকাবহ, বাস্তব অভিজ্ঞতাও প্রশংসনীয়। তবু চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের তুলনায় তাঁর কাব্যও পাঁচালির সীমা অতিক্রম করতে পারেনি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ

মুকুন্দরাম মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। দেবীমাহাত্ম্য খ্যাপক মঙ্গলকাব্যের শিল্পী হলেও মর্ত-মানবের সুখ-দুঃখের ছবি তাঁর কাব্যে যতটুকু জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একক। এদিক থেকে এই মানবতাবাদী কবি যেন আমাদের কালে এসে পড়েছেন। কাহিনিগ্রন্থণ, চরিত্রচিত্রণ, রচনারীতি ও জীবনসম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ততার গুণগুলি লক্ষ করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন এযুগে জন্মগ্রহণ করলে মুকুন্দরামের মধ্যে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে পেতাম।

মুকুন্দরামের কাব্যের নাম অভয়ামঙ্গল। এর আত্মপরিচয় অংশটি যেমন তথ্যবহ, তেমনি ঐতিহাসিক পটভূমিকা হিসাবেও অত্যন্ত মূল্যবান। কাব্যের "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" অংশে প্রাপ্ত আত্মজীবনীর সূত্রে জানা যায় মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষের নির্মম দিনগুলিতে কবির আবির্ভাব। মুঘল অভিযানের ফলে কেন্দ্রীয় পাঠান শক্তি বিপর্যস্ত হল। শুরু হল 'মাৎস্যন্যায়'। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামের সাতপুরুষের বাস্তুভিটে পরিত্যাগ করে কবিকে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল। বহু কষ্ট সহ্য করে সপরিবারে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির জমিদার বাঁকুড়া রায়ের জমিদারিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন কবি। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হবার পর, আশ্রয়দাতা রঘুনাথ রায়ের অনুরোধ এবং দেবী চণ্ডী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি চণ্ডীকাব্য রচনায় হাত দেন। এই আত্মকথাসংক্রান্ত বৃত্তান্তটি বাস্তব জীবনরসে ভরপুর, ঐতিহাসিক তাৎপর্যে অর্থবহ এবং কাব্যগুণে অতিশয় প্রশংসনীয়।

সম্ভবত মানসিংহ যখন গৌড়ের সুবাদার তখন মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। কারণ তিনি কাব্যের একস্থলে "গৌড়বঙ্গ উৎকল-অধিপ" মানসিংহের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে সময়জ্ঞাপক যে হেঁয়ালি পদটি আছে তা থেকে স্পষ্ট কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। কারণ মুঘল-পাঠান বিরোধ, মানসিংহের সময়কাল, আর

আশ্রয়দাতা রঘুনাথ রায়ের সময়কাল এই তিনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তবে যাই হোক নানা উল্লেখ থেকে মনে হয় তাঁর কাব্য ষোড়শ শতকের শেষের দিকে (আনুমানিক ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ) সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

মুকুন্দরাম দুইখণ্ডে চণ্ডীকাব্যের বিশাল পরিকল্পনা করেছিলেন, প্রথম কালকেতুর কাহিনির গ্রন্থণা যত সুন্দর, দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতির কাহিনি ততটুকুই অনাবশ্যক বর্ণনায় পীড়িত। তবে মুকুন্দরামের সাফল্যের প্রধান উৎস তাঁর গভীর সমাজ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জীবনদৃষ্টি। গভীর দুঃখে পীড়িত হলেও একটি প্রসন্ন কৌতুকদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন আমাদের কবি, এ প্রসঙ্গে সমালোচক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেন— মুকুন্দরাম, "স্মিত হাস্যে পৃথিবীর দুঃখ তাপ অতিক্রম করেছেন। তাঁর ভাষায় নেই ব্যঙ্গ— আছে প্রসন্নতা, কৌতুকের মূল্যে তিনি কিনেছেন জীবনকে। শিবের দারিদ্র্য, কালকেতুর ভোজন, মুরারির শঠতা, ধনপতির লালসা, দুর্বলার স্বার্থবোধ— সর্বত্র অনুচ্চ হাস্যস্রোত প্রবাহিত, কৌতুকে বাস্তবে মিলিয়ে মুকুন্দ চণ্ডীকাব্যের অতি সাধারণ উপাদানকে করে তুলেছেন উপভোগ্য।" চরিত্রসৃষ্টিতেও তাঁর কৃতিত্ব সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। এই চরিত্রসৃষ্টির মূলেও ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনের প্রতি প্রসন্নতা। কালকেতু-ফুল্লরা-ভাঁড়ু দত্ত, লহনা-খুল্লনা-দুর্বলা-শ্রীমন্ত ইত্যাদি চরিত্র কোনো বিরাট আদর্শের জন্য নয়, সরল মানবিক গুণেই কালাতিক্রমণের গৌরব অর্জন করেছে। সরল পরিহাস, সুখ-দুঃখের ছোটো ছোটো ছবি, হাসিকান্নার 'ধূপছায়া' আবহ তৈরি করা ইত্যাদি বিরল বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। চরিত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আরোপ— যা আধুনিক সাহিত্যের গোত্রলক্ষণ-তা মুকুন্দ সে যুগেই আয়ত্ত করেছিলেন। আধুনিক উপন্যাসোচিত এই গুণের জন্য এবং মুকুন্দের বাস্তবতা ও চরিত্রসৃষ্টির দিকে নজর রেখে অনেকে তাঁকে ঔপন্যাসিকের পূর্বসূরির মর্যাদা দান করেছেন।

কবি বাস্তবরসের স্রষ্টা হিসাবে বিস্ময়কর কৃতিত্বের দাবিদার, কিন্তু তিনি শুধু বস্তু সঞ্চয়ে আগ্রহী নন। বস্তুকে রসে পরিণত করার কৌশল তিনি জানতেন। একটি অপক্ষপাত দূরত্ব থেকে তিনি জীবনের ঘটমানতাকে দেখেছেন। স্মিত হাস্যে পৃথিবীর দুঃখ তাপ তিনি অতিক্রম করেছেন। মুকুন্দরামের জীবনরস-রসিকতাও এই বাস্তবতার বোধ থেকে উদ্ভূত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতা জীবনের উত্তাপ সরবরাহ করেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে। গ্রাম্য প্রৌঢ়ের ভোজনলোলুপ কর্ম-বিমুখ বালসুলভতা (শিব), নাগরিক বণিক-নন্দনের স্বভাব-ভ্রমরবৃত্তি (ধনপতি), ব্যবসায়ী বেণের বাক্-বিন্যাসের কৌশলে নিত্য শাঠ্য (মুরারি শীল), অপগত যৌবন নারীর সপত্নীযন্ত্রণা (লহনা), মহাশক্তিমান ব্যাধের স্বল্পবুদ্ধির স্থূলতা (কালকেতু), ব্যর্থজীবন চতুর কায়স্থ সন্তানের খলতা (ভাঁড়ু দত্ত)— এসকল চরিত্রই বিচিত্র ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে এবং জীবন নৈকট্যে সমৃদ্ধতর। সর্বোপরি বলা যায় কালকেতুর নগরে বিচিত্র জীবনযাত্রার যে সামগ্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে তা ষোড়শ শতকের 'ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা'রই ছবি। রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দরামের কবিকৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই কাব্য ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের

সমগ্র জীবনকেই চিত্রায়িত করেছে। ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন লুপ্ত গৌরব ব্যক্তির অতৃপ্তির গভীর বেদনা, মুরারি শীলের অসাধারণ Type চরিত্রটি চিরকালের বেণিয়া সমাজের প্রতিনিধি, পশুগণের ক্রন্দনে তিনি পীড়িত মানুষের হৃদয়বেদনাকেই প্রকাশ করে ফেলেন। তাঁর চরিত্রগুলি আধুনিককালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমায় এসে পৌঁছেছে। এই সমস্ত দিক থেকে তাঁর কাব্যে উপন্যাস-লক্ষণ আবিষ্কার করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- "....মুকুন্দের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব চিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুপষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি, মুকুন্দ কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রতার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল, এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।"

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় ইতিহাসে আরো কয়েকটি চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিজ জনার্দন এবং বলরামের নামে দুখানি পুথি পাওয়া গেছে। মনে হয় এগুলি ষোড়শ শতকের রচনা। জনার্দনের পুথিটি ছড়া জাতীয় রচনা, এর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কাব্য হিসাবে এর কোনো গৌরব নেই। তবে কালকেতু আখ্যানের তুলনায় ধনপতি আখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনাই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। বলরামের কাব্যকৃতির যৎসামান্য নমুনা পাওয়া গেছে বলে সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত।

১.৬ সংক্ষিপ্ত টীকা

গাহাসত্তসঈ ঃ হালের 'গাহাসত্তসঈ' প্রাকৃত ভাষায় রচিত গান ও চূর্ণ কবিতার একটি সংকলন। এ সমস্ত কবিতায় জীবনের বহু বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশেও এইরূপ প্রাত্যহিক জীবনের ছবি পাওয়া যায়। এগুলির ভাষা সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও ভারহীন। এই কবিতাগুলি শ্রুতিবাহিত। অসংখ্য চূর্ণ কবিতার মধ্য থেকে ৭০০ কবিতা নিয়ে হাল তার 'গাহাসত্তসঈ' নাম সংকলন গ্রন্থটি প্রস্তুত করেন। হালের ব্যক্তি পরিচয় রহস্যাবৃত। কোনো কোনো ইতিহাসকার তাঁকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক থেকে খিস্টীয় প্রথম শতকের ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু সংকলন গ্রন্থের ভাষা বিচারে এগুলিকে অর্বাচীন বলেই মনে হয়। বাণভট্টের হর্ষচরিতে হালের উল্লেখ রয়েছে, এছাড়াও হালের সংকলনে প্রবরসেন ও বাকপতিরাজের পদ উদ্ধৃত হয়েছে। উভয়ে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব। অতএব মনে হয় এই সংকলন সপ্তম শতাব্দীতেই সম্পন্ন হয়েছিল।

এতে ৭০০ কবিতাকে সাতটি দশকে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাজনে কোনো পারম্পর্য নেই, কোনো ভাবগত বা রসগত বিভাজনসূত্রও রক্ষিত হয়নি। কবিক্রমের শৃঙ্খলাও অনুপস্থিত। এর প্রত্যেকটি শ্লোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'গাহাসত্তসঈ' প্রেমের কাব্য। এতে অলংকারশাস্ত্রোক্ত নায়িকার অষ্ট অবস্থার চিত্র অসংখ্য। এতে অবৈধ প্রেমচিত্রেরই আধিক্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সংকলনেই প্রথম রাধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। অনেকের মতে এটাই রাধার প্রাচীনতম উল্লেখ।

সেকশুভোদয়া ঃ সেকশুভোদয়া গদ্য পদ্য মিশ্রিত একটি সংস্কৃত চম্পূকাব্য। মাত্র গত শতকে এই গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়। এর সহজ ও কবিত্বপূর্ণ পদ্যের মধ্যে গদ্যের ভাগই বেশি। এই গ্রন্থে কিছু বাংলা ছড়া ও আর্যার ব্যবহার আছে। কাহিনি হিসাবে এতে কোনো নিরবচ্ছিন্ন গল্প নেই। এই গ্রন্থে পঁচিশটি অধ্যায় পাওয়া গেছে, পরবর্তী অংশ খণ্ডিত। এই ২৫টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে একাধিক গল্প আছে। জালালুদ্দিন নামে এক অলৌকিক শক্তিধর লোকের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত হওয়া; নানা আজগুবি ঘটনার দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও রাজার দ্বারা সংবর্ধিত হওয়ার কাহিনি এতে বর্ণিত। অনেক গাঁল-গল্প ও ভুল সংস্কৃতের প্রয়োগ থাকলেও গ্রন্থটি থেকে বঙ্গদেশে তৎকালীন সময়ের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের একটি আভাস পাওয়া যায়। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এই পুথির রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সুভাষিত রত্নকোষ /কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ঃ F.W. Thomas প্রথমে একটি খণ্ডিত পুথি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, তখন এর নাম ছিল 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'। সম্পূর্ণ পুথিটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল সমগ্র সংকলন গ্রন্থটি অনেকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার সমষ্টি। এই কবিতাগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত ও সংকলিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এগুলির মধ্য দিয়ে বুদ্ধবন্দনা, প্রকৃতি বর্ণনা, আদিরস, বাস্তব জীবনচিত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি প্রাণের গীতাধর্মিতা যে প্রাচীনকাল থেকেই সক্রিয় ছিল, তা এই প্রকীর্ণ কবিতাগুলিতে ধরা পড়েছে। এই কবিতাগুলির ভাষা সংস্কৃত, কবিসংখ্যা শতাধিক, তার মধ্যে কালিদাস-ভবভূতি সহ মধুশীল, বীর্যমিত্র, শ্রীধর নন্দী, শ্রীপাশ বর্মা প্রমুখ অসংখ্য বাঙালি কবি রয়েছেন। এই সংকলিত পুথিটি নেপাল থেকে সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু সংকলন কে জানা যায়নি। সুকুমার সেনের মতে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ পুথিটির সংকলকের নাম বিদ্যাকর। এই সংকলনের অনেক কবিই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই সংগ্রহ থেকে তৎকালীন বাঙালির সাহিত্যরুচি সম্বন্ধে তথ্যার্জন করা যায়। বাঙালি একদিকে কাব্যে বাস্তব চিত্রণে কুশলতা অর্জন করেছিল, অন্যদিকে আদিরসেও তার আগ্রহ জন্মেছিল। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক অনেকগুলি শ্লোক আছে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে যে আদিরসাত্মক ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়, তার উৎস 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোকগুলির মধ্যেই নিহিত।

সদুক্তিকর্ণামৃত ঃ

'সদুক্তিকর্ণামৃত' একটি সংকলন গ্রন্থ। এটির সংকলক শ্রীধরদাস। শ্রীধরদাস ছিলেন লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র ও রাজার মহামাণ্ডলিক। এই গ্রন্থটির সংকলনকাল ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ। এতে ৪৮৫ জন কবি রচিত ২৩৭০ টি পদ গৃহীত হয়েছে। পদগুলি ৫টি প্রবাহতে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রবাহ আবার নানা 'বীচি'-তে বিভক্ত, যাতে অন্তত ৫টি করে কবিতা আছে। এই পদগুলির রচয়িতাগণের অনেকেরই নাম পাওয়া যায়নি। এটি একটি সর্বভারতীয় সংকলন। এতে একদিকে কালিদাস, ভর্তৃহরি, রাজশেখর প্রমুখের পদ সংকলিত হয়েছে। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন প্রমুখ সেনবংশীয় রাজাদের লেখা প্রকীর্ণ শ্লোক ও লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের লিখিত শ্লোক সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও প্রায় আশিজন পরিচয়বিহীন কবির কবিতা আছে। শ্লোকে প্রাপ্ত ভণিতার বিচারে এই ৮০ জনকে বাঙালি বলেই মনে হয়। এ থেকে অনেকেই মনে করেন, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বাঙালির দ্বারা সংকলিত এবং প্রধানত বাঙালি কবির রচিত পদসমূহের সংকলন। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি সংস্কৃতে রচিত। এদের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নয়। জগৎ ও জীবনের প্রায় সবকিছুকেই কাব্যের উপাদানরূপে কবিরা এখানে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনসংরাগ মাখানো মানবরস এই সংকলনের প্রাণবস্তু। পরবর্তী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্য বা মঙ্গলসাহিত্যে এই জীবনানুভব পরোক্ষভাবে ছায়াপাত করেছিল। এই সংকলনের অনেকগুলি শ্লোক আদিরস ও ভক্তিরস একই আধারে সমীভূত হয়েছিল।

প্রাকৃতপৈঙ্গল ঃ প্রাকৃতপৈঙ্গল শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপ্রভ্রংশে রচিত ছন্দোগ্রন্থ। এর সংকলনস্থান পূর্বভারত বলে এতে বাহালির কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে। এটি চতুর্দশ সতকের শেষ দিকে সংকলিত হয়েছিল। প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই প্রকীর্ণ কবিতাগুলিতে প্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনাই প্রধান। এগুলি সংস্কৃত আদর্শে কল্পিত। বর্ণনার সৌকুমার্য ও আবেগের সাবলীল প্রকাশ এই কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর প্রকাশভঙ্গি সহজ বলে এতে এক অনায়াসসিদ্ধ মাধুর্যও সঞ্চারিত হয়েছে। এতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কৃষ্ণকথার কিছু বিশিষ্ট উপাদান আছে। রাধাকে এখানে পৌরাণিক দেবীদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাধারণ জীবনের বিচিত্র রূপও শ্লোকগুলিতে সমুদ্ভাসিত।

উজ্জ্বলনীলমণি ঃ বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশংসাধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত "উজ্জ্বলনীলমণি" বৈষ্ণব রসতত্ত্বভাবনা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের অনুরূপ অভিব্যক্তি লাভ করে। চৈতন্য পরবর্তী সমস্ত পদকার ও সৃষ্টিকর্তার উপর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নির্দেশ কার্যকরী হয়েছিল। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি ও চেতনা এর অনুকরণসমৃদ্ধ। এই অনুসৃতিতেই উজ্জ্বলনীলমণির চূড়ান্ত সার্থকতা। কারো কারো মতে স্বয়ং চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামীর নান্দনিক ভাবনাই সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকরী হয়েছিল। এই গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রখর জ্ঞান এবং ভক্তিশাস্ত্রে পারঙ্গমতা প্রকাশিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী শেষার্ধে সংস্কৃতে রচিত রসশাস্ত্রের এই গ্রন্থে শৃঙ্গাররসকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের পূর্ববর্তী গ্রন্থ

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসকে শান্ত-প্রীতি-প্রেম-বাৎসল্য-মধুর এই পাঁচ পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে এদের মধ্যেকার উজ্জ্বলতম বা মধুরতম শৃঙ্গাররসকেই নতুন ব্যাখ্যায় উপস্থিত করেন শ্রীরূপ গোস্বামী। ফলে উজ্জ্বলতম শৃঙ্গাররস নবীন অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়। তাই এই গ্রন্থের নাম উজ্জ্বলনীলমণি। শ্রীরূপ গোস্বামী সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গাররসকেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং কৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ নায়ক রূপে গ্রহণ করে উজ্জ্বলরসকেই উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে আদর্শ নায়ক-নায়িকা (কৃষ্ণ রাধা) পটভূমি থেকে অলংকার ও রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী এই গ্রন্থে নীলমণি বা কৃষ্ণের উজ্জ্বল বা শৃঙ্গাররসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধুরা রতিকে প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ- ভাব বা মহাভাব ইত্যাদি সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থিত করেছেন। অলংকারশাস্ত্রের মধুরা রতিকে পর্যায় অনুসারে বিভক্ত করে যে ক্রমোন্নতি বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেই শ্রীরূপ গোস্বামীর আদর্শ, রসতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। আদিরসকে অপ্রাকৃত বিভাবনার সাহার্যে উজ্জ্বলতম করে তোলাই উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দেশ্য। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে, এক নতুন রসপ্রীতি ও উপলব্ধির আদর্শ সৃষ্টি করেছে - একথা অনস্বীকার্য।

ক্ষণাদাগীতচিন্তামণি ঃ এটি একটি বৈষ্ণব পদসংগ্রহ গ্রন্থ। প্রখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থটি সংকলন করেন। তাঁর ব্যক্তিপরিচয় প্রসঙ্গে জানা যায় তিনি নদিয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসন সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব আছে। অনুমান করা হয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকেই তিনি তাঁর এই বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ষোড়শ শতকের বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনা দার্শনিকতা ও তত্ত্ব নির্দেশের বাঁধা পথে চলতে চলতে সপ্তদশ শতকের মধ্যেই গতানুগতিকাতায় পর্যবসিত হয় এবং উচ্চশ্রেণির প্রতিভা, বিনষ্ট ভক্তি ও সাধনার অভাব বৈষ্ণবীয়তাকে তরলতায় রূপান্তরিত করে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই তরলতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের অধিকাংশ বৈষ্ণব পদে আন্তরিকতার পরিবর্তে কৃত্রিম কলা-কৌশল প্রাধান্য পেয়েছে। এই ভাব-দৈন্যের যুগে কিছু পদসংকলন গ্রন্থ রচনা অবক্ষয়ের হাত থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যকে রক্ষা করার এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এই যুগে কিছু বড়ো বড়ো পদসংকলন গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে অসংখ্য পদ ও পদকর্তার পরিচয় সংরক্ষিত হয়েছিল। এই কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বনাথ।

'ক্ষণদা' শব্দের অর্থ রাত্রি। সংগ্রাহক ত্রিশটি রাত্রি অর্থাৎ একমাসের প্রত্যেক রাত্রের এক এক উৎসব অনুসরণ করে যাতে সম্পূর্ণ মাস ধরে গীত হতে পারে সেই ভাবে ত্রিশটি 'ক্ষণদা'য় সংগ্রহ সংগ্রহটিকে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক ভাগের শেষে বিশ্বনাথ 'ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে' শ্লোক ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তিনি পূর্ব এবং উত্তর দুটি ভাগে করে তাঁর সংকলনটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থে নায়ক-

নায়িকার বিভিন্ন ভাব প্রকাশকে রসবদ্ধ করার উদ্দেশ্য বিশ্বনাথ ৪৫ জন কবির মোট ৩০৯ টি পদ সংকলিত করেছেন। এর সঙ্গে তাঁর স্বরচিত প্রায় একান্নটি পদ যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ বহু কবির পদ সংগৃহীত হলেও চণ্ডীদাসের কোনো পদ এখানো স্থান পায়নি। এ সম্পর্কে সংকলকের মনোভাবেরও কোনো প্রকৃত ব্যাখ্যা নেই। তবে সামান্য কিছু ত্রুটি- বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বাংলা কবিতা সংকলনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

খেতুরীর মহোৎসব ঃ খেতুরী বা খেতরী অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার গড়েরহাট পরগনার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম ষোড়শ শতকের প্রথম অংশে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে বৃন্দাবনে চলে যান এবং বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। কিছুকাল পরে জন্মভূমি দর্শন করতে ফিরে এলে পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষর অনুরোধে এখানেই তিনি কুটির নির্মাণ করে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সাধন-ভজন-গান-কীর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

তিনি স্বগ্রামে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, রাধা-কৃষ্ণ প্রমুখের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাংলার সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিরাট মহাসম্মেলন খ্রিস্টিয় ১৬ শতকের মাঝা মাঝি সময়ে, সম্ভবত তৃতীয় পাদে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন নরোত্তমের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ। এই মহাসম্মেলন এবং মহোৎসবই খেতুরীর মহোৎসব হিসাবে বিখ্যাত।

এই মহোৎসবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী। এতে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবই যোগদান করেছিলেন। চৈতন্যদেবের যে সমস্ত সাক্ষাৎ পার্ষদ তদাবধি জীবিত ছিলেন, তাঁরাও এই সম্মেলনে মহাসমাদরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই উৎসবের মাধ্যমেই বাংলায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল চিন্তাজাত উপাসনার ধারা প্রবর্তিত হয়। এর উপজাত ফলকে আশ্রয় করেই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

এই উৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য এই যে এখানে নরোত্তমের চেষ্টায় যে পালবদ্ধ রসকীর্তনের প্রতিষ্ঠা ঘটে, তা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নরোত্তম এই রসকীর্তনের প্রবেশক হিসাবে গৌরচন্দ্রিকারও প্রবর্তন করেন। ধ্রুপদ গানের ঠাটে বা গঠনে বিলাম্বিত লয়ে কীর্তনশৈলী পরবর্তীকালে গরানহাটি নামে পরিচিত হয়। খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তমের প্রচেষ্টায় যে পালবদ্ধ কীর্তন ধারার সূচনা হয়, তাতে বাঙালির সাঙ্গীতিক প্রতিভা আরও সমৃদ্ধ এবং শ্রীময়ীরূপ ধারণ করে। এখানেই খেতুরীর মহোৎসবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

হুসেন শাহ ঃ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলায় যে একাদশতম মুসমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাসে তা হুসেন শাহি বংশ নামে পরিচিত। হুসেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাই চৈতন্য প্রসঙ্গে রচিত সমস্ত সাহিত্যেই তাঁর নাম নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকালই সর্বাপেক্ষা গৌরবের ও

সামাজিক সুস্থিতির কাল। বঙ্গসাহিত্য হুসেন শাহি আমলেই উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এজন্যই হুসেন শাহ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে বহুলালোচিত এক ব্যক্তিত্ব।

আবার অন্যতম বিপ্রদাস পিপলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী প্রমুখের কাব্যে হুসেন শাহের নামোল্লেখ থাকলেও তাঁদের সঙ্গে হুসেন শাহের সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্ক ছিল না। হুসেন শাহ কোনো কবি বা পণ্ডিতকে কোনো উপাধি প্রদানও করেননি। সুতরাং হুসেন শাহ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এমন মনে করা সমীচীন নয়। তাঁর রাজত্বকালে বাংলায় মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলি রচনায় হুসেন শাহের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না। গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধিও ঘটে নি। তাই বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হুসেন শাহের নাম যুক্ত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে এই সিদ্ধান্ত সর্বজনস্বীকৃত নয় ও একদেশদর্শী।

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী ঃ

'চৈতন্যচরিতামৃত'-তে উল্লিখিত আছে - "শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ/শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ"। এই ছয়জন চৈতন্যঅনুচর, চৈতন্য ভক্ত-শিষ্যকে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী নামে অভিহিত করা হয়। এই গোস্বামীদের লিখিত সংস্কৃত ও বাংলা নানা গ্রন্থের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের আবেগের ধর্ম সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্কৃতে রচিত এঁদের গ্রন্থগুলি সর্বভারতীয় বিদ্বজ্জন সমাজে প্রচারিত হওয়ার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিকতা ও ভক্তিতত্ত্ব বাংলার বাইরেও প্রসার লাভ করেছিল।

এই ছয় গোস্বামীর মধ্যে সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর গ্রন্থেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছে। রঘুনাথ ভট্ট বিশেষ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর পূণ্য জীবনযাত্রাই তাঁকে বৃন্দাবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোস্বামীর মর্যদা দান করেছিল। রঘুনাথ দাস কায়স্থ। তিনি জমিদার পুত্র হয়েও গৃহত্যাগী হন এবং পুরীধামে চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত কাব্য-কবিতায় তাঁর কবিত্বশক্তি ও ভক্তির আদর্শ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'স্তবমালা', 'মুক্তাচরিত্র', 'দানকেলিচিন্তামণি', প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য এবং কাব্যরচনার অসাধারণ শক্তি প্রস্ফুটিত। গোপাল ভট্ট অবাঙালি, তিনি দক্ষিণাত্যের অধিবাসী। চৈতন্য কর্তৃক আশীর্বাদ ধন্য, পরবর্তীতে বৃন্দাবনের প্রধান গোস্বামী গোপাল ভট্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। 'হরিভক্তিবিলাস' নামে বৈষ্ণব স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থ তাঁর রচিত। আবার অন্যমতে সনাতন এই গ্রন্থের রচয়িতা। গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনের অনেকেই তাঁর কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

বৃন্দাবনের যে তিনিজন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন, তাঁরা হলেন জ্যেষ্ঠ সনাতন, অনুজ রূপ এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী। রূপ এবং সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সনাতন 'শাকর মল্লিক' রূপ 'দবির খাস' নামে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাবে এঁরা কর্মত্যাগ করেন। এই

ভাতৃদ্বয়ের চেষ্টাতেই বৃন্দাবন ও মথুরার লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সনাতন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দার্শনিকতা ও 'বৈষ্ণবতোষণী' নামে গ্রন্থ পাওয়া যায়। 'বৃহদভাগবতামৃত' বৈষ্ণব তত্ত্বকথা এবং 'হরিভক্তিবিলাসে'র মাধ্যমে বৈষ্ণব সমাজের জন্য নতুন স্মৃতিসংহিতা রচিত হয়েছে। রূপ গোস্বামী নামে অনেকগুলি কাব্য, নাটক, অলংকারশাস্ত্র, কাব্য সংকলন, রসতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্রমূলক গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাঁর রচিত মনীষা সার্বিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ভক্তিতত্ত্বমূলক গ্রন্থ। 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রধানত অলংকারশাস্ত্র ও রসতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণব সাহিত্যের দিঙ্‌নির্দেশক এই গ্রন্থ পরবর্তীকালের সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রীজীব গোস্বামী পণ্ডিত, পাণ্ডিত্যই তাঁর ভূষণ। তাঁর নামে অনেকগুলি কাব্য, ব্যাকরণ ও রসশাস্ত্র, বৈষ্ণব স্মৃতি ও ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি পাওয়া যায়। দার্শনিক-পণ্ডিত জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ', নামে ছয়টি গ্রন্থে ন্যায় ও দর্শনের মাপকাঠিতে গৌড়ীয় ভক্তিমার্গের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। এই ছয়জন গোস্বামী গ্রন্থাদি রচনা করে চৈতন্যমার্গের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা না করলে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম দেশব্যাপী গৌরব ও মহিমা লাভ করতে পারত না। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী এজন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বারোমাস্যা ঃ

বারোমাস্যা নায়িকার বারোমাসের দুঃখ বর্ণনার কাহিনি। এই বারোমাস্যা সাধারণত মঙ্গলকাব্যের বিষয়, একটি অবশ্য বর্ণিতব্য কাহিনি। কিন্তু মধ্যযুগের প্রায় সকল নায়িকার কণ্ঠেই শুনি নিজের বারোমাসের দুঃখের কথা বা বারোমাস্যা। মধুযুগীয় সাহিত্যের এই অতি পরিচিত বিষয় শুধু মাত্র বারোমাসেই আবদ্ধ নয়, অনেক সময় বর্ষার চারমাসের কথাও নায়িকার কণ্ঠে বর্ণিত হয়, এইগুলোকে বলে চৌমাসীয়া। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে বর্ষার চারমাসের বিরহ-বেদনার গীতিকাব্য চৌমাসীয়ার প্রাচীনতম নিদর্শন। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই বারোমাস্যার অবতারণা আছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি ও গীতিকা সাহিত্য।

মঙ্গলকাব্যের বারোমাস্যাতে তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির সংঘাত-সংশ্লেষণ, দুঃখ-দারিদ্র্যের ছাপটি বড়ো স্পষ্ট। দেশে তখন অরাজক অবস্থা, অত্যাচারে অনাচারে জর্জরিত মানুষ দিশেহারা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান ছিল নিম্নকোটিতে, কিন্তু নারীর মুখ দিয়ে বর্ণিত বারোমাস্যাতে মধুযুগীয়া প্রেক্ষাপটে নারী কিয়দংশে আপন মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। বৈশাখ মাসের দুঃখ বর্ণনার মাধ্যমে বারোমাস্যার শুরু, অবশ্য কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও আছে।

বৈশাখ মাসে চালের ফুটো দিয়ে আকাশের তারা দেখে নায়িকা চিন্তা করেন বর্ষার দিনের দুর্দশার আগাম আশঙ্কার কথা। তারপর দুঃখের দিন ঘন হয়ে আসে। এক এক করে দুঃখের স্তর অতিক্রম করে নায়িকা আবার এসে পৌঁছান চৈত্র মাসে। শুরু হয় আবার পুনরাবৃত্তি। এই তো তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র।

শুধুমাত্র মধ্যযুগ নয়, আদিযুগের বাংলার প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যার গানগুলিতে ফর্মের দিক থেকে গতানুগতিক বারোমাস্যার উল্লেখ না থাকলেও চর্যার কবিরা সাধন সঙ্গীতের অন্তরালে অন্তজ সম্প্রদায়ের অবহেলা-শোষণ-বঞ্চনা-দুঃখভোগের যে বাস্তব চিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তা কি মধ্যযুগীয়া বারোমাস্যারই নামান্তর নয়? একই কথা ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনির কাছে অন্নদার আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

বারোমাস্যা মঙ্গলকবিদের একটি অতি প্রিয় বিষয়। বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলে ফর্মের দিক থেকে বেশির ভাগ মঙ্গলকবিরা অনেকক্ষেত্রেই এই অনাবশ্যক ও প্রয়োজনীয় বারোমাস্যা প্রসঙ্গকে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে পরিণত করেছেন।

বারোমাস্যা বর্ণনায় মঙ্গলকবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবিদার। ফুল্লরার বারোমাস্যা প্রসঙ্গে কবি তৎকালীন আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনে অবহেলিত নারী সমাজের কিছু জ্বলন্ত সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। বারোমাস্যা প্রসঙ্গ তার মুখে প্রযুক্ত হয়েছে যত না গতানুগতিক প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি সতীনকে পড়ানোর উদ্দেশ্যে। এছাড়াও ফুল্লরার বারোমাস্যা বর্ণনায় গোষ্ঠীচেতনা-নির্ভর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে, এমন ধারণাও অসঙ্গত নয়।

গীতিকা সাহিত্যে মলুয়া পালায় বিনোদ বিদেশে যাত্রার পর মলুয়ার মুখে শুনি তার বারোমাসের দুঃখের কাহিনি। দেওয়ান ভাবনা পালাটিতে সোনাইর মুখে শুনি তার বারোমাসের দুঃখের কাহিনি।

বৈষ্ণব পদাবলির রাধাতে উন্নীত হওয়ার আগেই বড়ুর রাধার মুখে বর্ষার চৌমাসীয়ার যে বিবরণ পাই, তার অনুরণন শুনি চৈতন্য পরবর্তী রাধার মুখে।

পরিশেষে বলা যায় বারোমাস্যার মধ্য দিয়ে চিরন্তন নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অপ্রাপ্তি-বিরহের বেদনাঘন ছবিই যেন আবহমানকাল ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

১.৭ আলোচনা বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার

প্রথম অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমরা যে সব সারকথা পেয়েছি তা এখানে আলোচনা করব। সামগ্রিক আলোচনার শেষে দেখা গেল জয়দেবের কাব্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। জয়দেবের কাব্যের ছন্দ পরবর্তী বাংলা কাব্যে অনুসৃত হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য রচনা করলেও বাংলার প্রাচীন যাত্রা বা নাটগীতির রীতি জয়দেব অনুসরণ করেছেন।

চর্যাপদের আলোচনায় দেখা গেল নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধদের এই সাধনসঙ্গীতগুলি রচিত হয়েছে। চর্যার ভাষা যে প্রাচীন বাংলা তা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। চর্যার মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। এর প্রধান কবি লুইপাদ, শবরপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ প্রমুখ। সমকালীন বাংলার

সমাজচিত্র এগুলোতে ধরা পড়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ফুটে উঠেছে তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলার অরাজক অবস্থা। এই কাব্যে নাটগীতের স্বরূপ রক্ষিত। লোকায়ত ভাবনার ছাপ এতে সুস্পষ্ট। রাধা চরিত্রই মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম, চৈতন্য আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল সূচিত হয়েছিল। চৈতন্যজীবনী রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হল। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরবৃন্দকে কেন্দ্র করে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজে নবজাগরণ ঘটেছিল। চৈতন্য-প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

চৈতন্যদেব কেন্দ্রিক ধর্মান্দোলনের প্রভাবে গড়ে ওঠা চরিত সাহিত্যের প্রথম বাংলা গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত। চৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণের পূর্ণাবতার- এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটি লিখিত। এই গ্রন্থে ধৃত তথ্য নির্ভরযোগ্য। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পালাগানের ঢঙে লেখা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিবিধ তত্ত্বস্থান লাভ করেছে। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় এইসব জটিল দার্শনিক বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন কবি।

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। বাঙালি পাঠক, শ্রোতা, ভক্তদের ওপর তাঁর প্রভাব প্রবল। তাঁর পদগুলি মানবিক প্রণয়-কবিতা রূপেই অধিক আস্বাদ্য। চণ্ডীদাসের পদগুলি রোমান্টিক প্রণয়কবিতার উচ্চাঙ্গ নিদর্শন। ভাবব্যাকুলতা ও গভীরতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। জ্ঞানদাসের পদে তত্ত্ব থাকলেও কবিত্বের প্রকাশ অধিক। রূপানুরাগ ও আপেক্ষানুরাগের পদে কবির সাফল্য সর্বাধিক। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত।

অনুবাদ সাহিতের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বাংলায় রামায়ণের বিশেষ জনপ্রিয়তার জন্য রামায়ণ অনুবাদের ঝোঁক বেশি ছিল। কৃত্তিবাসের সময় ও কাব্য নিয়ে বিতর্ক আছে। তাঁর আত্মজীবনী অবলম্বনে কাল নির্ণয় করা যায় না। তাঁকে সাধারণভাবে পঞ্চদশ শতকের কবি হিসাবে ধরা হয়। তাঁর কাব্যের অনেকটাই পরবর্তীকালে সংযোজিত। চৈতন্য প্রভাবিত ভক্তিরস এতে রয়েছে, মহাকাব্যিক দৃঢ়তার পরিবর্তে ভক্তিকোমলতারই এতে প্রাধান্য। কবি কৃত্তিবাস আর্য রামকথাকে বাঙালির জীবনকাব্যে পরিণত করেছেন।

বাংলা মহাভারতের প্রথম লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। হুসেন শাহের অমাত্য পরাগল খানের নির্দেশে পরমেশ্বর সংক্ষেপে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন। তাঁর রচনায় মূলানুগত্য আছে। শ্রীকরনন্দীর মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদে কৌতুকের সুর ধরা পড়েছে।

ভাগবতের অনুবাদ তুলনামূলকভাবে কম। মালাধর বসুই ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি কাব্যানুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ মূলানুগ।

মঙ্গলকাব্য সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা গেল মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণের আদর্শে লিখিত, তবে মূলত এগুলির উৎস লোকায়ত ব্রতকথা। বাংলার সমাজ-পরিবার জীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় এগুলিতে রয়েছে।

মনসামঙ্গলের প্রথম কবি হরিদত্তের রচনার অল্পকিছু অংশই পাওয়া গেছে। নারায়ণদেবের কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে লিখিত। চাঁদের দৃঢ় পৌরুষ ও করুণরস কবি সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিজয়গুপ্ত মনসা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত করেছেন তাঁর কাব্যে।

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্তের পুথি পাওয়া যায়নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মধ্যযুগের আখ্যান-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তার কাব্যে সমকালীন সময়-সমাজের বাস্তব চিত্র আছে। বিচিত্র স্বভাবের মানুষের চরিত্র চিত্রণে তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টি আধুনিক ঔপন্যাসিকের সমতুল্য।

১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা

শূন্যপুরাণ ঃ রামাই পণ্ডিতের কাব্য। শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য। শূন্যমূর্তি ধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উদ্ভব, প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশচন্দের ধর্মপূজা ইত্যাদি এতে বর্ণিত হয়েছে।

গোরক্ষবিজয় ঃ বাংলার নাথ সাহিত্যে দুটি আখ্যান প্রচলিত --- একটি গোরক্ষনাথের কাহিনি, অপরটি ময়নামতী - গোপীচন্দ্রের কাহিনি। গোরক্ষনাথ কেন্দ্রিক কাহিনি সর্বত্রই গোরক্ষবিজয় বা গোর্খবিজয় বলে উল্লেখিত হয়েছে। শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধারের কাহিনি এতে পরিবেশিত হয়েছে।

পয়ার/ত্রিপদী ঃ বাংলা ছন্দ বিশেষ।

খনার বচন ঃ খনা মানে প্রাচীনকালের জনৈক বিদূষী রমণী কর্তৃক লিখিত বাংলার গ্রামজীবনে প্রচলিত নীতি-নির্ধারক শ্লোকসংগ্রহ। বাংলার গ্রামজীবনে প্রচলিত নীতি-নির্ধারক শ্লোকসংগ্রহ।

লক্ষ্মণসেন ঃ বাংলার সেনবংশীয় রাজা। পিতার নাম বল্লালসেন। ইনি বাংলার শেষ হিন্দুরাজা। জয়দেব, ধোয়ী প্রমুখ তাঁর রাজসভার কবিগণের অন্যতম।

বৈষ্ণবতোষণী ঃ ভাগবেতের টীকা-গ্রন্থ। চৈতন্য পরিকর সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিস্তৃত টীকা রচনা করে এর নাম দিয়েছিলেন বৈষ্ণবতোষণী। এতে ভাগবতের লীলাসমূহের গূঢ় তাৎপর্য ও সিদ্ধান্তসার প্রকাশিত হয়েছে।

রেনেসাঁস ঃ নবজাগরণ।

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ঃ অচিন্ত্য, অনন্ত শক্তিশালী পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ এবং সেই শক্তি-পরিণত বস্তুসমূহের সঙ্গে পরতত্ত্বের যে অচিন্ত্য এবং যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ তাই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব।

সাধ্যসাধনাতত্ত্ব ঃ বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তের উদ্দিষ্টকে বলা হয়েছে সাধ্য এবং সেই উদ্দিষ্টকে লাভ করার যে উপায় বা পন্থা তা হচ্ছে সাধন। এই সাধ্য এবং সাধনপন্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই সাধ্যসাধনতত্ত্ব।

মিস্টিসিজম ঃ মরমিয়াবাদ।

পদকল্পতরু ঃ বৈষ্ণবদাস সংকলিত। একে বৈষ্ণব পদাবলির মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি সংকলিত। এতে ১৩০ জনেরও বেশি কবির লেখা তিন হাজারেরও বেশি পদ সংকলিত হয়েছে।

পদামৃতসমুদ্র ঃ রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এটি সংকলিত। পদসংখ্যা ৭৪৬। পদগুলির টীকা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

ভগবদ্‌গীতা ঃ মহর্ষি ব্যাসদেবের সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত। এতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্। একে ভাগবতপুরাণও বলা হয়। এটি বেদব্যাস কৃত সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম ঃ মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় এবং মিলন কাহিনি এর উপজীব্য।

উত্তর রামচরিত ঃ মহাকবি ভবভূতির সংস্কৃত নাটক। রামায়ণের শেষভাগ অর্থাৎ সীতার বনবাস থেকে শুরু করে সীতার পাতালপ্রবেশ পর্যন্ত ঘটনা এতে বর্ণিত।

নিত্যানন্দ ঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ও প্রসিদ্ধ সহচর।

অদ্বৈত প্রভু ঃ চৈতন্যদেবের তিন প্রধান ভক্তের অন্যতম।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঃ বিখ্যাত কবি ও প্রহসন-লেখক। নির্বাসিত সীতা, পদ্য-কৌমুদী, বীর-বাক্যবলী, জানকী-নাটক ইত্যাদি গ্রন্থের রচনাকার।

বাল্মীকি ঃ রামায়ণ প্রণেতা ভারতের আদিকবি।

আকবর ঃ দিল্লির তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট। তিনি নিজে নিরক্ষর হলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন? বীরবল, তানসেন প্রমুখ তাঁর

সভাসদ ছিলেন। সুশাসনের জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে সুবাদার বা কর্মচারী নিয়োগ করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ঃ এতে বলরাম, হরিশ্চন্দ্র, মদালসা, মনু, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ প্রমুখের উপাখ্যান এবং মনু-বিবরণ ও যোগধর্ম প্রভৃতি স্থান পেয়েছে।

১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির পরিচয় দিন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

২। দ্বাদশ শতাব্দীর এমন একটি কাব্যের পরিচয় দিন, যার প্রভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত।

৩। ভাষা প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণগুলি নির্দেশ করে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির রচনাকাল নিরূপন করুন।

৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই বাঙালির সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন মেলে এবং পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাবও দেখা যায়। মন্তব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। চর্যাগান শুধু তত্ত্বকথা ও সাহিত্যের দিক থেকে বিচার্য নয়, এর পশ্চাদপটে যে দেশকালের ছায়াপাত ঘটেছে, তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চর্যাগানের পটভূমি আলোচনা করে এ মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করুন।

৬। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' -এর ভাষা বাংলা নয়, তবু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এর কারণ কী আলোচনা করুন।

৭। তুর্কি অভিযান ও শাসন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে কোন্ কোন্ দিক থেকে প্রভাবিত করেছে আলোচনা করুন।

৮। বাংলা ভাষা উদ্ভবের আগে (খ্রি. ৭ম- ৮ম) বাঙালি বিভিন্ন ভাষায় যেসব সাহিত্যে রচনা করেছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯। চর্যাপদের মধ্যে তৎকালীন বাঙালির সামাজিক জীবনের যে পরিচয় মেলে, তার পরিচয় দিন।

১০। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব বলতে কোন্ পর্বকে বোঝায়? এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব নির্ণয় করুন।

১১। টীকা লিখুন -
সেকশুভোদয়া, চর্যাগীতিকার সর্বপ্রধান কবি, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, চর্যাগীতি সংকলনের প্রকৃত আবির্ভাব।

১২। বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবাব কোথায় এবং কতটুকুতা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১৩। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কীভাবে বাংলাদেশে এতটা জনপ্রিয়ত রক্ষা করেছিলেন? উত্তর চৈতন্যযুগের কোন বৈষ্ণব পদকার তাঁর দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন? এই প্রভাবের স্বরূপ সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

১৪। মধ্যযুগে রচিত শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্যগুলিকে বিশুদ্ধ জীবনী বলে গ্রহণ করা যায় কি? কোন্ জীবনীকাব্যটি অনেকাংশ জীবনী হিসাবে সার্থক হয়েছে?

১৫। অবাঙালি হলেও বিদ্যাপতির আলোচনা ব্যতীত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। সিদ্ধান্তটির তাৎপর্য প্রদর্শন করুন।

১৬। কাল-পারম্পর্য অনুসারে শ্রীচৈতন্য বিষয়ক বাংলা জীবনীকাব্যগুলির নামোল্লেখ করুন এবং সে কোনো দুটি চৈতন্যজীবনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও কাব্যমূল্য নিরূপণ করুণ।

১৭। ষোড়শ শতককে বাংলা সাহিত্যের 'ঐশ্বর্য যুগ' কেন বলা হয়?

১৮। বিদ্যাপতি কোন্ ভাষায় পদ লিখেছিলেন — বাংলা, মৈথিলি, ব্রজবুলি? 'তাঁর রচনায় আলংকারিক কলাকৌশল বেশি, স্বাভাবিকতা কিছু অল্প' — এ মন্তব্য কতদূর সত্য?

১৯। রচনাকাল আলোচনা করে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য বলা যায় কিনা আলোচনা করুন।

২০। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী বলতে কাদের বলা হয়? তাঁদের মধ্যে কে কে বৈষ্ণব ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

২১। টীকা লিখুন —
খেতুরীর মহোৎসব, ষড়গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, চৈতন্যচরিতামৃত, হুসেন শাহ, শ্রীনিবাস আচার্য, গৌরচন্দ্রিকা, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা।

২২। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। তিনি কোন্ গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন?

২৩। টীকা লিখুন —
শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল, ভাগবতের আদি অনুবাদক, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ, পাণ্ডব বিজয়/পরাগলি মহাভারত; শ্রীকরনন্দী/জৈমিনি ভারত; সঞ্জয়; বিজয়পণ্ডিত; ভাগবতের প্রথম বাংলা অনুবাদ/মালাধর বসু/শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

২৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় যে কোনো তিনজন কবির কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।

২৫। শিবায়ন কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা বিচার করুন। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে "রাঢ়ের জাতীয় কাব্য" বলে কেন?

২৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক ইতিহাসের স্পষ্টত কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। এ মত কি যুক্তিগ্রাহ্য? মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের জীবনে যে ইতিহাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তাঁদের কাব্যে তার কোনো উল্লেখ ও প্রভাব আছে কি?

২৭। ধর্ম দেবতার স্বরূপ নির্ধারণ করে বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করুন।

২৮। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য শাখার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যশাখার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করে ধর্মমঙ্গল কাব্যশাখার প্রতিনিধি স্থানীয় একজন কবির কবিকর্মের পরিচয় দিন।

২৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের শ্রেণিবিভাগ করে কোনো একটি ধারার দুজন প্রধান কবির কবিকৃতির আলোচনা করুন।

৩০। বাংলা সাহিত্যে শিবের যে লৌকিক রূপটি চিত্রিত হয়েছে পৌরাণিক রূপের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় দুটি মুখ্য শিবায়ন কাব্য অবলম্বনে তা দেখান।

৩১। সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যধারার মানবিক আবেদন সবচেয়ে বেশি কেন?

৩২। মঙ্গলকাব্যকে কেন 'মঙ্গলকাব্য' বলা হয়? 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা বিশ্লেষণ করুন।

৩৩। বাংলা মহগলকাব্যের প্রধান বিষয় দেবদেবী মাহাত্ম্য হলেও তাতে বাঙালি সমাজজীবন একেবারে অবহেলিত হয়নি। মন্তব্যটি বিচার করুন।

৩৪। টীকা লিখুন ঃ
কানা হরিদত্ত; বিজয়গুপ্ত; নারায়ণদেব; বিপ্রদাস পিপলাই।

১.১০ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত অধ্যায়-২ দ্রষ্টব্য।

* * *

দ্বিতীয় বিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— ১৬০১-১৭৫৭

বিষয় বিন্যাস ঃ

২.০ ভূমিকা (Introduction)
২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
২.২ অনুবাদ সাহিত্য
  ২.২.১ রামায়ণ
  ২.২.২ মহাভারত
২.৩ মঙ্গলকাব্য
  ২.৩.১ মনসামঙ্গল
  ২.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল
  ২.৩.৩ ধর্মমঙ্গল
  ২.৩.৪ অন্নদামঙ্গল
২.৪ আরাকান রাজসভা, নাথ সাহিত্য, শাক্ত পদাবলি
  ২.৪.১ আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য
  ২.৪.২ নাথ সাহিত্য
  ২.৪.৩ শাক্ত পদাবলি
২.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা
২.৬ আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার
২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা
২.৮ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি
২.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী গতানুগতিক সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হলেও নতুন চিন্তাধারার পালাবদলও সূচিত হয়। তবে এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। অনুবাদ সাহিত্যের ধারাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একমাত্র কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান পেয়েছে।

মঙ্গলকাব্য রচনায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের চর্চা ছাড়াও এযুগে ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনায় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মঙ্গলকাব্য ধারার গতানুগতিক বেড়াজাল ভেঙে যে আধুনিক চিন্তা-চেতনার বীজ-বপন করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

মঙ্গলকাব্য ছাড়াও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী উল্লেখযোগ্য সাহিত্যধারা হ'ল নাথ-সাহিত্য, শাক্তপদাবলি ও আরাকান রাজসভার সাহিত্য। আরাকান রাজসভার সাহিত্য হ'ল মূলত দেববাদ বহির্ভূত মানব-প্রেমমূলক ইসলামি সাহিত্য।

পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে।

চট্টগ্রামে ও আরাকান বহুদিন থেকেই ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে আবির্ভূত অধিকাংশ কবি ধর্মমতে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর স্মৃতি-পুরাণ-কাব্য অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিল। তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে এক উদার পরিমণ্ডল ধরা পড়েছে। তাই মধ্যযুগের আরাকানের মুসলমান কবিদের অনেকগুলি কাব্য সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজেও পরিচিত লাভ করেছে।

বস্তুত এই পর্বের মুসলমান কবিদের দ্বারা হিন্দি-ফারসি রোমান্সের পুষ্টিসাধন ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা পুরাণ অনুবাদের প্রচলিত ধারায় এই কবিদের রচিত আখ্যানকাব্যগুলি এক নতুন এবং স্বাধীন সংযোজন।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পূর্বতন সাহিত্যধারা পুনরাবৃত্তি চললেও এ যুগে কিছু নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ও ব্যতিক্রমি চিন্তা-চেতনা পরিলক্ষিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্ত্তী বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে পরবর্তীকালে তা নিষ্প্রভ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রায়বসন্ত, কবিরঞ্জন, জগদানন্দ, সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ, আলীরাজা প্রমুখ কিছু বৈষ্ণব পদকর্তা ও মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেলেও এগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাই এই অধ্যায়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা স্থান পায়নি।

অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনায় এই অধ্যায়ে দুজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদকের পরিচয় ও কাব্যকৃতির বিষয়ে আলোচনা করব। এঁরা হলেন রামায়ণের অনুবাদর অদ্ভুত আচার্য ও মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস।

পূববর্তী অধ্যায়ের মঙ্গলকাব্যের উৎস, গঠনরীতি প্রবৃতি বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাই এই অধ্যায়ে সুধু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর চার প্রকার মঙ্গল কাব্যের কবিদের পরিচয় ও কাব্যকৃতি বিষয়ে আলোচনা করব।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে পালবদল ঘটেছে বারবার। আরাকান রাজসভাকেন্দ্রিক সাহিত্য এই পালবদলের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যধারায় আরাকান রাজসভার অনুকূলেই প্রথম রচিত হল মানবপ্রেমের কাব্য। এদিক থেকে আরাকানের কবিদের কাব্যকৃতি মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারায় নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন।

আমরা এই অধ্যায়ে আরাকানের কবিদের কাব্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হব, স্বরূপ নির্ণয় করব তাঁদের কাব্যকৃতির। বাংলার নাথ সাহিত্যের আলোচনাও আমরা এই অধ্যায়ে

অন্তর্ভুক্ত করেছি। একই সঙ্গে আমরা অনুসন্ধান করব, বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব শাক্ত পদাবলির উদ্ভবের কারণসমূহ, পরিচিত হব শাক্ত পদাবলির প্রধান দুই কবির সাহিত্যকৃতির সঙ্গে।

২.২ অনুবাদ সাহিত্য

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। তবে এই যুগের ভাগবতের অনুবাদ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একমাত্র মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ ছাড়া ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদে কাব্যগুণ প্রায়ই নেই। অবশ্য এই যুগের রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ কিছুতা কৃতিত্বের দাবী রাখে।

২.২.১ রামায়ণ

সপ্তদশ শতকে রচিত রামায়ণের দু-একটি পালা পাওয়া গেছে, যেগুলির বিশেষ কোনো কাব্যগুণ নেই, তবে এই শতকের রামায়ণ অনুবাদকরূপে অদ্ভূত আচার্য ছিলেন অনেকাংশে সম্ভবনাসম্পন্ন।

অদ্ভূত আচার্য ঃ

এই কবিকে বা তাঁর গ্রন্থকে নিয়ে সেভাবে গবেষণা হয়নি, তবু বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যে কবিপরিচিতি পাওয়া যায় তাতে জানা যায় কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। পূর্ববঙ্গের রাজশাহি বা বগুড়ার সোনাবাজু বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা শ্রীনিবাস আচার্য, মাতা মেনকা দেবী। একদা স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রামকথা লিখতে আদেশ দেন এবং আশীবাদ করেন। এই শক্তির বলেই কবি অল্প বয়সে রামায়ণ রচনা করেন। এই অদ্ভূত কৃতির জন্য তাঁর নাম হয় অদ্ভূতাচার্য। ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য এই জনশ্রুতি স্বীকার করেননি, তাঁর মতে অদ্ভূতাচার্য কবির নামও নয় উপাধিও নয়। তিনি বলেন সংস্কৃত অদ্ভূত রামায়ণ অবলম্বন করেই কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। বাংলাদেশে সংস্কৃত অদ্ভূত রামায়ণকে "আশ্চর্যরামায়ণ" ও বলা হত। এই দুই নামের সংমিশ্রণেই কবি ও তাঁর কাব্যনামের এই রূপান্তর। অবশ্য এই অনুমানও তেমন দৃঢ় নয়।

কবি অদ্ভূত আচার্য যে উত্তরবঙ্গে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর রামায়ণের বেশ কিছু অংশ কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রবেশ করেছে। অদ্ভূতাচার্য সংস্কৃত 'অদ্ভূত রামায়ণ' 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'রঘুবংশ' — প্রভৃতি বিচিত্র রামকাহিনি থেকে উপাদান গ্রহণ করে তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। কবির অসাধারণ কল্পনা ও স্বকীয়তার স্পর্শে তাঁর কাব্যকে তিনি বাঙালির জীবনগাথায় পরিণত করেছেন। শুধু পূর্বতন গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ নয়, নিজেও কিছু মৌলিক কল্পনার সহযোগে অসাধারণ কাব্যরস

সৃষ্টি করেছেন। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর পারদর্শিতার সাক্ষর মুদ্রিত। তাঁর চিত্রিত কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা চরিত্রগুলি, অভিনবত্বের দাবিদার। বাঙালি চেতনার সার্বিক আদর্শ এবং মহিমা রূপায়ণে যেমন, তেমনি বাঙালি জীবনের চাপল্য তরল মুহূর্তগুলির চিত্রণেও তিনি ছিলেন সমান সিদ্ধ। বর্ণনার রীতিতে তিনি কৃত্তিবাসের অনুসারী। তবে কৃত্তিবাসের মতো সামঞ্জস্য তাঁর রচনায় নেই। তিনি এমন কিছু উদ্ভট ও আজগুবি আখ্যান তাঁর কাব্যে সংযোজন করেছেন যে তাতে তাঁর কল্পনার সামঞ্জস্যহীনতা ও প্রতিভার অসংযমই বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

২.২.২ মহাভারত

বাংলায় মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদের প্রয়াস সপ্তদশ শতকের প্রতিভাধর কবি কাশীরাম দাসই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। তার পূর্বে কেউই মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেননি। কাশীরামের আগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, মহাভারতের কয়েকটি পর্ব অনুবাদ করেছেন তবে এসব রচনার সাহিত্যগত গৌরব নেই বললেই চলে। কেবল নিত্যানন্দ ঘোষের একটি মহাভারতে বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকে নকল করা নিত্যানন্দের একটি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

কাশীরাম দাস ঃ

কাশীরাম দাস মহাভারতের সার্থকনামা অনুবাদক। এই মহাকবির সাধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েই রাজসভার কাব্য 'মহাভারত' সাধারণ বাঙালির জীবন-বেদিতে চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করেছে। কাশীরামের আসল উপাধি ছিল দেব। এই কায়স্থ কুলতিলক বিশাল সংস্কৃত মহাকাব্যকে বাঙালির উপযোগী করে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। কাশীরামের কুলপরিচয় নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যতটুকু জানা যা. কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জন্ম হয়। কাশীরামের দু একটি পুথিতে সন তারিখ জ্ঞাপন যে পয়ারগুলি আছে তা থেকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৬০২, ১৬০৩, এবং ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ— এর ইঙ্গিত পেয়েছেন। আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দুটি পুথিতে কাব্যরচনাকাল পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে ১৫৯৫ এবং ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ। আমাদের মনে হয় যে ষোড়শ শতকের শেষ দশকেই কাশীরাম ভারত পাঁচালি অনুবাদ আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত মহাভারতের চারটি পর্ব সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়ে থাকবে বলে অনুমান। অকালমৃত্যুর ফলে তিনি কাব্য নিজে সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাঁর নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পর্বে সুগ্রথিত বৃহৎ মহাভারতের কতটুকু তাঁর নিজের রচনা কতটুকু তাঁর পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র-জামাতার রচনা, কতটুকুই বা অন্য কবির লেখনীর ফসল, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি যে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেননি, এর বহু প্রমাণ পুথির মধ্যেই রয়েছে। এই পুথিগুলির উল্লেখ থেকে মনে হয়, তিনি বোধহয় তিন বা চার পর্ব

রচনার পর লোকান্তরিত হন এবং বাকি অংশ তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিলে সম্পূর্ণ করেন।

কাশীরামের কোনো কোনো পুথিতে আছে —

"আদিসভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর"।।

আরো জানা যায় মৃত্যু আসন্ন জেনে কাশীরাম ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের উপর অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে যান। কাশীরাম বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে কাশীরাম চারপর্ব রচনা করেই মারা যান এবং তাঁর ভাইপো ও জামাতার মিলে বাকি চৌদ্দপর্ব রচনা করেন। সেই সমস্ত পর্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাশীরামের ভণিতা নেই। প্রথম চারপর্ব এক হাতের রচনা বলেই তার বাঁধুনি প্রশংসনীয়, পরের পর্বগুলিতে বেশ বিশৃঙ্খল ঘটেছে। প্রথম চারটি পর্বের ভাষা পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত, অলংকার সন্নিবেশ সংস্কৃতানুসারী। পরবর্তী পর্বগুলিতে এই সমতা একেবারেই রক্ষিত হয়নি। তবে এ কথা বলা চলে কাশীরামের মহাভারত কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতোই খ্যাতি লাভ করেছে।

কাশীরাম সংস্কৃত জানতেন না বলে কেউ কেউ অভিযোগ করলেও তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় মহাভারতের প্রথম চারপর্বে পাওয়া যায়। এই চারপর্বের ভাষা ও বাগবিন্যাসের সংস্কৃতগন্ধী রীতি, তৎসম শব্দপ্রকরণ ও অলংকারসন্নিবেশের ক্লাসিক রীতি কবির প্রগাঢ় সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তবে তাঁর রচনা সংস্কৃতগন্ধী হলেও অনবদ্যভাবে সাবলীল। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনার এই অংশটি উদ্ধরণযোগ্য—

"সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটখানি কিরীট ভূষণ।।
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল।।
বিবিধ আয়ুধ ধরে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে।।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনায় কাশীরাম দাসের অনুবাদ মূলানুগ। মহাভারতের বিশাল গাম্ভীর্য তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। তাঁর অনুবাদ পদ্ধতি আক্ষরিক নয়, একে ভাবানুবাদই বলা চলে। কাশীরাম মোটামুটিভাবে সংক্ষেপেই মূল কাহিনি অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচিত অংশে ক্লাসিক সংযম, ভাবগম্ভীর রচনারীতি এবং মূলের নিপুণ অনুসরণ লক্ষ করার মতো। তিনি তাঁর অনুবাদের দু-এক স্থলে কয়েকটি স্বকল্পিত আখ্যান সংযোজন করেছেন। তাঁর রচনা তৎসম শব্দবহুল হলেও বেশ সরস, পরিচ্ছন্ন গতিশীল এবং প্রসন্ন। কৃত্তিবাসের মতো গ্রামীণ সরলতা তাঁর ভাষায় লক্ষ করা যায় না, কৃত্তিবাসের বাঙালিয়ানাও তাঁর রচনায় নেই; তবে কাশীরামের বিনীত বৈষ্ণব মনটি তাঁর রচনায় অকৃত্রিমভাবেই ধরা পড়েছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতই বাংলায় সর্বাধিক জনপ্রিয় ভারতকথা শিল্পাদর্শের বিচারে কাশীরাম মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি বলে বিবেচিত হবেন। বিগত তিনশত বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপী তাঁর কাব্যখানি

বাঙালির মনোজীবন গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা যে গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২.৩ মঙ্গলকাব্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা মঙ্গলকাব্যে উৎস, গঠন, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নিয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছি। এখানে আমরা এখন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কবিদের পরিচয় ও কাব্যকৃতির আলোচনা করব।

২.৩.১ মনসামঙ্গল

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের রচনায় লৌকিক চেতনার প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মনসামঙ্গলের কবিদের রচনায় পৌরানিক চেতনা প্রাধান্য পায়। এখন ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কেতকাদাস ক্ষেমানন্দসহ অন্যান্য কবিদের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

ষষ্ঠীবর দত্ত ঃ

কবি ষষ্ঠীবর শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ডাঃ আশুতোষ উট্টাচার্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। ইনি ষোড়শ শতকের শেষভাগের কবি বলে অনেকের ধারণা। ষষ্ঠীবরের কাব্য-কাহিনি তিনখণ্ডে বিভক্ত— দেবখণ্ড, বাণিজ্যখণ্ড এবং স্বর্গারোহণখণ্ড। সাধারণভাবে কবির রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মূল কাহিনি এবং চরিত্র বর্ণনায় তিনি প্রথানুগ হলেও বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল— তা বিশেষ অনুসঙ্গ গঠনের নিমিত্ত ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশিত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ

চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দই প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেন। অবশ্য মুদ্রণের পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের এই কবির কাব্য পূর্ববঙ্গেও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কেতকাদাসের কাব্য ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। তাঁর কাব্যের অনেকগুলি সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন পুথি পাওয়া গেছে।

কবির মূল নাম ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস তাঁর উপাধি। কেতকা অর্থাৎ মনসার তিনি সেবক— এই অর্থেই উপাধিটি প্রযুক্ত। তিনি রাঢ়ের লোক ছিলেন। কবির আত্মজীবনীতে দক্ষিণরাঢ়ের শাসনকর্তা বারা খাঁর উল্লেখ আছে। কাব্যমধ্যে উল্লিখিত বিষ্ণুদাস এবং ভারমল্লও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁদের সাহায্যে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ কবির

কাব্যরচনাকাল হিসাবে অনুমিত হয়েছে। কেতকাদাসের কবিপ্রতিভা সাধারণ স্তরের হলেও তাঁর ভাষা সুমার্জিত এবং গীতরসবহুল। কাহিনিগ্রন্থনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে তাঁর কাব্যটিকে অনেকগুলি পালার একটি বৃহৎ সঙ্কলন বলে অভিহিত করা চলে। কাব্যে স্থান লাভ করা খণ্ড খণ্ড পালাগুলির মধ্যে যোগসূত্র একান্ত ক্ষীণ। চাঁদের চরিত্রে পূর্বানুগ দৃঢ়তা অনুপস্থিত। বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনিও চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। তবে খুব সামান্য হলেও বেহুলা চরিত্রে এক আত্মসচেতন গর্বের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আর একটি বিষয়ে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন— চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপথ বর্ণনায় তিনি বাস্তব ভৌগোলিক তথ্য নিপুণভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচনা ভঙ্গিমায় তীক্ষ্ণতা ও তির্যকতার অভাব দেখা যায়। মুকুন্দরামকে অনুকরণের চিহ্ন তাঁর কাব্যদেহে প্রচুর।

তন্ত্রবিভূতি ঃ

ইনি মনসামঙ্গল কাব্যধারার এক নবাবিষ্কৃত কবি। প্রায় অপরিচিত এই কবির কাব্য একটু ভিন্ন গোত্রের। ইনি মালদহ অঞ্চলের কবি। মালদহ থেকে এঁর পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয় কবির নাম বিভূতি, তবে ভণিতায় প্রায়শ 'তন্ত্রবিভূতি' বলে উল্লিখিত। অনুমান করা যায় কবি জাতিতে তাঁতি ছিলেন, তাই নিজেকে 'তন্ত্রবিভূতি' বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন। এঁর নামে আবিষ্কৃত পুথিতে অধিকাংশ স্থানে তন্ত্রবিভূতির ভণিতা থাকলেও মাঝে মাঝে জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাও আছে। এই কবির কাব্যের কাহিনিতে প্রচলিত কাহিনির চেয়ে কিছু নতুনত্ব দেখা যায়, চরিত্রগুলিও গতানুগতিকতার দ্বারা আক্রান্ত নয়। এঁর কাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের তত্ত্বও অনেকটা মিশে গেছে। তন্ত্রবিভূতির কাব্যের কোনো কোনো অংশে উগ্র ও অনাবৃত আদিরস বর্ণনার অকুণ্ঠিত প্রকাশ ঘটেছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ

জগজ্জীবন ঘোষালও উত্তরবঙ্গের কবি, ইনি সম্ভবত তন্ত্রবিভূতির পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষেরদিকে কাব্য রচনা করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এই কবির কাব্য থেকে জানা যায় তিনি দিনাজপুরের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম রূপ, মাতার নাম রেবতী। কাব্যরচনাকাল সম্বন্ধে পুথিতে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তাঁর কাব্য দেবখণ্ড ও বাণিয়াখণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণের চেষ্টা তাঁর কাব্যে আছে। বাণিয়াখণ্ড প্রথানুগ হলেও দেবখণ্ডে তিনি অনেক নতুন ব্যাপার যোজনা করেছেন। নতুন ধরনের বেহুলা-কাহিনিতে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। চরিত্র ও স্বাভাবিক বর্ণনা তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক হলেও জগজ্জীবনের কাব্যে লক্ষ্মীন্দরের মাতুলানী-গমন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে রুচি-বিকার ও অশ্লীলতা কিছু বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে।

বাইশ কবি মনসামঙ্গল বা 'বাইশা' ঃ

পূর্ববঙ্গে মনসার পূজা ও ভাসান গানের বিশেষ প্রচারের ফলস্বরূপ নানা মনসামঙ্গল কাব্যের রচনাও এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছিল। একাধিক কবির কাব্যের নির্বাচিত অংশবিশেষ একত্র গ্রথিত করে মনসামঙ্গলের একপ্রকার সঙ্কলনও প্রচারিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে প্রচারিত এই সঙ্কলনেরই একটি ধারা বাইশ কবি মনসামঙ্গল বা বাইশা। এতে বাইশজন ছোটো-বড়ো কবির রচনাংশ একসঙ্গে গ্রন্থন করা হত। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কলকাতা থেকে বাইশার পুথি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। এই সমস্ত মুদ্রিত পুথিতে বাইশজন কবির নামের সাদৃশ্য নেই, রচনারও নানা অসামঞ্জস্য বর্তমান। তবে অধিকাংশ মুদ্রিত গ্রন্থে যাঁদের নাম এবং রচনাংশ পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন— বিশ্বেশ্বর, অকিঞ্চন দাস, রঘুনাথ দ্বিজ, রমাকান্ত, জগন্নাথ বিপ্র, বংশীদাস দ্বিজ, সীতাপতি, রাধাকৃষ্ণ, বল্লভ ঘোষ, নারায়ণদেব, গোপীচন্দ্র, জানকীনাথ, কমলনয়ন, যদুনাথ, বলরাম, হরিদাস ভট্ট, রামনিধি, অনুপচন্দ্র ভট্ট, রামকান্ত, মহিদাস, দ্বিজ হরিদাস। এঁদের মধ্যে নারায়ণদেব ও বংশীদাসের রচনাই বেশি গৃহীত হয়েছে। এই সকল বাইশা নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ, সঙ্কলিত ও মুদ্রিত পুস্তকগুলি প্রমাদপূর্ণ। সাহিত্যগুণ এগুলিতে অনুপস্থিত হলেও মনসামঙ্গল রচনার ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি উল্লেখের দাবিদার।

২.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল

ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের রচনা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। তবু ষোড়শ শতকের পরবর্তী কালের অনেকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করলেও দ্বিজ রামদেবের রচনা কিছুটা কৃতিত্বের দাবী রাখে।

দ্বিজ রামদেব ঃ

এই কবির কাব্য আধুনিককালে আবিষ্কৃত, 'অভয়ামঙ্গল' নামে তাঁর পুথিটি মুদ্রিত হয়েছে। পুথিতে প্রাপ্ত ইঙ্গিত অনুসারে মনে হয় কাব্য রচনাকাল ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দ। ইনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক। তাঁর কাব্যে মুকুন্দের প্রভাব নেই। কাব্যমধ্যে কিছু বৈষ্ণব কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। খুল্লনার বাৎসল্য বর্ণনায় কবি বেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতকের শেষে এমনকি অষ্টাদশ শতকেও চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারাটি অব্যাহত ছিল। মুক্তারাম, জয়নারায়ণ, ভবানীশঙ্কর, অকিঞ্চন প্রমুখ কবিরা চণ্ডীকাব্য রচনা করলেও এঁরা কেউই মুকুন্দরামের প্রভাব এড়াতে পারেননি। সাহিত্যগুণে এঁদের কাব্য অপকৃষ্ট, আর তাই সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবিদার নন।

২.৩.৩ ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এই শতকেও পশ্চিমবঙ্গে এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর এবং ধর্মসম্প্রদায় বেশ জনপ্রিয়। আর্য, অনার্য, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ধর্মঠাকুরকেন্দ্রিক-অনেকাংশে আঞ্চলিক এই ধর্মোৎসব পশ্চিমবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গের কিয়দংশের সামাজিক উৎসব; যে উৎসবে ব্রাহ্মণ, ডোম প্রভৃতি ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যোগদান করে থাকে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উনিশ শতকের শেষেরদিকে বাংলাদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে প্রাচীন পুথি আবিষ্কারের সময় ধর্মমঙ্গল কাব্য, শূন্যপুরাণ ইত্যাদি আবিষ্কার করলেন এবং লক্ষ করলেন বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের সমাজে ধর্মঠাকুর বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পার্থক্য বহুলাংশেই বিদ্যমান।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের এবং ধর্মঠাকুরের সঙ্গে অন্যান্য মঙ্গলদেবতার প্রধান পার্থক্যগুলি এভাবে চিহ্নিত করা যেনে পারে—

(১) মঙ্গলকাব্য সাধারণত স্ত্রী দেবতার মহিমা প্রচার করে, কিন্তু ধর্মঠাকুর পুরুষ দেবতা।

(২) ধর্মমঙ্গলের কাহিনিতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো অনেক গল্প-আখ্যান থাকলেও এতে প্রাচীন রাঢ় দেশের কিছু ঐতিহাসিক উপাদান প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত।

(৩) ধর্মসাধনায় বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

(৪) ধর্মমঙ্গলের কাহিনিতে যুদ্ধবিগ্রহ ও বীররসের চর্চা আছে যা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে নেই।

(৫) ধর্মঠাকুর ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষ কর্তৃক পূজিত, আর কবিরাও নিম্নবর্ণের।

(৬) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতার কৃপা লাভের জন্য ভক্তকে অনেক দুঃখের অনলে পরিশুদ্ধ হতে হয়েছে; কিন্তু ধর্মমঙ্গলে ভক্তের প্রতি দেবতার বাৎসল্য ভাবই প্রথমাবধি অধিকতর প্রকাশিত।

(৭) মনসা, চণ্ডী, অন্নদা প্রভৃতি মঙ্গলদেবীদের প্রভাব সমস্ত বাংলাদেশেই পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ধর্মঠাকুরের প্রভাব একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের অর্থাৎ বর্তমান হুগলী, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলিতেই সীমাবদ্ধ। এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলেও অভিহিত করা হয়।

ধর্মপূজা বিধানে বহুস্থলে ধর্মদেবতাকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইনি বৌদ্ধ দেবতা, নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে শূন্য রূপী বুদ্ধদেবের বর্ণনাই প্রচ্ছন্নভাবে গৃহীত হয়েছে। ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর মতে ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্যদেবতা। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈদিক বরুণ দেবতা, ডোম-চাঁড়াল জাতির রণ-দেবতা, অনার্যের শিলা দেবতা, মুসলমানদের ফকির বেশধারী দেবতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ

উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। ধর্ম কোনোস্থলে কূর্মরূপে পূজিত, আবার কোথাও তাঁর আকৃতি গোলাকার, কোথাও ডিম্বাকৃতি, কোথাও কাঁকড়াবিছার মতো। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন ধর্মঠাকুর ডোম জাতির সর্বোত্তম দেবতা সূর্য, বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর মিলিত রূপ; এবং তাঁর মতে "ধর্মপূজার মধ্যে সূর্যোপাসনার তিনটি ধারা, যথা— একটি আদিম (Primitive), একটি বৈদিক ও একটি পারসিক একত্র মিশিয়া গিয়াছে।" পণ্ডিতগণের গবেষণান্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পরবর্তীকালের বৌদ্ধদর্শন, আদিবাসীদের ধর্মচার, নাথ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রভৃতির প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর।

যে অজ্ঞাত পরিচয় ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসাহিত্য কেন্দ্রিক একটা আঞ্চলিক সমাজ-ঐতিহ্যের বিশেষ পরিচয় সাধারণ শিক্ষিত সমাজের রসিক পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে- তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি খুব বেশি প্রাচীন গৌরবের দাবিদার না হলেও পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের অজস্র পুথি সঙ্কলিত হয়েছে। সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে দুটি গল্প দেখা যায়— (১) রাজা হরিশচন্দ্রের গল্প এবং (২) লাউসেনের কাহিনি। দ্বিতীয়টিই অধিকতর জনপ্রিয়। ধর্মের সেবক লাউসেন দৈব-কৃপায় শৈশব থেকেই কীভাবে রক্ষা পেয়েছে, পরে দেবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসাধারণ বীরত্ব ও অবিশ্বাস্য-অতিপ্রাকৃত শক্তির পরিচয় দিয়েছে— তার সুবিস্তৃত বর্ণনাই এই দ্বিতীয় ধারার ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান অবলম্বন।

এবারে আসুন ধর্মমঙ্গলের প্রধান কয়েকজন কবির কাব্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

ময়ূরভট্ট

ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গলের আদিকবি। সপ্তদশ শতকেই ধর্মমঙ্গল রচনা শুরু হয়। ময়ূরভট্টও সপ্তদশ শতকের কবি। এখনও পর্যন্ত তাঁর রচিত ধর্মপুরাণই প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল। ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী নিজের রচনাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকার করেছেন—

"হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূর ভট্টের পথে
গামগম্য শ্রীধর্ম সভায়।"

এথেকে বোঝা যায় ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট, তাঁর রচিত কাব্যের নাম হাকন্দপুরাণ। ঘনরাম ছাড়াও পরবর্তীকালের বিভিন্ন কবিরা পূর্বজ কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ১৩৩৭ সনে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি পুথি ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণরূপে প্রকাশ করলে এই কবিকে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য গবেষকদের মধ্যে বিষম গণ্ডগোল দেখা দেয়। ছাপা গ্রন্থটির ভাষা দেখে অনেকে মনে করেন এটি একটি অর্বাচীন পুথি। ময়ূরভট্ট নামে অবশ্য সূর্যশতকের রচয়িতা এক কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত, এমতাবস্থায় কেউ কেউ সূর্যশতকের ময়ূরভট্ট এবং শ্রীধর্মপুরাণের ময়ূরভট্টকে একই কবি বলতে চান। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ময়ূরভট্ট সপ্তম শতকে বাণভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে প্রাচীন বাংলার কিংবদন্তী অনুসারে ধর্মমঙ্গলের রচয়িতা ময়ূরভট্ট নামে কোনো কবি থাকলেও বসন্তকুমার সম্পাদিত শ্রীধর্মপুরাণ আদৌ প্রামাণিক গ্রন্থ নয়।

পরবর্তীকালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ বলে যা মুদ্রিত হয়েছে, তা আসলে ভূতনাথ পণ্ডিত নামে একজন ডোম পণ্ডিতের রচনা এবং একটি আধুনিক জাল গ্রন্থকে ময়ূরভট্টের প্রাচীন পুথি বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল।

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপর একজন উল্লেখযোগ্য কবি রূপরাম চক্রবর্তী। ইনি সপ্তদশ শতকের লোক। তাঁর রচিত কাব্যের নাম অনাদ্যমঙ্গল। তাঁর কাব্যে সন তারিখ সংক্রান্ত যে পয়ারটি আছে তা থেকে অন্তত ছয়টি আলাদা আলাদা রচনাকাল পাওয়া যাচ্ছে। পণ্ডিতগণের অনুমান ইনি সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি। বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়, পাঠে অমনোযোগিতার জন্য রূপরাম রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে ভর্ৎসিত হয়ে দুঃখিত অন্তরে নবদ্বীপ যাওয়ার পথে ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান। পথে বহু দুর্ভোগের পর কবি গোপভূমের রাজা গনেশের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন।

রূপরামের প্রধান গুণ রচনার সরলতা। তিনি পাণ্ডিত্যমুক্ত। সহজ অলঙ্কারিকতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টিতে তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রসৃষ্টি, সচ্ছন্দ বর্ণনাভঙ্গি, করুণরস ও হাস্য পরিহাসের আবহ সৃষ্টিতে তিনি প্রায় মুকুন্দরামের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। তিনিই প্রথম লাউসেন কাহিনিকে ব্রতকথার সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে কাব্যের কাহিনিতে উন্নীত করেছেন।

রামদাস আদক ঃ

ইনি সপ্তদশ শতকের কবি। রামদাস গতানুগতিক পথেও কিছুটা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এঁর কাব্যের আত্মজীবনীটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জাত

বলে এই অংশে জীবনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। তাঁর কাব্যে সেপাইদের বেগার খাটানোর যে ছবি পাওয়া যায়, তা সমকালীনতার বাস্তব চিত্র হিসাবেও গৃহীত হওয়ার যোগ্য। রামদাসের অনাদিমঙ্গলের পুথিতে যে সন তারিখের উল্লেখ আছে তা থেকে মনে হয় কাব্যটি ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে রচিত। রামদাসের ভাষা পরিচ্ছন্ন। অলঙ্কার, শব্দযোজনা ও রূপনির্মিতি প্রশংসনীয়।

সীতারাম দাস ঃ

১৬৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। আত্মজীবনী থেকে জানা যায় বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম। তাঁর পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। কবির আত্মকাহিনিটি বেশ বাস্তব। তাঁর কাব্যের কাহিনি পরিচ্ছন্ন ও বিবৃতিমূলক, চরিত্রে নেই বিশেষ কোনো নতুনত্ব। নানা ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ তার পুথিগুলি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পালার সমষ্টি মাত্র।

যদুনাথ বা যাদবনাথ ঃ

এই কবি হাওড়া জেলার লোক ছিলেন বলে মনে করা হয়। পুথিতে প্রাপ্ত ইঙ্গিত থেকে মনে হয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এই কবি ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। অবশ্য কবি নিজের কাব্যকে সর্বত্র আগমপুরাণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কাব্যে লাউসেন-কাহিনি অনুপস্থিত; তবে কবি হরিশচন্দ্র-লুইচন্দ্রের সাথে রামাই-পণ্ডিতের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এমনকি মুসলমান পীর-ফকিরের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনি পরিচ্ছন্ন। কাব্যমধ্যে কবির পুরাণজ্ঞান ও বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সংযত প্রকাশ ঘটেছে।

শ্যামপণ্ডিত ঃ

শ্যামপণ্ডিতের কাব্য নিরঞ্জনমঙ্গল নামে পরিচিত। 'পণ্ডিত' উপাধি দেখে মনে হয় কবি ডোমের ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাব্যমধ্যে স্থানীয় শব্দ দেখে এঁকে বীরভূমের অধিবাসী বলে মনে হয়। তাঁর পুথিগুলি খুব বিশুদ্ধ নয়, কারণ এতে অন্য কবির ভণিতা আছে। এখনো বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মের গাজনের সময় তাঁর কাব্য পঠিত হয়।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ

অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর কাব্যই সর্বপ্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। বর্ধমানের কৃষ্ণপুর

গ্রামের এই কবি ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। ঘনরাম নানা পুরাণ, উপপুরাণ ও কাব্যকাহিনি থেকে তাঁর ধর্মমঙ্গলে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হরিশচন্দ্র ও লাউসেনের দুটি কাহিনিকে সবিস্তারে বর্ণনা করে পাঁচালিকাব্যকে প্রায় মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিতে চেয়েছেন। চব্বিশটি পালাতে এই বিরাট কাব্যটি বিভক্ত। কিন্তু আকারে মহাকাব্যোচিত বিশালতা থাকলেও রচনাভঙ্গি ও মনোভঙ্গিতে তিনি পাঁচালির আদর্শ অতিক্রম করতে পারেননি। লাউসেনের অসাধ্য সাধনের ঘটনাগুলিতে প্রচুর অনৈসর্গিক কাহিনির সংযোজনের ফলে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা মুছে গেছে। তবে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও নারীধর্মের মহিমা প্রকাশে তিনি সফল হয়েছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাংসারিক জ্ঞান, মানবচরিত্র জ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপারে যে তাঁর স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল, কাব্যটিতে সেই প্রমাণ প্রচুর। স্থানে স্থানে আদিরসের অকুণ্ঠিত প্রকাশ থাকলেও করুণরস সৃষ্টিতে ও হাস্যকৌতুক পরিবেশনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বীরশ্রেষ্ঠ লাউসেনের অনমনীয় পৌরুষ, অদম্য বীরত্বের সঙ্গে সুপবিত্র নৈতিক আচরণকে মিলিয়ে দিয়ে আঠারো শতকের অবক্ষয়ী সাহিত্যাদর্শের বিপরীতে একটি বলিষ্ঠ প্রাণবানও শুদ্ধ জীবনকে উপস্থিত করেছেন ঘনরাম। সর্বোপরি তাঁর কাব্যে এ যুগের রাঢ়ের সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হয়েছে, তাই সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য স্বীকৃত।

মাণিক গাঙ্গুলি ঃ

আবির্ভাবকাল এবং গ্রন্থ রচনার সন তারিখ নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় মাণিক গাঙ্গুলি একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মমঙ্গল'। তাঁর কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত। তাঁর কাব্য ঘনরামের কাব্যাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন। বারোদিন ধরে কাব্যটি পড়া হত বলে একে 'বারোমতি' বা 'বার্মাতি' বলা হয়। তাঁর কাব্যের বর্ণনার ধারা গতানুগতিক। ঘটনা ও চরিত্রে তিনি কোনো নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। রামায়ণ-মহাভারত থেকে উপাদান ব্যবহার করে তিনি ধর্মঠাকুরকে প্রায় পৌরাণিক পর্যায়ে উন্নীত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে কবি ধর্মপূজাবিধান ও ধর্মোৎসব সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ঃ

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ নগেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন। জনশ্রুতি মতে রামাই পণ্ডিতই মর্তে প্রথম ধর্মপূজা প্রচার করেন, কারো মতে তিনি স্বয়ং ধর্মের অবতার। কেউবা তাঁর ঐতিহাসিক পরিচয়ও উদ্ধার করেছেন, তবে এ বিষয়ে প্রামাণিক তথ্যের অভাব আছে। আর তাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের ভাষা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। গবেষকদের মধ্যে অনেকে রামাই পণ্ডিতকে দশম-একাদশ শতকে স্থাপন করতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই শূন্যপুরাণ সপ্তদশ শতকের শেষে বা অষ্টাদশ শতকে লিখিত।

শূন্যপুরাণের প্রকৃত নাম আগমপুরাণ বা রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি। কিন্তু পুস্তকমধ্যে নানা স্থানে শূন্যের উল্লেখ আছে বলে এটি শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত। শূন্যপুরাণ প্রথানুগ ধর্মমঙ্গল নয়, এতে ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ স্থান লাভ করেছে। এটি অনেকটা ধর্মপূজা বিধান, সৃষ্টিপত্তনের কথায় পূর্ণ। ধর্মনিরঞ্জন কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি উৎপত্তি পর্ব এবং ধর্মপূজার ব্রত, উপাসনা, পূজাবিধি এতে সবিস্তারে উল্লিখিত।

এই শূন্যপুরাণের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক কতকগুলি অদ্ভুত ছড়া। এই ছড়া কোনো কোনো ধর্মমঙ্গলেও পুনরুল্লিখিত হয়েছে। স্বধর্মীদের উপর ওড়িশার যাজপুরের বৈদিক ব্রাহ্মণরা অত্যাচার শুরু করলে উপাসকগণ ধর্মঠাকুরের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, তখন ধর্মদেব ধর্মের উপাসকদের রক্ষার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের শাস্তি দিতে মর্তে অবতীর্ণ হলেন, সঙ্গে এলেন স্বর্গের দেব-দেবীরা, তবে তাঁরা এলেন মুসলমানের ছদ্মবেশে। এঁরা যাজপুরে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদের জেহাদের ধ্বনি দিতে দিতে বৈদিক ব্রাহ্মণদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে স্বধর্মীদের রক্ষা করলেন। ছড়াটি কাব্যাদর্শে নিকৃষ্ট হলেও সে যুগের বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এটি মূল্যবান। বৌদ্ধ সংস্পর্শজনিত ধর্মের দলকে উচ্চস্তরের হিন্দুরা যথেষ্ট নিগ্রহ করতেন। একসময় বাংলায় মুসলমান অভিযান শুরু হওয়ায় হিন্দুরা অত্যাচারিত হতে লাগলেন, এতে ধর্মের দল মনে করেছিল যে স্বয়ং ধর্মরাজ তাদের রক্ষার জন্য মুসলমানের ছদ্মবেশে এসে হিন্দুদের দমন করছেন। হিন্দু, মুসলমান ও ধর্মের (বৌদ্ধ) দলের পারস্পরিক বিরোধের সম্পর্কটি দূর ঐতিহাসিক স্মৃতিবহ ইঙ্গিতের সাহায্যে নিরঞ্জনের রুষ্মায় বর্ণিত হয়েছে।

কোনো কোনো সমালোচক ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত কাহিনিতে ইতিহাসের ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছেন এবং একে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য অভিধায় ভূষিত করেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি সমস্ত বাংলাদেশে প্রচারলাভ করলেও ধর্মমঙ্গলের কাহিনি কেবল অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ এবং এ কাহিনির মূলে কোনো না কোনো ভাবে ঐতিহাসিক পটভূমির সম্পর্ক আছে। লাউসেনের বীরত্বব্যঞ্জক গল্প কাহিনিটি স্থানীয় আধারে কাব্যে পল্লবিত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গলে রাঢ় দেশের পুরোনো জীবনালেখ্য ধরা পড়ছে। এর পটভূমি ইতিহাস ঘেঁষা; এর মধ্যে একিটি বিশেষ যুগের জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি পালযুগের পরবর্তী সময়েরে গোটা জাতির ইতিহাসের ছবিও এখানে আছে। কিন্তু তবুও এই ব্যালাড জাতীয় সৃষ্টিকে, এর অবিশ্বাস্য গল্প-গাথাকে জাতীয় মহাকাব্য বলা যায় কিনা এ নিয়ে সংশয় আছে। কারণ কাহিনির পশ্চাৎপটে রাঢ়ের বিস্মৃত যুগের উপকাহিনির মিশেল থাকলেও জাতীয় মহাকাব্যরূপে পরিগণিত হতে হলে যেরূপ সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপকতা প্রয়োজন ধর্মমঙ্গলের আঞ্চলিক কাহিনি সেই ব্যাপকতা থেকে বঞ্চিত। অবশ্য একথাও ঠিক যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ধর্মমঙ্গল কাব্যই আকারে প্রায় মহাকাব্যের মতো বিশাল, এতে আছে ইতিহাসের খানিকটা রং আর একটি যুগের রাঢ়দেশের ভাসা-ভাসা ছবি— ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য এটুকুই।

২.৩.৪ অন্নদামঙ্গল

মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গলকে একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র ভারতচন্দ্রই এই শাখায় কাব্য রচনা করেছেন। অতএব অন্নদামঙ্গলের আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভারত প্রতিভার মূল্যায়নেই আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

ভারতচন্দ্র ঃ

অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সারস্বত সাধক। কবি অসাধারণ শব্দমন্ত্রে, তির্যক বাকভঙ্গিমায়, সরস হাস্যপরিহাসে এবং অম্লাক্ত ব্যঙ্গবিদ্রুপে যে বিচিত্র নাগরিকতার পরিচয় দিয়েছেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি মধ্যযুগীয়ধারা অনুসরণে মঙ্গলকাব্যেরই অনুবর্তন করেছেন, তবু তার মধ্যে গ্রামীণ স্থূলতার পরিবর্তে আধুনিক যুগলক্ষণাক্রান্ত নাগরিক সূক্ষ্মতার পরিচয় সমধিক। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ছয়শত বৎসর ব্যাপী সৃষ্টির ইতিহাসে ভারতচন্দ্রই এক এবং অদ্বিতীয় কবি ব্যক্তিত্ব, যিনি পরবর্তীকালের বিচারে একই সঙ্গে বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমানের ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হলেও ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁকে বাল্যকাল থেকেই অশেষ দুঃখভোগ করতে হয়। মাতুলালয়ে থেকে পনেরো বৎসরকাল অবধি সংস্কৃত-শিক্ষার পর পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ফারসিও শেখেন। নিজ মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করে আত্মীয়মহলে অশেষ দুঃখভোগ করলেও জীবন সম্পর্কে একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ তাঁকে মাথা তুলতে সাহায্য করেছিল। পরিবারের সম্পত্তি দেখাশোনা করতে গিয়ে ইনি বিনাদোষে কারারুদ্ধ হন, সেখানে থেকে বৈষ্ণব বেশে পালিয়ে বৃন্দাবনধামে কিছুদিন কাটান, বৈরাগী দলের সঙ্গে হুগলীতে এলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে সত্যপীরের পাঁচালি লিখে ও কিছু কিছু কবিতা লিখে ভারতচন্দ্র প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে চরম দুর্দিনের সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে চল্লিশ টাকা বেতনের সভাকবি নিয়োগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকার সময় তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি "অন্নদামঙ্গল" কাব্য রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের পর তিনি "বিদ্যাসুন্দর" ও "ভবানন্দ মজুমদারের পালা" মূলগ্রন্থে সংযোজিত করেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ "রসমঞ্জরী" একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাংলা, হিন্দি, ফারসি, সংস্কৃত মিলিয়ে একটি চণ্ডীনাটক রচনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বহুমূত্র রোগে পলাশির যুদ্ধের তিনবছর পরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করায় এই নাটকটি শেষ করতে পারেন নি। শেষজীবনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরই অকরুণ ব্যবহারে ভারতচন্দ্রকে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল।

বর্গির আক্রমণ ও বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অন্ধকার দিনগুলিতে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। তখন এদিকে যেমন বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সমাজবাঁধন যাচ্ছিল শিথিল হয়ে, সমাজের সুউচ্চ জীবনাদর্শে ভাঙন এবং নৈতিক বলের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সময়ে একটি ভোগবাদ সভ্যতাকে করছিল কলুষিত। কৃষি অর্থনীতির কাঠামো যখন ভাঙছিল, চারিদিকে অন্নাভাব ও দারিদ্র্যের পীড়নে জীবন যখন অস্তিত্বের গভীর সঙ্কটে জর্জরিত, ভারতচন্দ্র তখন হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ আক্রমণে এই শব্দ-কুশল কবি সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলির উপর নীতিবুদ্ধির আলোকপাত করেছেন। যে ব্যঙ্গে ভারতচন্দ্রের স্বাভাবিক অধিকার, সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শক্তি বোধকরি ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন দুঃখের সঙ্গে প্রসন্নমনের লড়াই থেকে উদ্ভূত।

ভারতচন্দ্রের প্রথম দুখানি পাঁচালির একটি রচতি হয়েছিল ১৭৩৭-৩৮ সালে, অপরটির রচনাকাল জানা যায় না। এই দুটি পাঁচালিতে পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি বাদ দিলে ভারতচন্দ্র সময়ে সময়ে বিবিধ বিষয়ে যেসব ছোটো ছোটো কবিতা লিখেছেন, এই গুলির দ্বারা তিনি মধ্যযুগের গোষ্ঠীতান্ত্রিক সংস্কার পেরিয়ে প্রায় আধুনিক যুগের সীমায় এসে পৌঁছেছেন। তিনখণ্ডে রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যই ভারত-কীর্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী। প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় অংশ বিদ্যাসুন্দর এবং তৃতীয়াংশ মানসিংহ। এতে প্রথমে মঙ্গলকাব্যের রীতিতে কাব্যোৎপত্তির কারণ, আত্মচরিত, সমকালীন দেশের অবস্থাবর্ণন, কবির প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্রের সভার চিত্র উপস্থিত। দেবখণ্ডের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের দ্বারা প্রভাবিত। পুরাণ থেকে সঙ্কলন করেছেন নানা প্রসঙ্গ। নুতনত্বের সাক্ষর বহনকারী কাশীধামের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গটি গৃহীত হয়েছে কাশীখণ্ড নামক উপপুরাণ থেকে। সম্পূর্ণ নিজস্ব কল্পনায় সংযোজিত হয়েছে ব্যাস কাহিনি। ভক্তি-ভাবনায় যদিও টান পড়েছিল তবু কাব্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যেই বোধকরি মঙ্গলকাব্যের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরামকে বাদ দিলে মধ্যযুগের আর কোনো কবির রচনায় ভারতচন্দ্রের মতো সমগ্র যুগপরিবেশটি ধরা পড়েনি। অন্নদামঙ্গলের কবি মঙ্গলকাব্যের কাঠামোগত শৃঙ্খলা মেনে নিয়েও সেই শিকল বাজিয়েই নতুন সুর তুলেছিলেন; যে সুরে আঠারো শতকের জীবনেরই গান গীত হয়েছে। মঙ্গলকবির শ্রদ্ধার জায়গায় ভারতের কাব্যে এসেছে শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও বিশ্লেষণ। ব্যাস কাহিনির মধ্যে আঠারো শতকের ধর্মসম্প্রদায়গুলির লড়াইকেই রূপ দেওয়া হয়েছে, শিব-পার্বতীর ঘর-গেরস্থালির বর্ণনায় কৃষক পরিবারের ব্যথা-বেদনার ছবিই আমরা খুঁজি পাই। গৃহিণীর উপর রাগ করে ভিক্ষায় বেরিয়ে—

"যেখানে যেখানে শিব ভিক্ষা হেতু যান,
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান।।"

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে বিভিন ধরনের ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে

বিস্তর', 'মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়', 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী'— প্রভৃতি উক্তিগুলি তাঁর অমর সৃজনী-প্রতিভা স্পর্শে বাংলার নিত্যব্যবহার্য প্রবচনে পরিণত হয়েছে। বস্তুত ভারতচন্দ্রই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রথম শিল্পী যিনি ভক্তিতে গদগদ না হয়ে আর্টের কথা মাথায় রেখে কাব্য রচনা করেছেন। তাই এযুগের সমালোচক তাঁকে 'Supreme Literary Craftmam' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

দ্বিতীয় আখ্যান 'বিদ্যাসুন্দর'। এটি একটি অশ্লীল গ্রন্থ হলেও ভারতচন্দ্র আদিরসের ফেনিলতাকে শিল্পের দ্বারা সংযত রেখেছেন। শেষখণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ খণ্ড একটি প্রায় নিকৃষ্ট রচনা। এতে ইতিহাস এবং উদ্ভট ব্যাপার একসঙ্গে মিশে গিয়ে জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়েছে। পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের আদিপুরুষদের গৌরব বাড়ানোর জন্য ভবানন্দ মজুমদারের গল্পটিকে অতিরঞ্জিত করে অবিশ্বাস্য রূপকথার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন কবি।

পরবর্তীকালের রসমঞ্জরীতে অলঙ্কারশাস্ত্রের নজিরে নায়ক-নায়িকার বর্ণনা ভারতচন্দ্র বেশ চমৎকারভাবেই দিয়েছেন। চণ্ডী নাটকটি শেষ করলে একটা অদ্ভুত কিছু সৃষ্টি হত। আজকের দিনের বিচারে ভারতচন্দ্র অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হয় যে ভারতচন্দ্র আঠারো শতকের আবহাওয়ায় বিদ্যাপতিরই মতো একজন রাজসভার কবি। দায়ে পড়েও তাঁকে রচনার পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে হয়েছিল। শব্দ-মন্ত্র, মণ্ডনকলা, ছন্দ প্রকরণ ও হাস্য পরিহাসের তীক্ষ্ণতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে রাজকণ্ঠের মণিমালার সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভারতীর এই প্রতিভাধর কবির গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছেন।

২.৪ আরাকান রাজসভা, নাথ সাহিত্য, শাক্ত পদাবলি

পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে।

চট্টগ্রামে ও আরাকান বহুদিন থেকেই ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে আবির্ভূত অধিকাংশ কবি ধর্মমতে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর স্মৃতি-পুরাণ-কাব্য অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিল। তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে এক উদার পরিমণ্ডল ধরা পড়েছে। তাই মধ্যযুগের আরাকানের মুসলমান কবিদের অনেকগুলি কাব্য সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজেও পরিচিত লাভ করেছে।

বস্তুত এই পর্বের মুসলমান কবিদের দ্বারা হিন্দি-ফারসি রোমান্সের পুষ্টিসাধন ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা পুরাণ অনুবাদের প্রচলিত ধারায় এই কবিদের রচিত আখ্যানকাব্যগুলি এক নতুন এবং স্বাধীন সংযোজন।

আসুন আরাকান রাজসভার প্রধান দুইজন কবি এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। এর পর আমরা মধ্যযুগীয় নতুন সাহিত্যধারা নাথ সাহিত্য ও শাক্ত পদাবলির সঙ্গে পরিচিত হব।

২.৪.১ আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান কবি স্মরণীয় হয়ে আছেন, যাঁদের প্রতিভায় বাংলা কাব্যে অভিনব বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছিল তাঁদের প্রায় সকলেই সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে বাস করতেন। এই শতকের জনপ্রিয় কবিদের কথা বাদ দিলেও, পণ্ডিতগণের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এদেশে ইসলামি তমদ্দুন সংহতি লাভ করলে ঐ সময়ে সেমেটিক রীতিতে উল্টো করে কিছু বাংলা বই ছাপানো হয়েছিল। এ ছাড়াও পঞ্চাদশ-ষোড়শ শতকে অন্তত সুফি সম্প্রদায়ের কয়েকজন কবি ও সাবিরিদ খাঁ, দৌলত উজীর, চাঁদ গাজী প্রমুখ চৈতন্যভক্ত মুসলমান কবি কিছু কাব্য রচনা করেন। তবে সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবিরাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। সতেরো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান সুফি সাধনা, হিন্দু যোগতন্ত্র এবং কিছু ইসলামি বিষয় নিয়ে মোটা আটটি কাব্য লিখেছিলেন। মহম্মদ খান 'সত্যকলি-বিবাদ সংবাদ' নামক রূপক কাব্য লিখেছিলেন। হাজী মহম্মদ এই সময়ের কবি। তবে এদের কবিতা মূলত মুসলমানদের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু এই শতাব্দীতেই অন্তত দুজন মুসলমান কবি কবিত্বের জোরে হিন্দুসমাজেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই দুজন কবি হলেন দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। এঁদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরাকান রাজসভার দুজন রাজার নাম। আরাকানের রাজশক্তি এই দুজন কবিকে কাব্য রচনায় সহায়তা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এবারে আমরা এই দুজন কবির কাব্যকৃতির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

দৌলত কাজী ঃ

চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের দৌলত কাজী অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আরাকানরাজ থিরি-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) রাজসভায় পরম সমাদরে গৃহীত হন এবং রাজপুরুষ আশরফ খানের সহায়তাও ও উপদেশে ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে মিয়া সাধনের হিন্দি কাব্য 'মৈনা কো সত্' - এর গল্প অবলম্বনে লোরচন্দ্রানী বা সতীময়না কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তবে কিছুদূর লেখার পর তার আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরে আরাকান রাজ সান্দ-থু-ধম্মার (চন্দ্রসুধর্মা) প্রধানমন্ত্রী সোলোমানের অনুরোধে কবি আলাওল এই কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

এ কাব্যটির সংক্ষিপ্তসার এরকম — গোহারী দেশের রাজা মোহরার কন্যা চন্দ্রানীর স্বামী বামন নপুংসক কিন্তু বীর। নৃপতি লোর তার রানি ময়নামতীকে নিয়ে সুখে থাকা সত্ত্বেও চন্দ্রানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হন এবং চন্দ্রানীর স্বামীকে হত্যা করে রাজা মোহরার আজ্ঞায় তাকে বিয়ে করে গোহারীর রাজা হন। এদিকে রানী ময়না পতি বিরহে কাতর হয়ে শিবদুর্গার আরাধনা শুরু করেন এবং নানাবিধ লোভ-মোহকে জয় করে শেষে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন।

আরব্যরজনীর দ্বারা প্রভাবিত ফারসি কিস্সার ছাপ লোরচন্দ্রানী কাব্যটির প্রথম ভাগে দেখা যায়। যে অংশটুকু আলাওল সমাপ্ত করেছেন, সেটুকুর কাহিনি-বাঁধন শিথিল,

কিন্তু দৌলত কাজীর রচিত অংশটুকুর মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। উপমা, শব্দচিত্র এবং শব্দসঙ্গীত সৃষ্টিতে দৌলত কাজীর দক্ষতা লক্ষ করার মতো। যেমন—

"মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।
শাঙন-গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।।"

এখানে বৈষ্ণব পদাবলির ছাপও লক্ষ করা যায়।

সৈয়দ আলাওল ঃ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওল শ্রেষ্ঠ। কবির আত্মপরিচয়ে দেখা যাচ্ছে তিনি ষোড়শ শতকের শেষভাগে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হার্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম, ঘোড়সওয়ার সেনানীর জীবিকা, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ, কারাবাস, কারামুক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, রাজসম্মান ইত্যাদি ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় তাঁর জীবন নাটকীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত নাট্যকলায়ও তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি আরাকানের সেনাবাহিনীর চাকুরি করার সময় তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর তাঁকে সহায়তা করেন। আরাকানের রাজগৃহে কোনো কারণে তাঁকে বন্দী থাকতে হলেও রাজকর্মচারীদের আনুকূল্যে অল্পদিনেই তিনি মর্যদা ফিরে পান। আরাকানরাজ চন্দ্রসুধর্মা এবং অর্থমন্ত্রী সোলেমানের নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন। মূলত ইসলামি, আরবি, ফারসি গ্রন্থই তিনি অনুবাদ করেন। দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ রচনা ছাড়া আলাওল কোনো স্বাধীন রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁর সৃষ্টিতালিকা - (১) পদ্মাবতী (১৬৪৬) (২) লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ (১৬৫৯) (৩) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-৭০খ্রিস্টাব্দ) (৪) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০) (৫) তোহ্‌ফা (১৬৬৩-৬৯) এবং (৬) সেকেন্দারনামা (১৬৭২)।

প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি মহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্য অবলম্বনে রচিত পদ্মাবতী কাব্যই আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পদ্মাবতী-আলাউদ্দিন ঘটিত কাহিনিটি ঐতিহাসিক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। জায়সী তাঁর কাব্যে সুফি সাধনার রূপকে পদ্মাবতী, রত্নসেন, আলাউদ্দিনের গল্পটি বলেছেন। আলাওল জায়সীর রূপক নীতি গ্রহণ করেননি, তিনি প্রকৃতই একটি রোমান্টিক ঐতিহাসিক কাব্য লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। আলাওলের বাকি অনুবাদকর্মগুলি ইসলাম সংস্কৃতি-নির্ভর বলে হিন্দুদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয়তা হতে পারেনি। কিন্তু পদ্মাবতী সম্প্রদায়ের সীমা লঙঘন করে সমগ্র বাংলাভাষী মানুষের কাছেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহারের জন্য কোনো কোনো দুর্বল লেখক আলাওলের নামে নিজেদের কিছু লেখা চালিয়ে নিতে চেয়েছেন।

আলাওল ও দৌলত কাজী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। মধ্যযুগের সমস্ত কবিরা যখন ধর্মমুখী লিরিক রচনায় ও দেবতার প্রতি কাব্যের অঞ্জলি প্রদানে ব্যস্ত, তখন আরাকানের কবিরা নর-নারীর বিরহ-মিলনের রোমান্টিক

প্রণয়কাব্য লিখছেন। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম ব্যক্তি মানুষের (man the individual) প্রকাশ লক্ষ করা গেল।

২.৪.২ নাথ সাহিত্য

নিষাদ কিরাত প্রমুখ ভারতবর্ষের অনার্য আদিবাসী মধ্যে শৈব নাথ সম্প্রদায়ের সাধনা, যা যোগসাধনা বলে পরিচিত, তা একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনো নাথপন্থী যুগীদের অস্তিত্ব রয়েছে। এঁদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণ, সাধনপদ্ধতি, ইত্যাদিকে অবলম্বন করে বহু গাল-গল্প, ছড়া-কাহিনি ও আখ্যানকাব্যাদি পাওয়া গেছে। নাথধর্মের অন্যতম গুরু গোরক্ষনাথ ও তার শিষ্যা ময়নামতীকে কেন্দ্র করে বাংলায় যেসব লোকগীতি, আখ্যায়িকাকাব্য পাওয়া গেছে, এগুলিই নাথ সাহিত্য বলে বিদিত। নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া-গান ও আখ্যান গীতিকাগুলি দশম দ্বাদশ শতকে চর্যার সমসাময়িক কালে রচিত হয়েছে বলে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করতেন। কিন্তু বাসার দিক থেকে বিচার করলে রচনাগুলিকে কোনো অবস্থায় সপ্তদশ শতকের থেকে প্রাচীনতর বলে চিহ্নিত করা যায় না। একথা ঠিক যে নাথধর্মের শ্রেষ্ঠগুরু গোরক্ষনাথ সম্ভবত দশম-দ্বাদশ শতকের কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু বাংলায় সংকলিত নাথধর্ম সংক্রান্ত গান ও কাব্যগুলি এর বহু পরবর্তীকালে রংপুরের কৃষক সমাজের গান থেকে সংগৃহীত।

নাথ ধর্মমত বহু প্রাচীন। এঁরা পতঞ্জলির যোগদানের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তন্ত্র ও হঠযোগের কায়া সাধনাই এঁদের সাধনপন্থার ভিত্তি। এঁরা জড়দেহকে মুক্তির বাধা না বলে মুক্তির সোপান বলেই চিহ্নিত করেছেন। এঁরা যোগসাধনার দ্বারা বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বশীভূত করে, পবনবিজয় ও বিন্দুধারণের মাধ্যমে পিণ্ডদেহকে সিদ্ধদেহে পরিণত করেন। তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব অনুসারে এঁরা মস্তিষ্কে সহস্রার পথে শিব-শক্তির মিলনসম্ভূত দিব্যানুভূতি লাভ করে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, তখন পরিণত হয় দিব্যদেহে। সংযম অবলম্বন করলে এই ভূত কায়াতেই সর্বসিদ্ধি সম্ভব— এই তাঁদের বিশ্বাস।

এঁরা যতটা আত্মবাদী, ততটা ঈশ্বরবাদী নন, সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মোক্ষলাভই তাঁদের উদ্দেশ্য। শিব তাঁদের আদিগুরু, তিনিই আদিনাথ। আদিনাথের শিষ্য মীননাথ, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ— সব মিলিয়ে যে নয়জন নাথগুরুর কথা জানা যায়, তাঁরা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দৃষ্টিতে চুরাশি সিদ্ধার সমগ্রোত্রীয়, বৌদ্ধতান্ত্রিকরা এই নাথগুরুর পূজা করে থাকেন, বাংলাদেশে এই নাথ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে কিছু মৌখিক ছড়া ও কাব্যকাহিনি পাওয়া গেছে। আলোচনার সুবিধা জন্য পণ্ডিতেরা নাথ সাহিত্যকে গোরক্ষানাথ বৃত্ত ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্র বৃত্ত এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

গোরক্ষনাথ বৃত্ত ঃ

গোরক্ষনাথকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অসংখ্য গল্প-কাহিনি প্রচলিত। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ সংক্রান্ত গল্প অবলম্বন করে মোট তিনটি কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনটি পুথির সম্পাদক, কবি, প্রকাশকালের তালিকা আমরা লিপিবদ্ধ করছি—

(ক) ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেন রচিত 'মীনচেতন' (১৯১৫),

(খ) মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি শেখ ফয়জুল্লার "গোরক্ষবিজয়" (১৯১৭)ও

(গ) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত কবি ভীমসেনের 'গোর্খবিজয়' (১৯৪১)

এই তিনখানি পুথিই স্বতন্ত্র পুথি কি না, কবিরা সকলেই কবি কি গায়েন— এসব নিয়ে বিতর্ক আছে। পুথিগুলির বিষয়বস্তু এক, ভাষারীতিতেও রূপভেদ বিশেষ নেই, পদগুলিতে যে বহু গায়েনের হাত লেগেছে তাতে কোনো সন্দেহনেই, আব্দুল করিম সাহেবের মতে শেখ ফয়জুল্লাই গোর্খবিজয়-মীনচেতনের রচনাকার, বাকিরা গায়েন মাত্র, অন্যদিকে ডঃ মণ্ডলের অভিমত— শ্যামদাস, ভীমসেন কিংবা ফয়জুল্লা সবাই গীতিকার গায়ক মাত্র; কেউই প্রকৃত অর্থে কাব্যের রচনাকার নন, আসলে কাব্যের গল্পটি লোকমুখের বিভিন্ন গানের মধ্যে ছিল, কবিত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সমস্ত গান পাঁচালিকে একটা সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনির আকার দিয়েছেন।

যোগীশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ কী করে পথভ্রষ্ট আপন গুরুকে নারীদের কবল থেকে উদ্ধার করে কায়াসাধনার মূলস্রোতে নিয়ে এলেন, গোরক্ষবিজয় তারই কাহিনি। আদিনাথ মহাদেব শিষ্যদের নৈতিক মনোবলের পরীক্ষা নিতে গেল গোরক্ষনাথকে বারবার পরীক্ষা করতে গিয়ে পার্বতী নাকাল হলেন। একসময় গুরুর পদস্খলনের খবর পেয়ে গোরক্ষনাথ কদলী রাজ্যে গিয়ে মীননাথকে কীভাবে উদ্ধার করলেন— সেই কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে যোগী সম্প্রদায়ের উল্টাসাধনার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্র বৃত্ত ঃ

উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ছড়া-পাঁচালি ও গানের মধ্যে ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গল্পটি আছে। এই অলৌকিক গল্পমালার যে পুথিগত পরিচয়টি পাওয়া যায়, তা মৌখিক গানের গল্প থেকে পরিণামে একটু আলাদা। বইটির নাম 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। এতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর মাহমুদ প্রমুখ কবিদের ভণিতা পাওয়া যায়। প্রথমে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রিয়ার্সন সাহেব রংপুরের স্থানীয় গায়কদের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামে সম্পাদিত একটি গ্রন্থ এসিয়াটিক তিনজন যুগী ভিখারীর কাছ থেকে প্রকাশ করেন, পরবর্তীতে ১৯০৭-০৮ সালে একই পদ্ধতিতে তিনজন যুগী ভিখারীর কাছ থেকে সমগ্র পালাটি লিখে নেন রংপুরের ম্যাজিস্টেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে এই দুটি প্রচেষ্টা থেকে সাহায্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে "গোপীচন্দ্রের গান" - এর প্রথম খণ্ড এবং ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে মূলত ভবানী দাস ও সুকুর মাহমুদের নামে প্রাপ্ত দুটি পুথির সাহায্য নেওয়া হয়। এই সকল কবিরা যোগীসিদ্ধাদের তত্ত্বকথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাহিনির বিভিন্নতা সাধনতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রাজা গোপীচন্দ্রেকে সন্ন্যাস গ্রহণে মা ময়নামতীর নির্দেশ, গোপীচন্দ্রের অস্বীকার, মায়ের বিরুদ্ধে অসতীত্বের অভিযোগ, হাড়িসিদ্ধাকে বন্দী করা, পরবর্তীকালে হাড়িসিদ্ধার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে রাজ্য ছেড়ে

সন্ন্যাস গমনের শিথিলতা কাহিনিকে কেন্দ্র করে ময়নামতী গোপীচন্দ্রের গল্প গড়ে উঠেছে। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান' এবং সুকুর মাহমুদের "গোপীচাঁদের সন্ন্যাস" বই দুখানি আবিষ্কার ও সম্পদনার ফলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক নাথ সম্প্রদায়ের এই গল্পের পুথিগত রূপটির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন।

২.৪.৩ শাক্ত পদাবলি

গীতিপ্রধান বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বৈষ্ণব পদাবলির অবক্ষয় শুরু হয় সপ্তদশ শতকের উপান্তরে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে কোথাও বা বহুলাংশে বিকৃত কামাচারে পরিণত হয়েছে, সেই সময় সপ্তম-অষ্টাদশ শতকের বাংলার সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এক সন্ধিলগ্নে শাক্ত বিষয়ক গীতিকবিতার জন্ম হয়, যা অদ্যাবধি শাক্ত পদাবলি নামে অভিহিত হয়ে আসছে। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলায় দিশাহারা ও ছিন্নমূল সাধারণ মানুষকে অভয়দান করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিছু কোপনস্বভাব দেবদেবী। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশি বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার পর বাংলাদেশর সমাজ-রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে এক ভয়াবহ ভাঙনের সূত্রপাত হল। দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা ও সর্বব্যাপী হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর বাঙালি, বৈষ্ণবের বাস্তবতাবর্জিত মধুররস এবং অহৈতুকী ভক্তিরস প্রত্যাখানে করল। মঙ্গলকাব্যের খল, নিষ্ঠুর, উগ্র দেবীশক্তি পরিবর্তে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জাতি মাতৃশরণ গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। মানুষ আশ্রয় চাইল এমন এক দেবীর কাছে যিনি একাধারে বিঘ্নবিনাশিনী এবং বাৎসল্য পরায়ণ, স্নেহকাতর। এই মঙ্গলদায়িনী কালিকা সম্পর্কিত পদসাহিত্য শাক্ত পদাবলি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।

অষ্টাদশ শতকের সূচনা থেকেই বিদেশী বণিকের আনাগোনায় ও যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাক্-অষ্টাদশ শতকগুলিতে মুসলমান শাসনের অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাংলার গ্রামজীবন ছিল স্বয়ংনির্ভর, সুরক্ষিত। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলিবার্দী খাঁ প্রজাদের উপর উৎপীড়নমূলক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বর্ধিত করলেন। অনাদায়ে শুরু হল জমিদারি ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম। শাসকদলের এই নৈরাজ্যের দিনে যুক্ত হল বর্গির হাঙ্গামা, মগ ও পতুর্গিজ দস্যুদের হানা, ক্ষমতা দমনের লড়াই ও শাসন-শৈথিল্য, ভূমি থেকে কৃষদের উচ্ছেদ - এসবের মতো নিত্যনৈমিত্ত অভিজ্ঞতা। স্বভাবতই এই দুর্বিষহ অবস্থায়, এই ষড়যন্ত্রের ঘনঘটনার দিনে বাঙালি তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির দোদুল্যমান ভারকেন্দ্রটি স্থানান্তরিত করল আশ্রয়দাত্রী শ্যামামায়ের চরণতলে; যিনি শ্মশানচারিণী অথচ বিশ্বপালিনী, ভ্রুকুটিকুটিলা অথচ ভক্তপ্রসন্না, আর এজন্যই শাক্তকবির কালী জীবনেরই দুর্ভাগ্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিলেন।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস হল রাজশক্তির নিঃসীম নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের আর প্রজাপুঞ্জের মর্মন্তুদ বিলাপের ইতিহাস, রামপ্রসাদ এই বিদ্ধস্ত সময়েরে কবি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন— "অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ

হইতে বাংলাদেশ কার্যত দিল্লী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তার উগ্রতর ও প্রত্যক্ষতর কুশাসনের পাপচক্রে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁ নিজের হাতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যে শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন তাহা নৈকট্যের তীক্ষ্ণতায় ও প্রয়োগের বজ্রকঠোরতায় ভূস্বামীবর্গের ও প্রজাসাধারণের অনেক বেশি অশান্তি ও দুর্গতির কারণ হইয়াছিল।" কবি রামপ্রসাদ এই সময়েরই কবি যাঁর শাক্ত পদাবলি তৎকালীন যুগসন্ধির বিলাপগীতি, অষ্টাদশ শতকের দুঃখের ধারাপাতে শক্তি সঞ্চয়ের শতকিয়া। শাক্ত পদাবলির প্রথম সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলা শাক্ত সাহিত্যের যাত্রা শুরু। এদিক থেকে কবি রামপ্রসাদ বাংলা শাক্ত সাহিত্যের আদিগঙ্গা-ভগীরথ।

আমরা বাংলা শাক্ত পদসাহিত্যের প্রধান দুই কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তর ব্যক্তি পরিচয় ও কবিকৃতির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করতে পারি।

রামপ্রসাদ সেন ঃ

কবি রামপ্রসাদ সেনের ব্যক্তি পরিচয় প্রসঙ্গে জানা যায় হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে (আনুমানিক ১৭২৩-১৭২৫ খ্রিঃ) তাঁর জন্ম হয়। বাঙালির সমাজ-ইতিহাসের সেই মসীলিপ্ত দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রতীকরূপী গীতিসাহিত্যে শূন্যতার অবসান ঘটালেন কবি রামপ্রসাদ। পাঁচালি কীর্তনের ক্লান্ত পুনরাবৃত্তিতে সহসা প্রসাদী সুর নতুন মাত্রা সংযোজন করল, দেবতা ও ভক্তের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে রামপ্রসাদই প্রথম বিশ্ববিধানের নিয়ন্ত্রী শক্তির সঙ্গে লাবণ্যামৃত মাখিয়ে তাঁর রচিত পদাবলিতে প্রথম সন্তানের বাৎসল্যে স্নেহের কারাগারে জগজ্জননীকে বন্দী করলেন। অষ্টাদশ শতকের সেই বিড়ম্বিত সময়ের রুদ্ধবাক সমাজের বেদনার মুহূর্তগুলি রামপ্রসাদের গানে ভাষা পেল।

রামপ্রসাদ তাঁর সমকালে একদিনে অর্থবান ব্যক্তিদের অপরিমিত ব্যয়বিলাস, অন্যদিকে নিরন্ন সাধারণ মানুষের শোচনীয় দারিদ্র্য; একদিকে কেন্দ্রীয় শাসকদের কাছ থেকে কৌশল সংগ্রহীত ভূসম্পত্তির মালিকানা, অন্যদিকে সামান্য কৃষিভূমি হারিয়ে নিম্নবিত্তের অন্য বৃত্তি অন্বেষণ— সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই সামগ্রিক ছবি শিল্পীসুলভ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর পীড়িত হয়েছেন। তাই দেবী কালিকার পদে আত্মনিবেদনের সুর রামপ্রসাদের লেখনীতে গীতিকার আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের কবি প্রতিভাকে লোককবির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর প্রসাদী গানগুলি কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের নিপুণ শব্দচেতনা ও ছন্দ বিলাসিতা রামপ্রসাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না, কিন্তু মোটামুটিভাবে তাঁর রচনারীতির পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতসৃষ্টির এক বিশাল অংশ কালের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতগুলিকে আপাতভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিছু পদ তাত্ত্বিক সাধনক্রম, আচার-নির্দেশ-মন্ত্রসিদ্ধি, রহস্যময় উপাসনা পদ্ধতি, ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। আর

কিছু পদ যথার্থ আবেগমূলক, মাতা ও সন্তানের স্নেহাভিনয়, অনুরাগ-বিরাগ, বাৎসল্য-ব্যাকুলতায় পূর্ণ। অবশ্য আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, ভক্তের আকুতি ইত্যাদি পর্যায়গুলিতেও রামপ্রসাদের সমধিক কৃতিত্ব লক্ষণীয়।

রামপ্রসাদের প্রতিভার চরম স্ফূর্তি আগমনী- বিজয়ার গানে না হলেও সাধারণভাবে ওই পদগুলির গুণগত উৎকর্ষ ও কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। মাতা কন্যার মিলন-বিরহের খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনায় রামপ্রসাদের কিছু পদ অতুলনীয়। বহুদিন পর উমার পিতৃগৃহে আগমন— দীর্ঘ অদর্শনের পর মাতা - কন্যার মিলন মুহূর্তটি বর্ণনায় রামপ্রসাদ কবিত্বশক্তিতে অসাধারণ—

"পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনম তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে।"

রামপ্রসাদে আগমনী বিজয়া সঙ্গীতে আছে মাতৃহৃদয়ের বেদনা এবং তৎকালীন সমাজচিত্র। আর এ সবকিছুর প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত সহজ, সরল, ভাষায়। যেমন 'গিরি এবার আমার উমা এলে' শীর্ষক পদটিতে ধরা পড়েছে কন্যার দুঃখে কাতর মাতার উৎকণ্ঠা; শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবেন না। রামপ্রসাদের ভক্তিসাধনার পদগুলিতে বাংলা গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে কিন্তু কোনো কল্পনাবিলাসের মাধ্যমে নয়, আর তাই এর অঙ্গবিন্যাসে ইন্দ্রিয় চেতনার অভাব ঘটেনি।

রামপ্রসাদ সেন কবি হলেও সাধক রূপেই পরিচিত। রামপ্রসাদের পদে যে যোগসাধনার তন্ত্রসম্মত প্রণালির উল্লেখ আছে, সেখানে রূপকের আবরণ সরিয়ে গোপন অর্থ অনুধাবন করা দুঃসাধ্য নয়। যেমন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও ঔদারিকতার রূপক ব্যবহার করে রামপ্রসাদ সাধনার যে গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা বিশেষ দীক্ষিতের জন্য হলেও অদীক্ষিতেরও আস্বাদ্য —

"এবার কালী তোমায় খাব
খাব খাব গো দীন দয়াময়ী
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব।
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে তরকারি বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বার চড়াব।।

সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটলে শমনের ভয় দূর হয়ে যায়। অনেকগুলি পদেই সেই মৃত্যুভয় বিদূরিত আত্মবিশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে। যেমন —

"তুমি যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি।।
হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি,
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।"

কিন্তু সাধানার গভীর তত্ত্বকেও কাব্যসম্পদ-মণ্ডিত করেছেন কবি রামপ্রসাদ। তাই তিনি সাধক হয়েও কবি, ব্রহ্মের সঙ্গে এক নিবিড় অন্তরঙ্গ বাৎসল্যময় কথোপকথনের ভঙ্গির জন্যই তাঁর পদ এত অন্তরঙ্গ—

"মা বসন পরো বসন পরো বসন পরো তুমি
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি।"

আবার অন্যদিকে জাঁকজমক, সমারোহ, বলি — প্রসাদ, অর্ঘস্তুপ, বিত্তের অহংকারের প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। বাহ্য আড়ম্বর এবং ভোগৈশ্বর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে রামপ্রসাদ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন — "মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে", "অশিববিনাশী কালী সে কি মাটি খড়বিচালি", "মন তোমার এই ভ্রম গেল না," "জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে"— ইত্যাদি পংক্তিতে।

মাতৃ উপাসনার সঙ্গে সহজ সাধনার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন রামপ্রসাদ। যদৃচ্ছা আচার পালনের মধ্যেও অন্তরের অমলিন সহজ ভক্তিই মাতৃচরণে ভক্তকে উপনীত করবে— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই তিনি বলতে পারেন—

"শোন্ রে মন তোরে বলি ভজ কালী
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।"

রামপ্রসাদ ছিলেন সহজিয়া পথের সাধক। তাই তিনি যেমন একদিকে ছিলেন প্রতিষ্ঠান বিরোধী, অন্যদিকে তীর্থ মাহাত্ম্যকেও করেছেন অস্বীকার। নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নির্ভীক উচ্চারণের এক নিরাপদ আশ্রয় তিনি তৈরি করেছিলেন।

রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যভাবনা প্রকাশের জন্য এক বিশেষ কাব্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, চিত্রনির্মাণ এবং বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রামপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন যে তিনি একান্তভাবেই বাংলাদেশের কবি। রামপ্রসাদের পদে বিশুদ্ধ বাগ্‌পদ্ধতির সঙ্গে লৌকিক বাগ্‌ধারার অনায়াস প্রয়োগ, তাঁর কাব্যকে সাধারণের কাছে বিশেষরূপে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। প্রসাদীসুরের বিপুল জনপ্রিয়তাই একথার সাক্ষ্য বহন করে।

রামপ্রসাদ শুধু শাক্ত পদাবলির শ্রেষ্ঠ গীতিকার নন — সব অর্থেই তিনি অষ্টাদশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদ ব্যক্তিগত জীবনে তন্ত্রসাধক ছিলেন, কিন্তু তন্ত্রসাধনা কোনো সময়ই তাঁর রচিত পদগুলির কাব্যত্ব ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাঁর রচিত পদগুলিতে আপাতভাবে কোথাও স্ববিরোধের ছায়াপাত না ঘটলেও তাঁর সঙ্গীতগুলি কিছুটা পরস্পর বিরোধিতায় আক্রান্ত। যেমন শ্যামা মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেও তিনি জীবনের দুঃখময় অভিঘাতে পীড়িত হন— বহু পদে এমন সাক্ষ্য আছে। অর্থাৎ শরণাগতি ও আত্মনিবেদন এবং সংসারজীবনের বৈপরীত্য তাঁর পদগুলিতে এক বিপ্রতীপ সহাবস্থানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই বিরোধ রামপ্রসাদের কবি-ব্যক্তিত্বের নয়, এই বিরোধে শিকড় প্রোথিত যুগের দ্বিধাচ্ছন্নতায়, আর তাই সাধক হয়েও কবি বারবার যুগ-যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন, এখানেই কবি রামপ্রসাদের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা।

কমলাকান্ত ঃ

শাক্ত সাহিত্যে রামপ্রসাদের পরে আরেকজন কবির নাম স্মরণযোগ্য, তিনি সাধক-কবি কমালকান্ত। তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে বহু অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। তবে অলৌকিকতা নয়, তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণিত তথ্যগুলোই এখানে আমাদের অন্বিষ্ট।

কমলাকান্তের সম্পূর্ণ নাম কমলাকান্ত ভট্টচার্য। বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর বর্ধমানরাজের উদ্যোগে জীবনীসহ তাঁর সমস্ত পদগুলো মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর জীবনীকার ছিলেন অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি বহু অনুসন্ধান করেও কবি সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই উদ্ধার করতে পেরেছেন। এই জীবনী ছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' নামের তন্ত্রসাধনাবিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেখানেও তথ্যের অভাব রয়েছে। এই 'সাধকরঞ্জনে'র সমাপ্তির দিকে কবির আত্মপরিচয়টি উল্লেখযোগ্য—

অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ।।
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমাঠ গোপালের স্থান।।
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ।।
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষা পুঞ্জে বিরচিল সাধক রঞ্জন।।

কবির এই ঘোষণা, 'সাধক কমলাকান্ত'র লেখক অতুলচন্দ্রের বিবরণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাধকরঞ্জনে'র মুখবন্ধ থেকে প্রায় দেড়শো বৎসর আগের এই কবি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

কবির আদি নিবাস কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রাম। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম ছিল মহামায়া। তাঁদের দুই সন্তানের মধ্যে কমলাকান্ত বড়ো। অম্বিকা গ্রামের বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় রায়বংশে তাঁর জন্ম। তাঁদের কৌলিক উপাধি ছিল আসলে বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর পিতা এবং তিনি ভট্টাচার্য উপাধি ব্যবহার করতেন। বাল্যকালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, ফলে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি চান্নাগ্রামে আশ্রয়গ্রহণ করতে হয়। এই গ্রামটি বর্ধমান জেলায়। কমলাকান্তের মামার নাম নারায়ণ ভট্টচার্য।

কমলাকান্তের সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক ছিল। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটালহাটে কবির জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়ে দেন। এ ছাড়াও তিনি কমলাকান্তকে সভাপণ্ডিতের গৌরবজনক পদ দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর 'শ্যামাসঙ্গীত' নামক কাব্যে কমলাকান্তের যাবতীয় পদাবলি প্রকাশ করেন।

কমলাকান্তের তিরোধান সম্পর্কেও সঠিক কিছু জানা যায় না, এখানেও অনুমানের আশ্রয় নিচ্ছেন গবেষকগণ। অনেকেই মনে করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে, হয়তো প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কবি কোটালহাটের আশ্রমে দেহত্যাগ করেন।

জীবিতকালেই কবি সাধকরূপে বর্ধমানের চারদিকে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য তিনি স্বগ্রামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কবি প্রধানত বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর শাক্ত পদাবলির জন্য।

ধর্মমতে তিনি কৌলসাধক ছিলেন, কিন্তু মনে হয় প্রথম জীবনে তিনি বৈষ্ণব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর 'সাধকরঞ্জনে'র একাংশে দেখা যায়—

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ।।

তাঁর এমন কিছু পদও পাওয়া গেছে; যেগুলোতে কৃষ্ণ-কালীর অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈষ্ণব মতের প্রভাবেই সম্ভবত তিনি কৃষ্ণ ও কালীকে এক করে দেখেছিলেন। কেবল তত্ত্বের দিক থেকে শ্যাম ও শ্যামার অদ্বৈত উপলব্ধি নল, কবিতার ভাষায় এবং ছন্দ — অলঙ্কারের ব্যবহারেও তাঁর কবিতায় বৈষ্ণব কাব্য-ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। কমলাকান্ত শাক্ত পদাবলিতে রূপানুরাগের প্রবর্তন করেছেন।

কমলাকান্তের ভণিতাযুক্ত শাক্ত পদগুলির মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার পদেই তাঁর কাব্যপ্রতিভা উৎকর্ষের শিখরদেশ স্পর্শ করেছে। দৃশ্যকাব্যের যে আঙ্গিক আগমনী-বিজয়া পদের বৈশিষ্ট্য— তা কমলাকান্তের রচনায় লক্ষগোচর, কন্যাকে মাতার স্বপ্নে দর্শন থেকে শুরু করে বিদায়ের লগ্ন পর্যন্ত কমলাকান্ত রচিত প্রতিটি পদ নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ গীতরসে নিষিক্ত, বাৎসল্যের মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। মাতা মেনকা স্বপ্নে উমাকে দেখে গিরিরাজকে বলছেন —

"আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে!
****
অচেতনে পেয়ে নিধি চেতনে হারালাম গিরি হে।
ধৈরয না ধরে মম জীবনে।"

মেনকার স্বপ্নদর্শন ও স্বপ্নভঙ্গে কন্যা-নিরীক্ষণের গাঢ়তম প্রার্থনা এখানে ভাষারূপ লাভ করেছে। শঙ্কাজর্জর মায়ের ব্যাকুল মন উদাসীন স্বামীর নির্বাক অবস্থায় অনুযোগ করে বলেন —

"কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছে ঘরে;
কী আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।"

পিতৃগৃহে আগমনের পরে বিজয়াতেই আবার কন্যার সঙ্গে বিচ্ছেদ। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় পীড়িত হয়ে মেনকার কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়— "ওরে নবমী নিশি, না হৈও রে অবসান।" কিন্তু কাল কারো জন্য অপেক্ষা করে না; তাই মাতা মেনকার শুধু বিলাপই সম্বল।

আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে বাৎসল্য ও স্নেহ বুভুক্ষার এই অপরূপ লীলা কমলাকান্তের আগমনীর পদগুলিতে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। "জগত জননী তোমার

জননী"— এই লীলাবাদী ভক্তিতত্ত্বের মানবায়নে কমলাকান্তের আগমনী পদগুলি বাংলা শাক্ত সাহিত্যেরে শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হয়েছে।

বস্তুত ব্যক্তি-মানসের সঙ্গে সমাজ-মানসের যে দ্বন্দ্ব, তারই প্রতিরূপ রচনার মধ্যে কবির সার্থকতা নির্ভরশীল। কিন্তু কমলাকান্তের ব্যক্তিজীবনে এরূপ কোনো সঙ্কট না থাকায় অসহায় মানুষের সঙ্কট-চিত্র তাঁর কাব্যে নেই। শাক্ত পদাবলির তাত্ত্বিকতাকে তাই তিনি হৃদয়রসে জারিত করে সর্বজনীনতা দান করতে পারেননি। তাঁর বহু পদে শ্যাম-শ্যামার অদ্বৈত তত্ত্বে বিশ্বাস প্রতিফলিত — কিন্তু এই বিশ্বাস প্রথাগত, হৃদয়জাত নয়। রামপ্রসাদের মতো তীর্থ-মন্দিরকে পরিহার করলেও রামপ্রসাদী ভক্তিনম্রতা ও মাতৃপদ-আকাঙ্খা তাঁর ছিল না — তিনি শেষপর্যন্ত যোগাচারঘটিত সাধনা এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকেই তীর্থের বিকল্পে স্থাপন করেছেন। এই সমস্ত পদে তাঁর সাধকসত্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পী হিসাবে তিনি উচ্চ আসনের দাবিদার, অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি উদ্ধারের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই আলোচনা সমাপ্ত করতে পারি, — "শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ, সুনির্বাচিত শব্দের প্রতি অনুরাগ এবং শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্য কমলাকান্তের এই পদাবলীকে গাঢ়বন্ধ, ভাবগূঢ় গীতিকবিতার সৌন্দর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।"

২.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা

নিরঞ্জনের রুষ্মা ঃ বাংলায় প্রচলিত ধর্মপূজার প্রসঙ্গে ধর্মপূজা বিষয়ক শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদির নানা বিভাগ, উপবিভাগের একটি শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত। এই শূন্যপুরাণের একটি অংশের নাম নিরঞ্জনের রুষ্মা। শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত হলেও এতে নানাজনের হস্তক্ষেপ লক্ষণীয়। ধর্মের গাজনে যে সব ছড়া ব্যবহৃত হত, শূন্যপুরাণে সেগুলি ছাড়াও নানা আনুষঙ্গিক ব্যাপার সংগৃহীত হয়েছে। এই শূন্যপুরাণের অর্বাচীন অংশে নিরঞ্জনের রুষ্মা শীর্ষক কতকগুলি অদ্ভুত ছড়া পাওয়া যায়। এই ছড়া কোনো কোনো ধর্মমঙ্গলেও পুনরুল্লিখিত হয়েছে। স্বধর্মী বা বৌদ্ধদের উপর যাজপুরের বৈদিক ব্রাহ্মণরা অত্যাচার শুরু করলে ধর্মের উপাসকগণ, ধর্ম ঠাকুরের কাছে অত্যাচার নিবারণের প্রার্থনা জানান, তখন ধর্মঠাকুর বৈদিক ব্রাহ্মণদের শাস্তি দিতে এবং ধর্মের উপাসকদের রক্ষার জন্য স্বর্গের দেব-দেবী সহ মুসলমানের ছদ্মবেশে মর্তে অবতীর্ণ হলেন। এঁরা যাজপুরে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদের জেহাদের ধ্বনি দিতে দিতে বৈদিক ব্রাহ্মণদের উচিত শাস্তি দিয়ে স্বধর্মীদের রক্ষা করলেন। এই ছড়াটি কাব্যাদর্শে নিকৃষ্ট হলেও এক যুগের বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এর বিশেষ মূল্য আছে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যরা এক সময়ে বৌদ্ধ সংস্পর্শজনিত ধর্মের দলকে নিগ্রত করতেন। ইতিমধ্যে বাংলায় মুসলমান অভিযান শুরু হওয়ায় হিন্দুর উপর মুসলমানদের অত্যাচার চলতে লাগল। এতে ধর্মের দল মনে করেছিল স্বয়ং ধর্মরাজ ও অন্যান্য দেবদেবী মুসলমানের ছদ্মবেশে হিন্দুদের উৎপীড়ন করছেন এবং স্বধর্মীদের রক্ষা করছেন। নিরঞ্জনের রুষ্মায় হিন্দু, মুসলমান ও ধর্মের দলের পারস্পরিক বিরোধের সম্পর্কটি ঐতিহাসিক স্মৃতিবহতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

মৃগলুব্ধ ঃ মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সংকটের দিনগুলিতে বৌদ্ধরা ক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাশ্রিত বৌদ্ধের দল শিব-ভাবনাতেই আত্মসমর্পণ করাকে সহজ বলে মনে করেছিলেন। ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্তে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোণঠাসা হয়ে পড়া এই শ্রেণির মানুষের রচিত শৈবসাহিত্যে লৌকিক শিব ভাবনা বা তৎসৃষ্ট সাহিত্যগুলি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই এখানে শিবমাহাত্ম্য নিয়ে যে কাব্য রচিত হল, তা আকৃতিতে মঙ্গলকাব্যের মতো কিন্তু প্রকৃতিতে সংস্কৃত মহাভারত, হরিবংশ, দেবী ভাগবত ইত্যাদির প্রভাবে রচিত শিব বিষয়ক কাব্য। এই কাব্য 'মৃগলুব্ধ' বলে পরিচিত। এগুলি বাংলা মঙ্গলকাব্যের আধারে আর্য পুরাণের অনুবাদ মাত্র।

মৃগ ও এক লুব্ধর কাহিনি এই কাব্যের উপজীব্য। শিবভক্ত, রাজা মুচুকুন্দকে নিয়ে শৈবপুরাণে যে কাহিনি প্রচলিত আছে সেই কাহিনি অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীতে আলোচ্য মৃগলুব্ধ কাব্য রচিত হয়েছে। দুজন কবির লিখিত মৃগলুব্ধর দুখানি পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি দুজনের নাম রামরাজা ও রতিদেব। মুন্সী আব্দুল করীম রামরাজাকেই এই কাব্যের প্রাচীনতম কবি বলে উল্লেখ করেছেন। এই কবি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে কাব্যমধ্যে কবির পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এই কাব্যের দ্বিতীয় কবি রতিদেব। রতিদেবের জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত 'সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা'। তাঁর পিতার নাম গোপীনাথ এবং মাতার নাম বসুমতী। ইনি সুপণ্ডিত, কিন্তু রামরাজার তুলনায় কবিত্বশক্তিতে হীন।

চৌতিশা ঃ চৌতিশা হল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরনের পদ রচনারীতি। দেববাদমুখর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলসাহিত্যে এই রীতি প্রায় সব কবিই অনুসরণ করেছেন। মঙ্গলকাব্যে কাহিনির সঙ্গে কোনো না কোনো সূত্রে নিজের ইষ্টকে বন্দনা করা হয়ে থাকে। ইষ্টের এই বন্দনা বা গুণকীর্তন করতে গিয়ে বাংলা বর্ণমালার ৩৪ টি ব্যঞ্জণবর্ণ অবলম্বনপূর্বক এক একটি স্তবক বা পদে এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা দেবতার প্রশস্তি রচনা করা হয়। অনুপ্রাস অলংকারই এই রচনার প্রধান অবলম্বন। এই চৌতিশা একান্তই গতানুগতিক এবং অনুপ্রাস রচনার যান্ত্রিক কৌশল ব্যতীত আর কিছু নয়। কাব্যগুণে এই সকল অংশ অপকৃষ্ট। কাব্যের প্রথানুগ এই অংশটি কবিপ্রতিভার উপর নির্ভরশীল নয়। চৌতিশা কবির বাগবাদন প্রবণতাকে প্রতিপন্ন করে। একটি দৃষ্টান্তে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যেমন—

কালী কপালিনী কান্তা কপোলকুন্তলা।
কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা।।
কলি কালে কালুর কলুষ কর নাশ।
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস।।
খরতর রাজা বড় যেন খুর-ধার।
খড়্গ খর্পরধারী উর একবার।।— ইত্যাদি

এই প্রক্রিয়া শুধু মঙ্গলকাব্যে নয়, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে চৈতন্যের লীলাকীর্তনেও একই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

রামেশ্বরের শিবায়ন ঃ মেদিনীপুরের ঘাটালের অন্তর্গত কর্ণগড়ের কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী আনুমানিক ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর 'শিবসংকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁর পুথিতে কোথাও কাব্যটিকে শিবায়ন বলে উল্লেখ করেননি। মনে হয় রামায়ণ নামের অনুষঙ্গে কাব্যটি শিবায়ন নামে খ্যাত হয়েছে। রামেশ্বরের পিতার নাম লক্ষ্মণ এবং মাতার নাম রূপবতী। কর্ণগড়ের বিদ্যাৎসাহী রাজা যশবন্ত সিংহের অনুপ্রেরণায় কবি 'শিবসংকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। তিনি একখানি সত্যপীরের পাঁচালিও রচনা করেছিলেন। রামেশ্বরের কাব্যের নাম 'শিবসংকীর্তন' হলেও প্রকৃতিতে তা মঙ্গলকাব্য। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এটিও প্রতিদিন দুই পালা হিসাবে আটদিনে ষোলো পালায় ভাগ করে গীত হত। এই কাব্যে শিবের সংসার, মদনভস্ম, শিবের বিবাহ, জাগরণ পালা, স্থাপনা পালা ইত্যাদি এমন অনেক লক্ষণ আছে, যাতে একে মঙ্গলকাব্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

রামেশ্বরের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল। অনুপ্রাস নির্মাণে কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়। তবে তাঁর অনুপ্রাসে শব্দঝংকার যত বেশি কাব্যগুণ তত নেই, যেমন— 'চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর/ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর" ইত্যাদি। কাব্যটির পৌরাণিক অংশ কবির হাতে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু শিবের লৌকিক জীবনচিত্র বর্ণনায় কবি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অংশের চরিত্রসৃষ্টিও বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। শিবের লৌকিক জীবনচিত্র বর্ণনায় শিল্পীর সরস চিত্তটি আত্মপ্রকাশ করেছে। পার্বতীর গৃহস্থালি বর্ণনায় কবিচিত্তের আন্তরিকতার সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে এই সমস্ত চিত্রের যোগ ঘনিষ্ট। আদর্শলোক অপেক্ষা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তবই কবির উপজীব্য, আর তাই এই কাব্য বাঙালি পাঠকের হৃদয়কে সহজে স্পর্শ করেছিল।

মহারাষ্ট্র পুরাণ ঃ পূর্ববঙ্গের কবি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' অষ্টাদশ শতকে লেখা একটি ঐতিহাসিক কাব্য। বলতে গেলে এ কাব্যটিই মধ্যযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক ফসল। মৈমনসিংহের কবি গঙ্গারাম দেব ছিলেন স্থানীয় মুসলমান জমিদারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কার্যোপলক্ষে তাঁকে প্রায়ই মুর্শিদাবাদ যেতে হত। ওই সময়ে মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত বার তিনেক পশ্চিমবঙ্গে দলবল নিতে হামলা করেছিলেন, যা বর্গির হামলা বলে ইতিহাসে সুবিদিত। মহারাষ্ট্র পুরাণ কাব্যগ্রন্থে 'প্রথম কাণ্ড ভাস্কর পরাভব' নাম দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন কবি। মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গারাম প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলির খুঁটিনাটি বিবৃতি সংগ্রহ করেন। এই কাব্যটির রচনা শেষ হয় ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। বইটিতে 'প্রথম খণ্ড' কথাটি থেকে মনে হয় ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পরবর্তী বর্গির অত্যাচার নিয়ে আরেকটি 'কাণ্ড' লেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র পুরাণের অন্য কোনো 'কাণ্ড' পাওয়া যায়নি।

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের ধাঁচেই গঙ্গারাম এই ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছেন। মহাদেবের নির্দেশে মুসলমানদের অত্যাচার দমনের জন্য ভাস্কর পণ্ডিত বাংলাদেশে এসেছেন, এমন একটি বিশ্বাসের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত এই কাব্যে থাকলেও আলৌকিক প্রসঙ্গ এখানে কম এবং মারাঠাদের অত্যাচারও কবি যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট না হলেও মহারাষ্ট্র পুরাণ কাব্যের মধ্যে গঙ্গারাম ঐতিহাসিক কাব্যরচনার ধারাটিকে অঙ্কুরিত করে দিয়েছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই মহারাষ্ট্র পুরাণের বিশেষ মূল্য আছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি বংলার লোকসাহিত্যের এক অসাধারণ সম্পদ। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির আবিষ্কারের কাহিনিটি চমৎকার। মৈমনসিংহ থেকে প্রকাশিত সৌরভ নামে একটি পত্রিকায় জনৈক চন্দ্রকুমার দে কয়েকটি শোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এতে কৌতূহলী হয়ে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চন্দ্রকুমার দের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৈমনসিংহ ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে কতকগুলি লোকগাথা সংগ্রহ করেন। এগুলি প্রকাশের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তর ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে অর্থদান করেন। তখন দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমার ও আরো কয়েকজনকে টাকা দিয়ে পালা সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন এবং এঁদের চেষ্টায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে অনেকগুলি পালা সংগৃহীত হয়। এই সকল পালা পরবর্তীতে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে ও অপর তিনটি খণ্ড "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র এগুলিকে Ballad of Bengal নাম দিয়ে ইংরেজিতেও অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি ব্যালাডধর্মী, উৎকৃষ্ট গীতিকার লক্ষণ এতে রয়েছে। এগুলি আসলে প্রণয়মূলক কাব্য, জমিদারের দলাদলি কিম্বা কোনো কৌতূহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া আকারে বলা দ্রুতগতির কাহিনিকাব্য। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম সকল সমাজ-সংস্কারের অতীত বলেই বড়ো জীবন্ত ও সুন্দর। এই পালাগুলি লোকমুখ থেকে সংগ্রহ ও সম্পাদনার জন্য চন্দ্রকুমার ও দীনেশচন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতী ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পালাগান আজও দারুণ জনপ্রিয়।

(দ্রষ্টব্য ঃ এই টীকাগুলি বর্তমান অধ্যায়ে বিন্যস্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও কালসীমার বিচারে এই পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত)

২.৬ আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমরা যেসব সারকথা পেয়েছি তা এখানে তুলে ধরব।

অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে কৃত্তিবাসের প্রভাব লক্ষণীয়। তবে কবির মৌলিক কল্পনা তাঁর রচনাকে অভিনবত্ব দান করেছে।

মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস। তবে সম্পূর্ণ গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করতে পারেননি, এতে অন্যান্যদেরও সংযোজন আছে। মহাকাব্যের বীররসের সঙ্গে ভক্তিভাবের সহজ মিশ্রণ এতে লক্ষণীয়।

চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনায় এই পর্বের অন্যতম কবি দ্বিজ রামদেব। ধর্মঠাকুরের ভিত্তিতে প্রস্তরোপাসনা, আদিম ও লৌকিক সূর্যোপাসনা থাকলেও ক্রমে তার উপর পৌরাণিক বিষ্ণু ও শিবের ছাপ পড়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও এতে ক্রিয়শীল। যুদ্ধপ্রধান এই কাব্যধারায় বীর রমণীদের ছবি আছে। আদিকবি ময়ূরভট্টের পুথি পাওয়া যায় নি। এই কাব্যের প্রথম শক্তিশালী কবি রূপরাম চক্রবর্তী। সরল বাস্তবতা ও মানবিকতার ছবি তাঁর কাব্যে রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ঘনরাম চক্রবর্তী বেশ শক্তিশালী কবি, নারী চরিত্র চিত্রণে তাঁর দক্ষতা আছে, ভাষায় রয়েছে শিল্পগুণ। এই পর্বে লিখিত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা ভারতচন্দ্র শিল্প-নিপুণতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ব্যবহারে তার প্রমাণ রয়েছে। তিনি ভক্তিতে ব্যাকুল নন, তিনি বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যঙ্গচতুর। যুগরুচির ছাপ তাঁর কাব্যে রয়েছে।

আমাদের আলোচনার সামগ্রিক বক্তব্যের দিকে পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখব যে সপ্তদশ শতকে মুসলমান কবিরা আরাকানের রাজসভার আনুকুল্যে কাব্য রচনা করেন। দৌলত কাজীর সতীময়না উচ্চাঙ্গের কাব্য। চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ আলাওল অনেকগুলি কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রধান কাব্য পদ্মাবতী অনুবাদধর্মী হলেও এতে মৌলিকতার অভাব নেই।

নাথ যোগীদের সাধনা বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বহমান। নাথসাহিত্যে দুটি আখ্যান প্রচলিত। তবে আখ্যান দুটির উদ্দেশ্য ধর্মসাধানার তত্ত্বকথা প্রচার করা। দুটি আখ্যানের মধ্যে ময়নামতী-গোপীচন্দ্র আখ্যানটি সাহিত্যগুণসম্পন্ন।

বৈষ্ণব পদাবলি, নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত, তন্ত্রসাধনা, শিবদুর্গা সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনি— এই সমস্ত কিছুর মিলিত ফসল শাক্ত পদাবলি। শাক্ত পদাবলির প্রধান শ্রেণি দুটি— উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত। শাক্ত পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ। ভাবের আন্তরিকতার সঙ্গে ভাষার সারল্যের মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর হাতে। এই ধারার অন্য উল্লেখযোগ্য কবি কমলাকান্তের আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি রামপ্রসাদের তুলনায় উৎকৃষ্ট।

২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা

অদ্ভুত রামায়ণ : অদ্ভুতাচার্য প্রণীত ৭২ সর্গে বিভক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। এতে রাম-সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ তৎপরে সীতাদেবী কীরূপে কালিকামূর্তি ধরে রাবণকে বধ করেন— সেই সমস্ত অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত।

রঘুবংশ : মহাকবি কালিদাস কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। রামচন্দ্রের পিতামহ রঘুর বংশ বর্ণনা করা হয়েছে এতে। রঘুর পিতা দিলীপ থেকে শুরু করে রামের অধস্তন ২১শ পুরুষের

বর্ণনা এতে প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯ টি সর্গে বিভক্ত ও রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত।

ব্যালাড ঃ পুরোনো কোনো কাহিনি অবলম্বনে রচিত গাথা-সংগীত।

পতঞ্জলির যোগদর্শন ঃ বিখ্যাত যোগশাস্ত্র প্রণেতা ও দার্শনিক পতঞ্জলি কর্তৃক রচিত পাতঞ্জল-দর্শন নামক যোগশাস্ত্র গ্রন্থোক্ত মতবাদই পতঞ্জলির যোগদর্শন নামে পরিচিত।

সুফি ঃ মুসলমানের একটি সম্প্রদায়ের যাঁরা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ হিসাবে উপাসনা করেন।

২.৮ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। শিবায়ন কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা বিচার করুন। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে "রাঢ়ের জাতীয় কাব্য" বলে কেন?

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক ইতিহাসের স্পষ্টত কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। এ মনত কি যুক্তিগ্রাহ্য? মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের জীবনে যে ইতিহাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তাঁদের কাব্যে তার কোনো উল্লেখ ও প্রভাব আছে কি?

৩। ধর্ম দেবতার স্বরূপ নির্ধারণ করে বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করুন।

৪। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য শাখার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যশাখার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করে ধর্মমঙ্গল কাব্যশাখার প্রতিনিধি স্থানীয় একজন কবির কবিকর্মের পরিচয় দিন।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের শ্রেণিবিভাগ করে কোনো একটি ধারার দুজন প্রধান কবির কবিকৃতির আলোচনা করুন।

৬। বাংলা সাহিত্যে শিবের যে লৌকিক রূপটি চিত্রিত হয়েছে পৌরাণিক রূপের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় দুটি মুখ্য শিবায়ন কাব্য অবলম্বনে তা দেখান।

৭। সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যধারার মানবিক আবেদন সবচেয়ে বেশি কেন?

৮। মঙ্গলকাব্যকে কেন 'মঙ্গলকাব্য' বলা হয়? 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা বিশ্লেষণ করুন।

৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রধান বিষয় দেবদেবী মাহাত্ম্য হলেও তাতে বাঙালি সমাজজীবন একেবারে অবহেলিত হয়নি। মন্তব্যটি বিচার করুন।

১০। **টীকা লিখুন ঃ**

ষষ্ঠীবর দত্ত; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ; তন্ত্রবিভূতি; জগজ্জীবন ঘোষাল; বাইশ কবি মনসামঙ্গল বা বাইশা; মাণিক দত্ত; দ্বিজমাধব; দ্বিজ রামদেব; ময়ূরভট্ট; রূপরাম চক্রবর্তী; শ্যামপণ্ডিত; ঘনরাম চক্রবর্তী; মাণিক গাঙ্গলি; মাণিক গাঙ্গুলি; রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, চৌতিশা; রামেশ্বরের শিবায়ন; বারোমাস্যা, মৃগলুব্ধ।

১১। কাশীরাম দাস মূল মহাভারতে অংশ বিশেষের অনুবাদক — এই অভিমতের কারণ নির্দেশ করে তাঁর অনুবাদের বিশেষত্বর দিকটি তুলে ধরুন।

১২। মহাভারতের অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে কাশীরাম দাসের স্থান নির্ণয় করুন।

১৩। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিদের দানে বাংলা সাহিত্য যেভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা ব্যক্ত করুন।

১৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে যুগ জীবনের প্রভাব নির্দেশ করুন।

১৫। নাথ ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ উক্ত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

১৬। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার একটি সাধারণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

১৭। বাউলগান লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিনা, তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

১৮। শাক্ত পদাবলির ইতিহাসে রামপ্রসাদের স্থান নির্ণয় করুন।

১৯। কাকে বাউলাগান বলে? যে কোনো দুজন শ্রেষ্ঠ বাউল সাধকের পরিচয় দিন।

২০। টীকা লিখুন —

দৌলত কাজী; সৈয়দ আলাওল; সাধক কবি কমলাকান্ত; রামপ্রসাদ।

(এখানে অধ্যায় ধৃত বিষয়ের বহির্ভূত এমন দু-একটি প্রশ্ন সংযোজিত হল যা কালসীমার বিচারে এ পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত।)

২.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম-৪র্থ) ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ঃ ক্ষেত্র গুপ্ত

৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ঃ গোপাল হালদার

৪। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার ঃ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ সুকুমার সেন

৬। ইসলামি বাংলা সাহিত্য ঃ তদেব

৭। চৈতন্যাবদান ঃ তদেব

৮। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ঃ তদেব
৯। বঙ্গভূমিকা ঃ তদেব
১০। বাংলা সাহিত্যের কথা ঃ তদেব
১১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
১২। বাংলার লোকসাহিত্য ঃ তদেব
১৩। বাংলার সাহিত্যের বিকাশের ধারা (১ম) ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঃ দীনেশচন্দ্র সেন
১৫। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত
১৬। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৭। কবি ভারতচন্দ্র ঃ তদেব
১৮। নাথ ধর্ম ও সাহিত্য ঃ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী
১৯। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়
২০। বাংলার ইতিহাসের দুশ বছর ঃ তদেব
২১। বাঙ্গালির ইতিহাস ঃ নীহাররঞ্জন রায়
২২। বাংলার ইতিহাস ঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩। সমাজ ও সাহিত্য ঃ বিমলচন্দ্র সিন্‌হা
২৪। বাংলা দেশের ইতিহাস ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
২৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) ঃ ভূদেব চৌধুরী
২৬। বাংলার নাথ সাহিত্য ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়
২৭। বাংলার বাউল ও বাউলগান ঃ উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
২৮। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ঃ কল্যানী মল্লিক
২৯। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি ঃ সুকুমার সেন
৩০। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি ঃ তদেব
৩১। বাংলার সাধনা ঃ ক্ষিতিমোহন সেন
৩২। চিন্ময় বাংলা ঃ তদেব
৩৩। মধ্যযুগের সাধনার ধারা ঃ তদেব
৩৪। চৈতন্য চরিতের উপাদান ঃ বিমানবিহারী মজুমদার
৩৫। বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ঃ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩৬। সাহিত্যসাধক চরিতমালা ঃ সম্পাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭। বাংলা ও বাঙ্গালির বিবর্তন ঃ অতুল শুর

৩৮। *Bengali literature in the Nineteenth Century* : Sushil Kumar Dey

৩৯। *Obscure Religious cults as the background of Literature* : Shashi Bhusan Dasgupta

৪০। *History of Vaishnava Faith and Movement* : Sushil Kumar Dey

৪১। Bengali Literature : J. C. Ghosh

৪২। *An Introduction to Tantric Buddhism* : Shashi Bhusan Dasgupta

* * *

তৃতীয় বিভাগ

চর্যাপদ (কাহ্নপাদ ও ভুসুকুপাদের পদ;
পদসংখ্যা- ৬, ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৯, ২৩, ৪১)

বিষয় বিন্যাস ঃ

৩.০ ভূমিকা (Introduction)
- ৩.০.১ পুথির কথা
- ৩.০.২ পুথির নামসমস্যা
- ৩.০.৩ চর্যাপদের রচনাকাল
- ৩.০.৪ ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গ
  - ৩.০.৪.১ ধর্মতত্ত্ব
  - ৩.০.৪.২ সাধনতত্ত্ব
  - ৩.০.৪.৩ দর্শনতত্ত্ব

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ চর্যাপদের কবি ও কবিত্ব প্রসঙ্গ (কাহ্নপাদ ও ভুসুকুপাদ)
- ৩.২.১ কাহ্নপাদ
  - ৩.২.১.১ একাধিক কাহ্ন প্রসঙ্গ
  - ৩.২.১.২ কাহ্নপাদের পদে রূপক, চিত্রকল্প ও তত্ত্বপ্রয়োগ
  - ৩.২.১.৩ শ্রেণিবিভাগ ও বস্তুবিন্যাস
  - ৩.২.১.৪ রচনাভঙ্গি
- ৩.২.২ ভুসুকুপাদ
  - ৩.২.২.১ জীবনবৃত্ত
  - ৩.২.২.২ ভুসুকুপাদের পদে বস্তুবিন্যাস ও কবিত্ব
  - ৩.২.২.৩ রূপক ও চিত্রকল্প

৩.৩ চর্যাপদে প্রতিফলিত তৎকালীন দেশ-কাল-সমাজের ছবি

৩.৪ চর্যাপদের কাব্যিক উৎকর্ষ ও সাহিত্যিক মূল্য

৩.৫ চর্যাপদের ভাষা
- ১.৫.১ চর্যাগীতির ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য
  - ৩.৫.১.১ ধ্বনিতত্ত্ব
  - ৩.৫.১.২ রূপতত্ত্ব
- ৩.৫.২ সন্ধ্যাভাষা

৩.৬ চর্যাপদের অনুবর্তন বা উত্তরাধিকার

৩.৭ কয়েকটি নির্বাচিত ছত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

৩.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা

৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নবলি

৩.১১ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

বাংলা ভাষার লিখিত রূপের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। উনিশ শতকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে Hodgson সংগৃহীত নেপালি বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় প্রকাশ করার পর গবেষক বাঙালির দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় নেপাল-তিব্বতে রক্ষিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি। তাঁরা অনুমান করেন প্রাচীন বাংলা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির ধর্মজীবনের অনেক দুর্লভ উপকরণ নেপালের নানা স্থানে রক্ষিত আছে। এইসব উপকরণ সংগ্রহের জন্যই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এককভাবে, ১৮৯৮-এ বৌদ্ধ শাস্ত্রবিশারদ অধ্যাপক বেন্ডেলের সঙ্গে এবং ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার এককভাবে নেপাল যাত্রা করেন। তৃতীয়বার, ফেরার সময় তিনি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (চর্যাগীতিকোষ), সরহপাদের অবহটঠে রচিত দোহা, অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে রচিত 'সহজাম্নায়পঞ্জিকা' নামে টীকা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং আচার্যপাদের সংস্কৃতে রচিত 'মেখলা' নামে একটি টীকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, দ্বিতীয়বার নেপাল যাত্রায় সংগৃহীত 'ডাকার্ণব'-এর পুথিটি এবং 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরহের দোহা এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা— এই চারটি বইকে একত্রে নিয়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তিনি 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই চারটি পুথির ভাষা বাংলা বলে তিনি দাবি করলেও পরবর্তীকালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণায় প্রমাণিত হয় একমাত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বাংলা ভাষায় রচিত। বাকি তিনটি গ্রন্থের ভাষা শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের আবিষ্কার নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই গ্রন্থ আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচনই যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, অদ্যাবধি চলে আসা এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডিত ও পরিত্যক্ত হল।

দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষার আদিস্তরের রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রকৃতি চিহ্নিত হল।

তৃতীয়ত বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী কীর্তন-পদাবলি, বাউলগানের সঙ্গে তার আদিতম নিদর্শনের যোগসূত্রটিও খুঁজে পাওয়া গেল।

চতুর্থত প্রাচীন বাংলার জীবনযাত্রা ও অধ্যাত্ম সাধনার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে, শুধু তাই নয়, ধর্মকথার পাশাপাশি তৎকালীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ছবিও এতে আছে। তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আসুন, বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নের এই গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা জেনে নেওয়া যাক।

৩.০.১ পুথির কথা

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থের পুথিটি নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। এটি তালপাতার। পুথির পরিচয় হিসাবে প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় দেবনাগরী

হরফে 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' এই নামটি লেখা আছে। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত, টীকার নাম 'নির্মলগিরা'। টীকাকার মুনিদত্ত সম্ভবত তাঁর আদর্শ পুথি থেকে ৫১টি পদ সংকলন করেছিলেন। কিন্তু আবিষ্কৃত পুথিটি খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়ায় ৪৬টি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে, বাকি পদগুলো লুপ্ত।

৩.০.২ পুথির নাম সমস্যা

চর্যার পুথির প্রকৃত নাম কী ছিল, তা জানা যায়নি। যদিও প্রথম প্রকাশের সময় সম্পাদক বইটির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই নামটি পুথির মূল পদ অথবা সংস্কৃত টীকার মধ্যে নেই। গ্রন্থনাম চিহ্নিত কোনো পুষ্পিকাও পাওয়া যায়নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্ভবত চর্যাগানগুলির প্রকৃতি অনুসারে গ্রন্থনাম দিয়েছেন। 'চর্য্যা' শব্দের অর্থ আচরণীয় এবং 'অচর্য্যা' শব্দের অর্থ— অনাচরণীয়। যে গানগুলির সাহায্য বৌদ্ধ সহজযানী সাধকদের আচরণীয় অনাচরণীয় কৃত্য নির্ণয় করা যায় তাদের সংকলন গ্রন্থের নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' হওয়া অসঙ্গত নয়। সুতরাং সম্পাদক প্রদত্ত গ্রন্থনাম বস্তুত চর্যাগানগুলির প্রকৃতি নির্ধারক, গ্রন্থের প্রকৃত নাম নয়।

বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে, সম্পাদক প্রদত্ত গ্রন্থনাম নির্মলগিরা টীকার একটি ভ্রান্ত পাঠের উপর নির্ভরশীল। গ্রন্থধৃত প্রথম চর্যার টীকার সূচনায় উল্লিখিত, 'আশ্চর্যচর্য্যাচয়' কথাটিই গ্রন্থনামের ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তীকালে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই গ্রন্থের নাম 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চিয়' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এর অর্থ— আশ্চর্য চর্যাসমূহের বিধি ও নিষেধ নির্ণয়। কিন্তু এই ভাবার্থক নামটিকেও চর্যাপদাবলির প্রকৃত নাম হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তেঙ্গুর গ্রন্থ তালিকা থেকে ড. বাগচী চর্যার তিব্বতি অনুবাদ ও তিব্বতি টীকার সন্ধান পেয়েছিলেন। তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে 'বুধগণ' একশো চর্যার 'কোষ' সংকলন করেছিলেন। শিষ্যদের বোধ প্রতিপাদনের জন্য মুনিদত্ত এগুলি থেকে পঞ্চাশটি পদের টীকা রচনা করেন। এই টীকা গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। তাহলে অবশ্যই 'চর্যাগীতিকোষ' চর্যার পদ সংকলনের নাম এবং বৃত্তি হল তার টীকা। শাস্ত্রী প্রাপ্ত পুথিটি হল টীকা সহ ৫০টি চর্যাগানের সংকলন। মূল ও টীকা সহ পুথিটির প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' এবং চর্যাসংকলনের নাম 'চর্যাগীতিকোষ'।

৩.০.৩ চর্যাপদের রচনাকাল

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এগুলির আবিষ্কারকের ধারণা ছিল তাঁর আবিষ্কৃত পুথিটিই মূল পুথি। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এটি চর্যাগীতির সটীক সংকলনের অনুলিপি মাত্র। এর গানগুলি সংকলিত হওয়ার সময় এবং এগুলির প্রথম রচনার সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পুথিতে প্রাপ্ত চর্যার ভাষা প্রথম রচনাকালের সমসাময়িক নয়, হয় টীকা রচনার সমসাময়িক অথবা পুথির লিপিকালের সমসাময়িক। অতএব পুথির ভাষা

বিচারের দ্বারা গানগুলির রচনাকাল নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা যায় না।

চর্যার কবিদের আবির্ভাবকাল বিচার করেও অনেকে চর্যার রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চর্যার কবিদের আবির্ভাব ও জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদির অভাব এ বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। সাধারণভাবে লুইপাদকে আদিসিদ্ধাচার্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন লুইপাদের পরিবর্তে সরহপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সরহপাদ ৮ম শতাব্দীর ব্যক্তি এবং চর্যাগানগুলি ৮ম-১২শ শতাব্দীর রচনা। ড. শহীদুল্লাহ ভুসুকু ও কাহ্নপাদকে ৮ম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত চর্যার আনুমানিক রচনাকাল ৮ম-১২শ শতাব্দী। অন্যদিকে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে, চর্যাপদ রচনার সীমা ১০ম-১২শ শতাব্দী। চর্যার আদিকবি লুইপাদ ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। লুই ও দীপঙ্কর একত্রে 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামে বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। সুতরাং লুইপাদের জীবৎকাল একাদশ শতকের প্রথমার্ধ বলে অনুমিত হয়। এ ছাড়াও কাহ্নপাদ এবং গোরক্ষনাথের আনুমানিক আবির্ভাবের সূত্র ধরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতির রচনাকালের নিম্নসীমা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। আনুমানিক ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে নকল করা পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ রচিত 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা' নামক একটি পুথি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারে রক্ষিত আছে। পুথির লিপিকাল ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ হলে, মূল পুথি নিশ্চয় আরও আগে লিখিত হয়েছে। সেদিক থেকে টীকাকারের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা ১২শ শতকের শেষার্ধ। তিব্বতি ঐতিহ্যে একাধিক কাহ্নপাদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত এবং চর্যাগীতির অন্তরঙ্গ পাঠেও বিভিন্ন গবেষক অন্তত দুজন কাহ্নের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এঁদের মধ্যে একজন নিশ্চয় 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা'-র কাহ্ন। কারণ ৩৬ সংখ্যক চর্যায় কাহ্ন নিজেকে 'পণ্ডিতাচার্য' রূপে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, চর্যাপদে কাহ্ন নিজেকে জালন্ধরিপাদের শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, চর্যাপদে কাহ্ন নিজেকে জালন্ধরিপাদের শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। নাথ সাহিত্যেও দেখা যায় জালন্ধরিপাদ হচ্ছেন গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং তাঁর শিষ্য কানু বা কাহ্নপাদ। গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য নিবৃত্তিনাথের জন্মকালের ভিত্তিতে অনুমান করা চলে গোরক্ষনাথের অপর প্রশিষ্য কাহ্নপাদ দ্বাদশ শতকের শেষপাদে জীবিত ছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে, রচনারীতি, ভাষা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাপাঠিতে চর্যার অন্যান্য কবিরাও কাহ্নের আবির্ভাবের সমসাময়িক। অতএব চর্যার রচনাকালের নিম্নতম সীমা আনুমানিক দ্বাদশ শতক।

অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের সাহায্যেও চর্যার রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, চর্যার ভাষা চতুর্দশ শতকের শেষে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার চেয়ে অন্তত দেড়শো বছরের পুরনো। এদিক থেকেও ১২শ শতকের শেষদিককেই চর্যার রচনাকালের নিম্নসীমা বলে ধরতে হয়। কবিদের সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল ও ভাষালক্ষণ বিচার করে সুনীতিকুমার ৯৫০-১২০০ শতকের মধ্যবর্তী সময়কে চর্যার রচনাকাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আচার্য সুকুমার সেনও চর্যাগানের কয়েকজন কবির আবির্ভাবকালের বিচারে চর্যার রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। অন্যতম চর্যাকার সরহপাদ রচিত অবহট্‌ঠ ভাষার কিছু দোহা তিনটি কোষগ্রন্থে সংকলিত ছিল। ওই কোষগ্রন্থের প্রাচীনতম পুথির পুষ্পিকা থেকে জানা যায় বিনষ্টির সম্ভাবনা দেখে সরহের কিছু দোহা পণ্ডিত শ্রীদিবাকর চন্দ আনুমানিক ১১০১ খ্রিস্টাব্দে যথালব্ধ সংকলন করেন। মূল দোহাগুলি যদি বিনষ্ট হতে পঞ্চাশ বছর সময় লাগে, তবে এগুলির রচনাকাল দাঁড়ায় একাদশ শতকের মাঝামাঝি এবং এক্ষেত্রে সরহের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা দাঁড়ায় একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। 'অভিসময়বিভঙ্গ' রচনা প্রসঙ্গের কিংবদন্তিটির পুনর্বিচার করে ড. সেন লুইপাদকে সরহপাদের অগ্রবর্তী বলে চিহ্নিত করেছেন। তিব্বতি ঐতিহ্য অনুযায়ীও লুই সরহের বয়োজ্যেষ্ঠ। এঁরা দুজনেই চর্যার প্রাচীনতর কবি। এঁদের জীবনকাল একাদশ শতকের প্রথমার্ধের পরে নয়। অন্য প্রধান কবি ভুসুকুপাদেরও জীবৎকালের নিম্নসীমা হিসাবে ১২৯৫ সালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব ড. সেনও চর্যার রচনাকাল হিসাবে দশম থেকে দ্বাদশ শতককেই চিহ্নিত করেছেন।

চর্যাগানে মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের আচরণ-পদ্ধতি ও ধর্মসাধনার লক্ষ্য— উভয় বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও পাল রাজাদের সময় থেকে সেন রাজাদের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ছিল। এই সময়সীমার মধ্যেই গানগুলি রচিত। অর্থাৎ চর্যাপদের রচনাকাল ৮ম থেকে ১২ শতক।

স্বয়ং কবিদের দ্বারা এবং টীকাতেও গানগুলি 'চর্যা' নামে অভিহিত। চর্যা কথাটির সাধারণ অর্থ আচার আচরণ বা কর্মপদ্ধতি। কিন্তু কবি ও টীকাকারের উল্লেখে জানা যায় 'চর্যা' এক বিশেষ ধরনের গায়ন-রীতির নাম। ১২১০-৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' নামক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে 'চর্যা' নামক সংগীত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩শ-শতকে রচিত 'মানসোল্লাসে'-ও চর্যার উল্লেখ আছে। ১২শ ও ১৩শ শতকে রচিত দুটি গ্রন্থে যেহেতু চর্যা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, অতএব নিশ্চয় এরও আগে থেকে বাংলায় চর্যার প্রচলন ছিল। এই অপ্রত্যক্ষ তথ্য থেকেও অনুমিত হয় যে গানগুলি ১২শ শতকের মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

৩.০.৪ ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গ

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মসংগীত, তাই এগুলিতে ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের এক বড়ো ভূমিকা রয়েছে। আমরা এবার চর্যাপদের ধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক দিক এবং এর সাধনপ্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩.০.৪.১ ধর্মতত্ত্ব

চর্যাপদের মূল পটভূমিকা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁর বাণী ও নির্দেশের সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে শুরু হওয়া

মতবিরোধের সূত্র ধরে বৌদ্ধধর্ম মহাযান এবং হীনযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। মহাযানীরা ছিলেন ধর্মাচরণের দিক থেকে উদারপন্থী। শুধু নিজের নয়, সমগ্র জীবের মুক্তিলাভও ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। অর্হত্বলাভ নয়, এঁদের লক্ষ্য ছিল বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভ। বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভই ছিল মহাযানী সাধকদের পরম কাম্য। এই বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করার বিভিন্ন উপায় বা 'নয়' মহাযানী আচার্যরা নির্দেশ করেছেন। প্রথম যুগের আচার্যরা যে ছয়টি 'পারমিতা' বা দানের কথা বলেছিলেন, পরবর্তীকালে এগুলির সঙ্গে আরো চারটি পারমিতা যুক্ত হয়েছিল। আচার্যরা মনে করতেন যে সাধক এই পরম গুণের বা 'পারমিতা'-র অনুশীলনের মাধ্যমে বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু এইসব পারমিতার অনুশীলন ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়াসসাধ্য, তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে পরবর্তী বিধানে বলা হল, মন্ত্রশক্তির প্রয়োগেও এই বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। এইভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত হল— পারমিতানয় এবং মন্ত্রনয়। আর মন্ত্রনয় বা মন্ত্রযানের পথ ধরেই বৌদ্ধধর্মে যে সমস্ত গুহ্য আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তন্ত্রাচার তার মধ্যে প্রধান। তন্ত্রধর্মে বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বালোচনার চেয়ে কার্যকরী আচরণপদ্ধতিই প্রাধান্যলাভ করেছে। এই আচরণপদ্ধতির মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের বিশিষ্ট স্থান ছিল। মন্ত্রযানের প্রথম অবস্থায় তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের প্রাধান্য ছিল, পরে অন্য উপাদানও গৃহীত হয়েছিল। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে তান্ত্রিক যৌনাচার ও যৌগিক কায়াসাধনা পরবর্তীকালে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই তান্ত্রিক আচারের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির যে বিভিন্নতা সূচিত হয়েছিল তা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা 'বজ্রযান' নামে পরিচিত।

বজ্রযানের অন্যতম রূপান্তর সহজযান। তন্ত্রনির্ভর সহজযানী ধর্মতত্ত্বে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক ধারণাগুলি অনেকাংশে তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মহাযানী ধর্মতত্ত্বে বোধিচিত্ত হল শূন্যতা ও করুণার মিলিত অবস্থা। তন্ত্রের প্রভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই শূন্যতা ও করুণা যথাক্রমে নারী ও পুরুষ বা প্রজ্ঞা ও উপায়-তে রূপান্তরিত হল এবং এই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিত অবস্থা বোধিচিত্ত ও তন্ত্রকথিত শিবশক্তির মিলিত অবস্থা যুগনদ্ধের অনুরূপ অদ্বয় রূপে পরিকল্পিত হল। এই বোধিচিত্ত বজ্রযানে বজ্রসত্ত্ব এবং সহজযানে সহজ, সহজানন্দ, মহাসুখ ইত্যাদি। এই মহাসুখ লাভই সহজিয়া সাধকদের পরম লক্ষ্য। তাঁরা এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সমস্ত বাহ্যানুষ্ঠান বর্জন করে একমাত্র দেহকেই অবলম্বন করার নির্দেষ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

চর্যাপদে যে ধর্মসাধনার ইঙ্গিত আছে তা প্রধানত এই সহজযান বৌদ্ধধর্মের। এই সাধনাকে 'সহজ' বলে অভিহিত করার কারণ হল, প্রথমত এই ধর্মসাধনার সাধ্য সহজ, দ্বিতীয়ত সাধনপদ্ধতিও সহজ। সাধনার মাধ্যমে সাধকরা যা পেতে চান তা সহজানন্দ, অন্যদিকে, তাঁদের সাধনপদ্ধতিও বক্র নয়, সহজ। অন্যান্য সাধনায় সহজ দেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি রোধ করে জপতপ শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে মুক্তির সন্ধান করেন সাধকরা এবং দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলি উপেক্ষা করে তাঁরা বক্রপথে বিচরণ করেন। চর্যাপদে অন্যান্য ধর্মের এই বক্রগামিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে।

৩.০.৪.২ সাধনতত্ত্ব

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে ধর্মীয় সাধনপ্রণালিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সহজিয়া সাধকরা তাঁদের ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি দেহের ভিত্তিতে প্রতিপাদন করেছেন। মহাসুখ তাঁদের আস্বাদ্য। প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা ও উপায়রূপিণী করুণার মিশ্রনে এই মহাসুখ উৎপন্ন হয়। এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণার তত্ত্বকে তাঁরা দেহের বিবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর স্থাপন করে মানবদেহকে চারটি চক্র বা পদ্মের অস্তিত্ব কল্পনায় বিভক্ত করেছেন। এই চারটি চক্রের প্রথমটির অবস্থান নাভিতে— নাম নির্মাণচক্র, দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে— নাম ধর্মচক্র, সম্ভোগচক্র নামে তৃতীয় চক্রের অবস্থান কণ্ঠে এবং চতুর্থ চক্র সহজচক্র— মস্তকে অবস্থিত। দেহের তিনটি প্রধান নাড়িকে তাঁরা সাধনার সহায়রূপে গ্রহণ করেছেন। যে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনে সহজানন্দের প্রকাশ, দেহের নাড়িতেই তাঁরা সেই প্রজ্ঞা ও করুণার সাজুয্য খুঁজে পেয়েছেন। বামগা নাড়ি প্রজ্ঞারূপিণী ও দক্ষিণগা নাড়ি করুণারূপিণী। আর এই দুই নাড়ির মধ্যভাগে প্রবাহিত অবধূতিকা— এই নাড়িপদ্মেই অদ্বয় বোধিচিত্তের সাধনা করতে হয়। বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ির নিম্নমুখী স্বাভাবিক ধারাকে যোগবলে রুদ্ধ করে সাধক এই দুই ধারাকে মধ্যমার্গে একত্র করে ঊর্ধ্বগামী করেন, এর ফলে নাভিদেশের নির্মাণচক্রে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। এরপর নির্মাণচক্র থেকে বোধিচিত্তকে ঊর্ধ্বমুখী করে মস্তিষ্কের মহাসুখচক্রে প্রেরণ করলেই বোধিচিত্ত সাধকের কাছে সহজানন্দরূপ হয়ে ধরা দেয়।

চর্যাকারগণ এই সাধনপ্রণালিকে নানা রূপকের আবরণে ব্যক্ত করেছেন। সাধনের অবলম্বন দেহ কোথাও নগরী, কোথাও মায়াজাল, কোথাও রথ, কোথাও বীণা রূপে কল্পিত। দেহচক্রগুলি চর্যায় কতকগুলি পদ্মের রূপকে গৃহীত হয়েছে এবং চক্রস্থিত বোধিচিত্ত যোগিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, মাতঙ্গী প্রভৃতি নানা রমণী রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। নাড়ি তিনটি নদীতট— সাঁকো, চন্দ্র-সূর্য, নৌকা-দাঁড়, ঘণ্টা-নূপুরের রূপকে গৃহীত হয়েছে।

৩.০.৪.৩ দর্শনতত্ত্ব

চর্যাপদে তত্ত্ব অপেক্ষা আচরণের দিকটিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। চর্যার কবিরা সকলেই ছিলেন সাধক এবং সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সাধনালব্ধ উপলব্ধির প্রকাশই ছিল তাঁদের গান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এইসব প্রক্রিয়া ও উপলব্ধিগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলির মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার বিশেষ কতকগুলি দার্শনিক অভিপ্রায় ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। দর্শনতত্ত্ব এখানে কেন্দ্রীয় নয়, তা এখানে পটভূমিস্বরূপ বর্তমান। চর্যাগীতির এই দার্শনিক পটভূমি মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়ে গঠিত এবং এইসব মতবাদের মধ্যে নাগার্জুনপাদের শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদের কথা বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। এই দার্শনিক মতগুলির মধ্যে সিদ্ধান্তগত কিছু পার্থক্য থাকলেও এখানে দর্শন পটভূমির কাজ করায় সিদ্ধান্তগত পার্থক্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট— দুইভাবেই সংলগ্ন অথবা পৃথকভাবে এক অনতিস্পষ্ট আবেষ্টনের কাজ করেছে। এই তাত্ত্বিক অস্পষ্টতার জন্য চর্যাকারগণ অনেক সময় নিজেদের সাম্প্রদায়িক

ধর্ম-দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে হিন্দু ব্রহ্মবাদী দার্শনিক সিদ্ধান্তকে স্পর্শ করেছেন। অবশ্যে এই সম্প্রসারণশীল শিথিলতার জন্য চর্যার সমকালীন যুগপ্রভাবও অনেকাংশে দায়ি। পাল যুগে বাঙালি সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সহজ সমন্বয়-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তারই সুযোগে হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারাতেও সমন্বয় ঘটেছিল। চর্যাতেও এই সামঞ্জস্যের পরিচয় আছে। তবে অন্তরঙ্গ বিচারে চর্যাগীতির দর্শনতত্ত্বকে নিঃশেষে হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো একটির ধর্ম-দর্শনের নামে চিহ্নিত করা যায় না। চর্যার গানগুলি সম্ভবত চিত্ত-প্রধান মায়াবাদী দর্শনেরই অন্তর্গত।

আমরা চর্যাপদের সাধারণ আলোচনা বা প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব এখানেই শেষ করছি। এরপর চর্যার সমাজ-পরিবেশ, সাহিত্যমূল্য, কবিপ্রসঙ্গ এবং চর্যার অনুবৃত্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি আমরা একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চর্যাপদের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু। চর্যাপদের সমকালীন সময়কাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনযুগ নামে চিহ্নিত। চর্যাপদই প্রাচীনযুগ বা আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন। চর্যাপদ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ। আমরা এই উপবিভাগে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের সঙ্গে পরিচিত হব। যে বিশিষ্ট ধর্ম-দর্শন চর্যার পটভূমি নির্মাণ করেছে আমরা এখানে তার পরিচয়টুকুও গ্রহণ করব। চর্যার কবি ও কবিত্ব প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলা সাহিত্যের উন্মেষলগ্নে বাংলা ও বাঙালির দেশকাল-সমাজের প্রসঙ্গটি আমরা চর্যাগানগুলির নিরিখে বিচার করব; নির্ণয় করব পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের অনুবর্তন। প্রথম যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব প্রসঙ্গটিও আমরা আলোচনা করব।

৩.২ চর্যাপদের কবি ও কবিত্ব প্রসঙ্গ (কাহ্নপাদ ও ভুসুকুপাদ)

চর্যা গানের যে খণ্ডিত পুথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন, তাতে ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ পদ আছে, একটি পদ খণ্ডিত। এই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের মধ্যে ২৮টিতে স্পষ্ট ভণিতা পাওয়া যায়। ১৮টি পদে ভণিতার উল্লেখ নেই। তবে টীকাকার বা পুথির লিপিকর প্রত্যেক কবির নাম উল্লেখ করেছেন। মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যে ভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে চর্যাপদের রচয়িতা হিসাবে মোট ২৩জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। রচিত গীতের সংখ্যা সহ কবিদের নাম—

লুই—১, ২৯; কুক্কুরীপা—২, ২০, ৪৮ (লুপ্ত); বিরুআ—৩; গুডরী—৪, চাটিল—৫; ভুসুকু—৬, ২১, ২৩ (অসম্পূর্ণ), ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯; কাহ্ন—৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪ (লুপ্ত), ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫; কামলি—৮; ডোম্বীপাদ—১৪; শান্তি—১৫, ২৬; মহিণ্ডা—১৬; বীণাপাদ—১৭; শবরপাদ—২৮, ৫০; আজদেব—৩১; ঢেণ্ঢণপা—৩৩; দারিক—৩৪; ভাদে—৩৫; তাড়ক—৩৭; সরহ—২২, ৩২, ৩৮, ৩৯; কঙ্কণ—৪৪; তন্ত্রী—২৫ (লুপ্ত); জয়নন্দি—৪৬; ধাম—৪৭।

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে জানা যায় কাহ্ন বা কাহ্নুপাদই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদের রচয়িতা (২৪ সংখ্যক লুপ্ত পদটিকে নিয়ে মোট ১৩ টি)। পদের সংখ্যাধিক্যে ভুসুকুপাদের স্থান কাহ্নপাদের ঠিক পরেই। ২৩ সংখ্যক অসম্পূর্ণ পদটিকে নিয়ে ভুসুকুর রচিত পদসংখ্যা মোট ৮টি। বিষয়বস্তু ও তত্ত্বপ্রচারের মানদণ্ডে, সংখ্যাধিক্যের বিচারে চর্যার ২৩ জন কবির মধ্যে কাহ্ন ও ভুসুকুপাদই সর্বাধিক প্রচারিত ও বহুল আলোচিত। আমাদের পাঠক্রমেও কেবলমাত্র এই দুই পদকর্তার পদই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই পাঠ্যতালিকার দিকে নজর রেখে আমরা চর্যার এই দুই কবির ব্যক্তি পরিচয় এবং তাঁদের রচিত পদগুলির রূপকতত্ত্ব, রচনাভঙ্গি, বস্তুবিন্যাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৩.২.১ কাহ্নপাদ

বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে কয়জন সিদ্ধাচার্য কবি, কাহ্নপা তাঁদের অন্যতম। চর্যার ৫০টি কবিতার মধ্যে কাহ্নপার রচনাই সবচেয়ে বেশি, সংখ্যায় ১৩ টি। বাঙালির আদিকবিদের কুলতিলক কাহ্নপার জীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।

৩.২.১.১ একাধিক কাহ্ন প্রসঙ্গ

কাহ্নপাদের নামে একটি দোহাকোষও চর্যার গ্রন্থের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অপভ্রংশ ভাষার এই দোহাকোষ ও চর্যার বাংলা পদগুলি একই কবির লেখা কি না, অর্থাৎ কাহ্নপা একক ব্যক্তিত্ব কি না এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদও তৈরি হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নামের অন্তরালে একাধিক কবির অস্তিত্ব বার বার জট পাকিয়েছে। বোধ করি কাহ্নপা বা কৃষ্ণাচার্যপাই প্রথম বাঙালি কবি যাঁর একক অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চর্যার গ্রন্থে কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নিল ইত্যাদি নানা নাম পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেন টীকাকারদের আলোচনা থেকে একই কবিব্যক্তিত্বের কয়েকটি নাম পেয়েছেন ঃ কৃষ্ণচার্যপাদ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্যচরণ, কৃষ্ণচার্য সুন্দর, কৃষ্ণবজ্রপা ইত্যাদি। তেঙ্গুর গ্রন্থ তালিকায় কৃষ্ণ, কাহ্নপাদ, কৃষ্ণবজ্র, কৃষ্ণপাদ প্রমুখের নামে যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায় তা থেকে অন্তত দুজন কৃষ্ণাচার্যের কথা মনে হয়। প্রথম জন জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য, ইনি সম্ভবত ওড়িশার অধিবাসী ছিলেন এবং অনেকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের অনুবাদ ও টীকা রচনা করেছেন। নাথ ধর্মের প্রধান আচার্য জালন্ধরি পার শিষ্য ছিলেন এই কৃষ্ণাচার্য। সুম্পার 'পাগ্-সাম-জোন-ডাঙ' গ্রন্থে মহাযোগী কৃষ্ণবজ্রের কথা আছে। ইনি কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য।

রাজশাহির সোমপুরি বিহারে বাস করতেন, এমন আরেকজন কাহ্নপাদের কথা জানা যায়। তিব্বতি ইতিহাসে বিদ্যানগর বা পাণ্ড্যনগর অঞ্চলে কাহ্নপার অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। আনুমানিক ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা হেবজ্রপঞ্জিকার যে পুথিটি কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে তারও লেখক হচ্ছেন পণ্ডিতাচার্য কৃষ্ণপাদ। যাই হোক কৃষ্ণাচার্যের নামে ৫৭টি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। দোহাকোষ ও চর্যার গানগুলির কথা ছেড়ে দিলেও কাহ্নপা ও গীতিকা নামে আরেকটি পদাবলি সংকীর্তন পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় আর্যভাষার অপভ্রংশ ও প্রত্নবঙ্গ স্তরে কাহ্নপার নামে এক বিরাট সৃষ্টিসম্ভার পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখক কাহ্নপা ও চর্যার কবি যে এক ব্যক্তি নন, মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছান যাচ্ছে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির অধিকাংশই শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা আর চর্যার পদগুলি মাগধী অপভ্রংশজাত প্রত্ন বাংলা। একই ব্যক্তি শৌরসেনী ও মাগধীতে লিখতে পারেন কি না (মহাকবি কালিদাসের কথা অন্য, তিনি নাটকের প্রয়োজনে নানা ভাষা ব্যবহার করেছেন) এই বিতর্ক এড়িয়ে আমাদের আলোচনা চর্যাপদের সীমায় নিয়ে আসা যাক। চর্যাপদের কাহ্নপা-রং একক অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন তুলেছেন আচার্য সুকুমার সেন। কাহ্নপার লেখা চর্যার গানগুলির বিশ্লেষণ করে সুকুমার সেন অন্তত দুজন কবির অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। সচেতনভাবেই ড. সেন তাঁর বক্তব্য কেবল অনুমানের স্তরেই রেখেছেন, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি। তাঁর মতো পণ্ডিতের এহেন অনুমান পরবর্তীকালের পাঠকের সামনে একটি অমীমাংসিত জটিল প্রশ্ন রূপে হাজির হয়েছে।

৩.২.১.২ কাহ্নপাদের পদে রূপক, চিত্রকল্প ও তত্ত্বপ্রয়োগ

কাহ্ন কয়জন ছিলেন, সবগুলি পদ একই কবির রচনা কি না এই বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়েও বলা যায় চারপাশের জগৎ থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে, চিত্রধর্মী কবিতায় বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কাহ্নপার সাফল্য প্রশ্নাতীত। সকলেই জানেন, বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গূঢ় সাধন প্রকরণের নানা নির্দেশ-উপদেশে চর্যার ধর্মসংগীতগুলি আকীর্ণ। ধর্মসংগীতকে, দেহমূলক সাধনার প্রাকরণিক নির্দেশকে, কাহ্নপা রসাত্মক কাব্য করে তুলেছেন।

জগৎ, জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকরণ নিয়ে কবিতার জগৎ গড়ে তুলেছেন কাহ্ন। যে সব বস্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের পক্ষে উপযোগী, সেগুলিকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন চর্যার কবিরা, কাহ্নও এর ব্যতিক্রম নন। মাটি-গাছ-ডাল-ফুল-ফল-আকাশ-নদী-জল-নৌকা-দাঁড়-থালা-বাটি-কুঠার, শবর-শবরী-ডোম্বী, মুষিক-সোনা-রুপা-কাপালিক-ব্রাহ্মণ— এ সমস্তই একটা আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর উপমা হিসাবে গ্রহণ করেছেন কাহ্ন।

কাহ্নপার নামে প্রাপ্ত প্রথম পদটিতে দেখি, ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি দিয়ে প্রবাহিত বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি যে কেবলই সাধনাসিদ্ধির পক্ষে বাধা, তাকে কবি প্রকাশ করেছেন আলি-কালি দ্বারা পথরোধের রূপকে। কাহ্ন অবিদ্যার বাধায় জীনপুরে পৌঁছতে পারছেন

না, এজন্য খেদ প্রকাশ করেছেন। কাহ্ন ছিলেন কাপালিক, শ্মশানবিলাসী। তাঁর কবিতায় সব বন্ধন ছিঁড়ে আসবমত্ত হয়ে নলিনীবনে প্রবেশের চিত্র আছে—

"এবংকার দৃঢ় বাখোর মোড্ডিউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।।
কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা।।" (৯)

নিবৃত্তি বা নির্বাণ সম্ভব সহজের উপলব্ধি হলে, তাই মত্ত হাতির মতো সব বাঁধন ছিঁড়ে যেতে হবে, জ্ঞানাসব পানে উন্মত্ত মানব পরম সিদ্ধিতে পৌঁছায় সহজের উপলব্ধিতে, একথা বলা হয়েছে ৯ সংখ্যক চর্যায়।

কাহ্নর কবিতায় যে ডোম্বীর পরিচয় পাই, যার সঙ্গে কোনো কোনো কবিতায় কাহ্নর রসগত সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে, সে কি কাপালিক কাহ্নর সাধনসঙ্গিনী? এই বাস্তব পরিচয়ের বাইরেও, ডোম্বী কবিতায় রূপক হিসাবেই ব্যবহৃত। তন্ত্রে যে পরাশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা বলা হয়েছে, সহজিয়ারা তাকে চক্রভেদে কখনও ডোম্বী, কখনও চণ্ডালী কখনও শবরী আবার কখনও সহজসুন্দরী বলেছেন। ডোম্বী একজন স্বভাবচঞ্চল মেয়ে, অবিদ্যার বৃত্ত থেকে যে বেরিতে আসতে পারে না। নিজের গণ্ডিতে সে নাচে, গায়, অন্যকে বিভ্রান্ত করে। আবার সে-ই জ্ঞানহরিণী, সাধকের সে কামনার ধন, সাধকের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক। তন্ত্রে, বিশেষত কাপালিকের সাধনায়, শিবশক্তির যৌন সম্পর্কের যে বিশেষ তাৎপর্য আছে, কাহ্নর কবিতায় সে উপমা আছে। এই জ্ঞানের জন্য সাধক উন্মত্ত হন, সব বন্ধন ছিন্ন করেন। ১০ সংখ্যক কবিতায় দেখি অবিদ্যামোহিত যে জগৎ তার বাইরে জ্ঞানরূপিণী ডোম্বীর অবস্থান— 'নগর বাহিরেঁ ডোম্বী, তোহোরি কুড়িআ'। (১০) এই ডোম্বীর জন্যই সাধক কাহ্ন নটসজ্জা ছেড়ে হাড়ের মালা পরে কাপালিক হয়েছেন।

ত্রিশরণ নৌকার উপমা আছে ১৩ সংখ্যক চর্যায়। সেখানে কবির বক্তব্য, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ— এই ত্রিশরণ হল নৌকা, তাতে আটটি কামরা, অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি আটটি বুদ্ধৈশ্বর্য; নিজের দেহ বোধিচিত্ত, অন্তঃপুরে মহাসুখ। এই ত্রিশরণ নৌকায় কাহ্নপাদ ভব-জলধি অতিক্রম করেছেন এবং মহাসুখের তরঙ্গকে তাঁর মনে তন্ময়ভাবে অনুভব করেছেন। নিজেকে সম্বোধন করে কাহ্ন বলেন, মায়াজাল এড়িয়ে কায়ানৌকা বেয়ে যাও। পঞ্চতথাগত ও পঞ্চজ্ঞানকে তোমার ক্ষেপণি করে বিষয় সমুদ্র বেয়ে চল। গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়গুলি যেমন আছে তেমনি থাক। নিদ্রাবিহীন স্বপ্নের মতো তারা এখন অলীক। শূন্যতারূপ নৌকাপথে চিত্তরূপ কর্মধারাকে আরোপ করে, কবি মহাসুখসঙ্গমে চলেছেন। উপমা প্রয়োগ চাতুর্যে অসাধারণ একটি কবিতায় দাবা খেলাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন কাহ্ন। চিত্তের সমস্ত দোষ দূর করে স্বরূপে অবস্থিত করুণাময় চিত্তকে পীঠ করে যেন চতুর্থানন্দবল (অর্থাৎ বাক্-কায়-চিত্ত— এই ত্রিবলের অতীত যা) রূপ দাবা খেলা হচ্ছে। গুরুর উপদেশে অবিরত আনন্দযোগ খেলা করার ফলে ভববল অক্লেশে জেতা যায়। কীভাবে এই জয় সম্ভব হয়? না, প্রথমে লোকজ্ঞান ও লোকাভাস এই দুই অভ্যাসকে নাশ করা হল। এখানে এরা হল বোড়ে বা সেনা আর ঠাকুর হলেন রাজা। এই

ঠাকুর অবিদ্যামোহিত চিত্তেরই প্রতীক। রাজাকে মারার পরই সাধক কবি দেখলেন জীনপুর খুব কাছে। এই খেলায় বোড়েরা হল নানা প্রকৃতিদোষের রূপক, দাবার মন্ত্রী হচ্ছে প্রজ্ঞা, গজগুলো নির্বাণ আরোপিত চিত্ত।

৩.২.১.৩ শ্রেণিবিভাগ ও বস্তুবিন্যাস

সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে কাহ্নপাদের কতকগুলো গানে জ্ঞান উপদেশের প্রবলতা আর কতকগুলোতে ডোম্বী-বিবাহের সন্ধ্যা-সংকেত অর্থাৎ সাধন প্রকরণের কথা। অন্তরঙ্গ বিচারে চর্যার পদগুলি এই দুটি স্তরে ভাগ করলে একভাগে পড়বে ৭।৯।১০।১১।১২।১৩।১৮।১৯ সংখ্যক চর্যা। যোগ সংকেতের প্রাবল্য এই সমস্ত চর্যায় লক্ষ করা যায়। ৭ সংখ্যক পদে দেখা যাচ্ছে আলি-কালি অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকাভ্যাসের দ্বারা নির্বাণলাভের রাস্তা বন্ধ ছিল, গুরুর আশীর্বাদে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে অবিদ্যার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন কবি। এখন তাই তিনি জীনপুর বা মহাসুখপুরের খুব কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন। ৯ সংখ্যক পদে দেখি কবি কাহ্ন নিজেকে মত্তহস্তী ও নৈরাত্মামুনিকে হস্তিনী রূপে উপমিত করে মহাসুখ স্বরূপ সহজ নলিনীবনে নায়িকার সনে নির্বিকল্প ক্রীড়ায় মগ্ন। এই পদে নারী-পুরুষের শরীর-বিলাসের যে ইমেজ লক্ষ করি, এই ইমেজ কবি কাহ্নর একটি প্রিয় রূপকল্প। নৈরাত্মা দেবীকে ডোম্বী আখ্যায়িত করে তার সঙ্গে যৌথ সাধনের প্রসঙ্গ কাহ্নপাদের লেখায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। ১০ সংখ্যক চর্যায় ডোম্বী-মিলনের জন্য কাহ্ন ঘৃণা, লজ্জা ত্যাগ করে কাপালিক হয়েছেন। তাঁর কবিতার ডোম্বী যে লোকজগতের ডোম্বী নন, তার প্রমাণ এই চর্যাতেই আছে ঃ

"তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেড়া।" (১০)

এই ডোম্বী সাধারণ নারী নয়, ইন্দ্রিয়জগতের বাইরে (নগর বাহিরেঁ) তার অবস্থান। সে তাঁত বোনে না কিংবা চাঙ্গারি তৈরি করে না। এই ডোম্বী মূলাধার চক্রে জাগ্রত তন্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনী। সুষুম্না মার্গ দিয়ে সাধক তাকে ঊর্ধ্বমুখে সহস্রারে প্রেরণ করলেই নির্বাণ বা মহাসুখ লাভ করেন, ইনি নৈরাত্মামুনি। লোকাভ্যাসকে মহাসুখরূপ অগ্নিতে দগ্ধ করে মায়ারূপ অবিদ্যাকে ধ্বংস করে ১১ সংখ্যক চর্যার কবি হয়েছেন উদাসী কাপালিক। রিপুর বশ তিনি নন, রিপুকে তিনি চরণের নূপুর করেছেন। এই শক্তিমান সাধক দাবা খেলার উপমায় ১২ সংখ্যক চর্যায় জানিয়েছেন বাইরের সব আসক্তি পরিহার করে সিদ্ধির জীনপুরে পৌঁছাতে তিনি নির্বাণচক্র রূপ ৬৪ কোঠায় মন স্থির করেছেন। মহাসুখ সঙ্গমের উদ্দেশ্যে অভিসারী হয়েছেন সাধক কাহ্ন। ১৩ সংখ্যক পদে নারী পুরুষ রমণের ইঙ্গিতে সহজিয়া সাধনার লক্ষ্যস্বরূপ মহাসুখকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮ ও ১৯ সংখ্যক পদে ডোম্বী মিলনের রূপকে নৈরাত্ম সাধনাকেই ধরে দিয়েছেন কাহ্নপা। কাহ্নের নামে প্রাপ্ত কয়েকটি পদে (২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ সংখ্যক) জ্ঞান ও উপদেশের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। ৪২ সংখ্যক পদে কাহ্ন স্পষ্টতই উপদেশ দিয়েছেন দুধের মধ্যে যেমন স্নেহপদার্থ প্রচ্ছন্ন, তেমনি অভাবের মধ্যেই ভাব লুকানো। শুধু তাই নয়—

"ভব জাই ণ আবই এসু কোই।"

অর্থাৎ, পৃথিবীতে কিছু আসেও না, যায়ও না। সব কিছুই আমাদের মোহ ও ভ্রান্তি। এই সহজ অনুভূতি বা শূন্যতার উপলব্ধিই মুক্তির উপায়। ৪৫ সংখ্যক চর্যায় স্পষ্টতই বলেছেন— অবিদ্যার, মনোবিকারের তরুকে গুরুর উপদেশ রূপ কুঠারে এমনভাবে ছেদন করো, যাতে তার মূল বা ডাল কিছুই না থাকে। গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে মনের বিকারগুলিকে বারণ করে শূন্যতার পরম উপলব্ধিতে পৌছানোর কথাটি বলা হয়েছে ৪০ সংখ্যক চর্যায়, যা চরম উপলব্ধি, তা অনুভবের জিনিস, ভাষা দিয়ে ধরা যায় না। এই বাক্-পথাতীত উপলব্ধিতে পৌঁছাতে হবে। পৌঁছালেই পরম মুক্তি সম্ভব। গুরু জালন্ধরিপাকে সাক্ষী রেখে কাহ্নপা ৩৬ সংখ্যক পদে যে স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন তাতে মোহপাশ ছিন্ন করার কথাই আছে। যখন আত্মপর বিভেদ ভুলে কাহ্নপাদের নগ্ন মন নিদ্রালু হয় তখন দেখা যায় ত্রিভুবন শূন্য, এতে যাওয়া নেই আসা নেই। লক্ষ করা যেতে পারে এই সমস্ত পদে ডোম্বী বিবাহ কিংবা অন্য কোনো পদে সাধন পদ্ধতি কিংবা মহাসুখ লাভের কথা বলা হচ্ছে না। সরাসরি বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের শূন্যতার তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, এই সমস্ত পদে কাহ্নপা আর কোনো ডোম্বীর প্রেমিক কাপালিক নন। যেমনটি দেখেছি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচ্য কবিতাগুলিতে।

অতএব প্রথম গোত্রের চিত্রধর্মী পদগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিকতা নির্ভর পদগুলির ভাগবত পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের পদগুলি প্রকরণের, উত্তরণের উপায়ের আর দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলি উত্তীর্ণ দার্শনিকের অনুভব। প্রথম পর্বে অধীরতা, দ্বিতীয় পর্বে সহজ সুখের ঘোষণা। ড. সেনের ভাবনাসূত্র বোধ করি এভাবেই কাহ্নপাদের একক অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে উঠেছে।

অবশ্য সুকুমার সেনের শ্রেণিবিভাগ অন্যরকম। তিনি মনে করেন ১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬ ও ৪২ সংখ্যক চর্যা নাথ গুরু জালন্ধরিপার তান্ত্রিক শিষ্য যোগীপ্রবর কাহ্নের রচনা ইনি সম্ভবত কাপালিক, তাঁর অঙ্গে হাড়ের মালা ও হাতে ডমরু। আর ৭, ৯, ১২, ১৩, ৪০, ৪৫ সংখ্যক পদগুলি অপর এক কাহ্নের রচনা। কিন্তু এই শ্রেণিবিভাগ মেনে নেওয়া সহজসাধ্য নয়। যখন দেখি উভয় শ্রেণির ভিতর ভাবগত ও ভাষাগত মিলও প্রচুর। ১০ সংখ্যক পদে যিনি চৌষট্টি দল পদে নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন তিনিই ১২ সংখ্যক পদে চৌষট্টি কোঠা গুনে দাবার চাল চালেন। উভয় শ্রেণির পদে মহাসুখ, সাঙ্গা, নারী পুরুষ সঙ্গমের রূপক রয়েছে। ৯ সংখ্যক পদের অদ্বয় অনুভব ৩৬ ও ৪২ সংখ্যক গান থেকে খুব দূরবর্তী নয়। সহজ উন্মত্ত যে কাহ্ন ১৯ সংখ্যক পদে ডোম্বীর সঙ্গে অপূর্ব রসগত সম্বন্ধে আবদ্ধ তিনিই ৯ সংখ্যক পদে সহজ নলিনীবনের রমণ বিলাসে ডোম্বীকে গজেন্দ্রাণীর রূপ দেন।

আর 'সুন তরুবর গঅন কুঠার' (৪৫) এই দুই উক্তিতে পার্থক্যও বিশেষ নেই। যাই হোক শব্দের মিল না খুঁজে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি, একাধিক কাহ্নপার অস্তিত্ব চর্যার পাঠকের অস্বীকার করার মতো যুক্তিও নেই। ড. সুকুমার সেন একরকম করে শ্রেণি বিভাগ করেছেন। আমরা যে ভাবে ভাগ করতে চাই সেটাও আলোচনায় দেখানো হয়েছে। একজন কাহ্নপা বোধকরি কাপালিক মতের তান্ত্রিক, এজন্য ডোম্বী বিবাহ ইত্যাদির অনুষঙ্গে সহজিয়া সাধনার তান্ত্রিক প্রকরণের উপরই জোর দিয়েছেন। অপরজন সহজিয়া দার্শনিক।

ইনি বাক্‌পথাতীত সহজানন্দের পরম অনুভবকে নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় অথচ সহজভাবে বলে গেছেন। একজনের পদে পাই (৭ থেকে ১৯) ব্যক্তিগত সংরাগের ছোঁয়া, ছোটো ছোটো নাট্যধর্মী চিত্রের উপস্থাপন, খানিকটা তির্যক জীবন সমালোচনা, অন্যজন (৩৬ থেকে ৪৫) যেন গুরুর ভূমিকায় সংযতবাক্ দার্শনিক। এই দুই গুণ ও প্রবণতা এক ব্যক্তিতে সংহত হতে পারে না এমন কথাও বলা যায় না। যদি তাও হয় তবুও বলতে হয়, এক ব্যক্তি হলেও কাহ্নপার মধ্যে একটি উত্তরণ আছে। ৭ থেকে ১৯ সংখ্যক পর্যন্ত তিনি সাধক কবি। আর জন্মান্তরের পর পরবর্তী উচ্চারণে তিনি বোধিসত্ত্ব, এক সিদ্ধসাধক।

৩.২.১.৪ রচনাভঙ্গি

লক্ষ করা যাচ্ছে, কাহ্নপার কবিতাতে রূপকাঢ্য ও চিত্রধর্মী বিবৃতির মধ্য দিয়ে একটি বিশিষ্ট ও প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনপন্থার জটিল বিষয়গুলিকে সহজভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। চর্যার সন্ধ্যাভাষার রহস্যভেদ করলে দার্শনিক প্রত্যয়ের রূপরেখাটি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি কাহ্নপার কবিত্বও আমাদের মুগ্ধ করে। ভাষার দিকটি বিচার করলেও কাহ্নপার সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিত্রধর্মিতা তাঁর কবিতার প্রধান গুণ। রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে যে কথা বলেছেন, কথার দ্বারা যা বলা যায় না, বলতে হয় চিত্র ও সংগীতে, কাহ্ন তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'Style is the man' এই প্রৌঢ়বচনকে মনে রেখে বলতে পারি, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে অতি সাধারণ বস্তুপুঞ্জ বা ঘটনাকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে অনির্বচনীয় করে তোলায়; রূপকে অবলম্বন করে রূপকে অতিক্রম করার যে কৃৎকৌশল ভারতের দর্শনে-কাব্যে কিংবা সব দেশের রোমাণ্টিক সাহিত্যে লক্ষ করা যায়— কাহ্নপার কবিত্বের চাবিকাঠি সেই কৃৎকৌশলে, সেই সহজের অভিব্যক্তিতে। এখানেই কাহ্নর নিজস্বতা, তাঁর Style। নিম্নবর্গীয় মানুষের বিবাহ-কামনা-বাসনা-কৌতুক, কণ্ঠে নায়িকাকে জড়িয়ে রাখার জীবন্ত ছবিগুলি কাহ্নর অধ্যাত্মসংগীতগুলিকে বাঙালির চির আপনার ধন করে রেখেছে।

৩.২.২ ভুসুকুপাদ

চর্যার গ্রন্থে ভুসুকুপাদ লিখিত মোট আটটি পদ সংকলতি হয়েছে। ভুসুকু একজন শক্তিমান চর্যাকার। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর নামটি নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। অনেক চর্যাকার ভুসুকু এবং মহাযান মতের প্রাচীনতর আচার্য শান্তিদেব যিনি পরবর্তী জীবনে 'রাউত ভুসুক' বলে পরিচিত— এই দুজনকে এক এবং অভিন্ন বলে দাবি করেছেন। আবার অন্য মতে এঁরা দুই পৃথক ব্যক্তিত্ব।

৩.২.২.১ জীবনবৃত্ত

ভুসুকুপাদের জীবন সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন জানান, "ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সীমা ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দ। এই বৎসরে নকল করা ভুসুকুর 'চতুরাভরণ' গ্রন্থের পুথি পাওয়া গিয়াছে।" তাঁর মতে, চর্যাকারদের মধ্যে ভুসুকুপাদ বেশ অর্বাচীন। এবং তাঁর পদগুলিতে পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য এবং সন্ধ্যাসংকেতের আড়ম্বর চর্যাগীতির অনুশীলনে দীর্ঘ গতানুগতিকতারই দ্যোতক। কিন্তু গ্রন্থের অনুলিপির সনের মাপকাঠিতে গ্রন্থকারের কাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ বিভিন্ন গবেষক-পণ্ডিতগণের মতে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত সমস্ত মহাযান-বজ্রযানের ভাষ্যগ্রন্থ তাঞ্জুর তালিকায় স্থান পেয়েছে। ভুসুকুর চর্যাগুলো সংকলিত হয়েছিল মুনিদত্ত কৃত 'চর্যাগীতি কোষবৃত্তি' গ্রন্থে, যে গ্রন্থটিও অনরূপ তাঞ্জুর তালিকাভুক্ত একটি গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নসীমা হলে কমপক্ষে দ্বাদশ শতকে সংকলিত চর্যাগীতিকোষে ভুসুকুর পদ কীভাবে স্থান লাভ করতে পারে এটিও একটি প্রশ্ন। আবার অন্যদিকে, দ্বাদশ শতকে সংকলিত চর্যার পুঁথিতে স্থান পাওয়ার পরে ভুসুকুপাদের পক্ষে প্রায় দুশো বছর জীবিত থাকা অসম্ভব ও অবাস্তব। অতএত চর্যাকার ভুসুকুপাদ বেশ প্রাচীন কবি—তা মেনে নিতেই হয়।

তা ছাড়া রচনায় তান্ত্রিক যোগপ্রসঙ্গ, পারিভাষিক শব্দ ও সন্ধ্যা সংকেতের বাহুল্য থাকলেই তাকে অর্বাচীন বলা যায় না। কারণ সুপ্রাচীনকালে রচিত 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ও অসঙ্গের 'যোগাচার ভূমি'-তেও সন্ধ্যা-সংকেত এবং তন্ত্র প্রসঙ্গের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সহজযান তন্ত্রযানেরই একটি শাখা। অতএব সহজিয়া রচনায় তান্ত্রিক পরিভাষা থাকাই স্বাভাবিক। আর এই তথ্যের সূত্র অনুসরণ করেই শ্রদ্ধেয় সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী চর্যাকার ভুসুকুপাদ এবং সপ্তম শতকে বর্তমান, 'শিক্ষাসমুচ্চয়', 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থের রচয়িতা 'শান্তিদেব'— যিনি পরবর্তীতে 'ভুসুকু' নামে পরিচিত—এই দুই ব্যক্তিকে এক এবং অভিন্ন বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে শান্তিদেবের যে পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় শান্তিদেব, রাউতু ও ভুসুকু একই ব্যক্তি, চর্যায় ভুসুকুর বিশিষ্ট ভণিতা—'রাউতু-ভণই কট' (৪১, ৪৩) এবং ৪৬ সংখ্যক চর্যাটীকায় ভুসুকুপাদের নামে উদ্ধৃত একটি শ্লোকও ভুসুকু ও শান্তিদেবের একত্ব প্রতিপাদন করে। 'বোধিচর্যাবতার' রচয়িতা, শান্তিদেব, যিনি ছিলেন মহাযান মতাবলম্বী— তিনিই পরবর্তী জীবনে সহজানন্দের সাধক চর্যাকার ভুসুকুতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

শান্তিদেব রচিত 'শিক্ষাসমুচ্চয়ে'র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে এতে তান্ত্রিক মতের কথা আছে। 'শিক্ষাসমুচ্চয়ে'র বোধিচিত্তকে বলা হয়েছে 'শূন্যতা-করুণা-গর্ভ' এবং তা তন্ত্র-সমর্থিত ও সহজসাধনার মূল কথা। 'বোধিচর্যাবতারে'র প্রজ্ঞা পরিচ্ছেদে এবং অন্যত্রও সহজমতের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব মহাযানার্থ-কোবিদ' শান্তিদেব যে তন্ত্রমত তথা সহজমতে বিবর্তিত হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে শান্তিদেব ছিলেন রাজার ছেলে। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার আগে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুবজ্রের নিকট থেকে উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বারো বৎসর মঞ্জুবজ্রের সান্নিধ্যে থাকেন এবং মঞ্জু-শ্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর রাউত (Horse man) বেশে মগধের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং মগধরাজের সেনাপতি থাকাকালীন সময়ে তরবারিকে আশ্রয় করে তাঁর অদ্ভুত সিদ্ধি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি রাজকার্য ত্যাগ করেন এবং ভিক্ষুবেশে নালন্দায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি 'বোধিচর্যাবতার' এবং 'শিক্ষাসমুচ্চয়' রচনা করেন। ভোজনকালে, সুপ্ত অবস্থায় এবং কুটি গমনে প্রভাস্বর বা সমাধি সমাপন্ন থাকতেন বলে তিনি 'ভুসুকু' নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই নামেই তিনি চর্যার পদগুলো রচনা করেন। অতএব দেখা গেল যিনি শান্তিদেব তিনিই রাউত, তিনিই ভুসুকু। যিনি মধ্যমক শূন্যবাদের প্রবক্তা, তিনিই তান্ত্রিক মঞ্জুশ্রীসিদ্ধ, তিনিই আবার সহজসমাধিসম্পন্ন ভুসুকু। আবার অন্যমতে, রাউতু শব্দটি পদকর্তা ভুসুকুর বিশেষণবাচক, রাজপুত্র বা রাজসেবী অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য এ সম্পর্কে সংশয়াতীত সিদ্ধান্তে অদ্যাবধি উপনীত হওয়া যায়নি।

৩.২.২.২ ভুসুকুপাদের পদে বস্তুবিন্যাস ও কবিত্ব

চর্যাকার ভুসুকু যে বাঙালি ছিলেন, তার উল্লেখ তাঁর গানেই আছে— 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।' চর্যাগীতিতে ভুসুকু ভণিতায় মোট আটটি চর্যা (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯) পাওয়া যায়। এগুলি থেকে জানা যায়, ভুসুকুপাদ ছিলেন পঞ্চপাটন, চৌকোটি ভাণ্ডার ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি 'রাউত'—মৃগয়াবৃত্তি ও যুদ্ধবিদ্যায় কুশলতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পদ্মাখালে ভ্রমণরত অবস্থায় 'বঙ্গাল' কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলস্বরূপ তিনি নিজেও 'বঙ্গাল'-এ পরিণত হয়েছিলেন। এই ঘটনাই তাঁকে সহজ মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিমুখে চালিত করে। তিনি নিজেকে 'জোই' (যোগী) বলেছেন, তিনি যোগী সিদ্ধসাধক, জ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি সর্বার্থেই ভুসুকু অর্থাৎ সর্ব অবস্থাতেই সমাধি সমাপন্ন। তিনি শূন্যবাদের সমর্থক। তিনি বলেন, সর্বশূন্যতাই মহাসুখ। সর্বশূন্য চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। তাঁর মতে, এই জগৎ আদৌ অনুৎপন্ন ('আইএ—অনুঅণা'), যা কিছু দৃশ্যমান, তা আসলে ভ্রান্তি। মন বা চিত্তের গুরুত্ব তাঁর কাছে সর্বাধিক। এই চিত্তের একদিকে মৃত্যু অন্যদিকে মহাসুখ। চিত্তের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হলেই ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়, সহজের স্বরূপ হয় উদ্‌ঘাটিত। তাই তিনি ৩০ সংখ্যক চর্যায় সহজের উদ্ভাস দেখে উল্লসিত হন। এই সহজানন্দ মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায়কেই তিনি ব্যক্ত করেছেন ২৭ সংখ্যক চর্যায়।

৩.২.২.৩ রূপক ও চিত্রকল্প

ভুসুকুপাদ একাধারে সহজ-সুন্দরের সাধক এবং শিল্পী। উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি

ও দৃষ্টান্ত যোজনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর সাংকেতিক রূপক চিত্রগুলিতে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে চর্যাগীতির ধর্মনিরপেক্ষ জীবনরসিক পাঠকের কাছে তার মূল্য কম নয়। তাঁর বস্তুজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। চঞ্চল চিত্তের রূপকাতিশয়োক্তি রচনায় তিনি যে হরিণা ও মুসা-এর উপমা গ্রহণ করেছেন, যথাক্রমে ৬ ও ২১ সংখ্যক চর্যায় তা তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। তাঁর হরিণ চর্যা এবং পদ্মখালে নৌযাত্রার চর্যা ছোটোগল্পের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর গানগুলিতে ধরা পড়েছে তৎকালীন বঙ্গদেশের দেশ-কাল-সমাজের টুকরো ছবি; ঐতিহাসিকদের কাছে যার মূল্য অপরিসীম। তাঁর 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী', 'জীঅন্তে মঅলে নাহি বিশেসো' প্রভৃতি উক্তি বঙ্গীয় বাগর্থের প্রত্ন-স্মারক।

৩.৩ চর্যাপদে প্রতিফলিত তৎকালীন দেশ-কাল-সমাজের ছবি

সাহিত্যে সমকাল, দেশ ও জীবনের প্রতিষ্ঠার সত্যতা, নিয়তির মতোই অলঙ্ঘ্য। জীবনকে অস্বীকার করে সাহিত্য কোনোদিনই যথার্থ অর্থে সার্থক হতে পারে না। উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যে জীবন আসে অনিবার্য নিয়ম ও গতিতে। চর্যাপদগুলিও উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। জীবনের অসঙ্গতি, অত্যাচার, অবিচার—আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট-চিত্রণ ও বিশেষ ভাবাদর্শের প্রচার যেমন আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্যমূলক রচনাগুলিকে পরিস্ফুট করেছে, চর্যাপদের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই আধ্যাত্মিক সাধনসংগীতগুলিতে একটা বিশেষ ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হলেও, সেই ইঙ্গিত প্রসঙ্গে সিদ্ধাচার্যরা সমসাময়িক লৌকিক জীবনের যে ছবি এঁকেছেন, তা জীবনরসিক কাব্যপাঠক এবং ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান চিত্তাকর্ষক সামগ্রী। যে জীবনের কথা ও ছবি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন এই সাধনসংগীতগুলিতে বিধৃত, তাতে বিলাস ও বাসনাসক্ত ঐশ্বর্যদাম্ভিক রাজা উজিরের কথা নেই, আছে সেকালের বর্ণাশ্রম-পীড়িত তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণির প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও দৈনন্দিন আচরণের সরল সুন্দর ও স্বচ্ছ বর্ণনা। কোনো কাপট্য নেই, নেই আতিশয্য, নেই অতিশয়োক্তি অথবা অংসগতি গোপনের কোনো প্রয়াস।

চর্যার সমাজ-পরিবেশ আলোচনায় এর ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিচয়টুকু জানা যাক। এই গানগুলির রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিকের মতে সে সময়ে বঙ্গদেশে পাল রাজাদের পতন ও সেন বর্মন রাজাদের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে ধর্মমতের পার্থক্য থাকলেও বৌদ্ধ-হিন্দু সকল রাজবংশই ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যস্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের একনায়কত্ব হল প্রতিষ্ঠিত; সমাজ-শ্রমিক শ্রেণিরা হল চূড়ান্তভাবে অবহেলিত। সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের আওতার বাইরে আরও কিছু লোক রয়ে গেল, এরা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সমাজ-শ্রমিক, বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও এই 'ব্রাত্য'দের উল্লেখ আছে। এরা অনেকেই বৌদ্ধ ছিল, অথবা সহজিয়া তন্ত্র ধর্মে প্রভাবিত।

এদের উপর সেন-বর্মনদের অত্যাচারের কাহিনিও সুবিদিত। গোটা সমাজ ছিল তিনটি বৃহৎ প্রাচীরে বিভক্ত— সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র; কায়স্থ ও বৈশ্যকে এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হল আর একেবারে নীচে ছিল সমস্তরকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য মানুষের দল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যারা সম্বলহীন এবং নিরন্তর দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিঘাতে জর্জরিত এই অন্ত্যজ 'ম্লেচ্ছ' সম্প্রদায়। এই কুলমর্যাদা-জাত বিভেদের এবং বিধিনিষেধের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিল— ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস, যা সেদিন বাংলার সমাজ-জীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল— এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই চর্যাগীতিগুলি রচিত। চর্যাকারদের জীবন সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পেলেও এটুকু জানা যায় যে তারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এই তন্ত্রাচারী সিদ্ধাচার্যরা নীচবর্ণেরই লোক ছিলেন। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য প্রথা ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের সুর চর্যাগানগুলিতে পাওয়া যায়। চর্যাগীতিগুলিতে একদিকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যেকার বিরোধ অসংগতি, বিভেদ বৈষম্য ও অন্যদিকে অন্ত্যজ সমাজশ্রমিক শ্রেণির দুঃখপূর্ণ জীবনযাত্রার চিত্র সু-উদ্ভাসিত। এই বর্ণনায় সেকালের সাধারণ লোকের জীবন-জীবিকা, পুজো-পাঠ, ক্রিয়াকর্ম, গৃহস্থের পারিবারিক জীবন, বস্ত্র, অলংকার, খাদ্য ও বাসনপত্র, অপবাদ-বিচার-পদ্ধতি ইত্যাদির শিল্পসম্মত বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথমেই বাসস্থানের কথা ধরা যাক। বর্ণবিভক্ত সমাজে অন্ত্যজরা ছিল অবহেলিত এবং এরা নগরে বসবাস করতে পারত না। তাদের বাস ছিল নগরের বাইরে— "নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।" (কাহ্ন-১০) গ্রামের বাইরে উঁচু টিলায় অথবা পর্বতে এদের বাস— (ক) উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী। (২৮)

অথবা (খ) টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। (৩৩)

এর থেকেই প্রমাণিত যে নীচ জাতীয় ডোম, নিষাদ, শবর এদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে। কারণ এরা অস্পৃশ্য, উচ্চ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, তবে উচ্চশ্রেণির মনোহরণের জন্য ডোম্বীর ছলাকলা জালবিস্তারের ঘাটতি ছিল না—

"ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।।" (১০)

এই শ্রেণির লোকেরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিল দুঃস্থ। চর্যাপদে নর-নারীর যে বৃত্তির পরিচয় পাই, তার কোনোটিই তেমন অর্থকরী বা সম্মানজনক নয়। ডোমাদের জাতীয় বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি প্রস্তুত করা—

"তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চঙ্গেড়া।" (১০)

বাংলার মানুষের অন্যতম জাতীয় বৃত্তি নৌকা বাওয়া, সম্ভবত মাছ ধরা। অনেকগুলি চর্যার মধ্যে নৌকার উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত। এই নৌকা অবশ্যই আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত— কিন্তু বারবার নৌকা ও নদীর ব্যবহার সহজেই দেশের নদীমাতৃকতা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দাঁড় বেয়ে পাল তুলে অথবা গুণ টেনে নৌকা বাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়— কাহ্ন ঃ ১০, ১৩ ; ডোম্বী ঃ ১৪ ; ভুসুকু ঃ ৪৯

ইত্যাদি পদে। চর্যার পদগুলি থেকে নানা ধরনের নৌকার নাম ও নৌসামগ্রীর কথা জানা যায়— নাব, নাবাড়ি, নাবী, ভেলা, কেডুআল, খুণ্টি, কাছি, গুণ ইত্যাদি। কীভাবে নৌকা চালাতে হবে, তারও নির্দেশ চর্যায় আছে— কম্বলাম্বঃ ৮ ; ডোম্বীঃ ১৪ ইত্যাদি পদে।

'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।" (১৪)—

ইত্যাদিতে কাছি টানার যে নির্দেশ আছে, মনে হয়, তা পূর্ব বাংলার দড়াজাল, এখনও পূর্ববঙ্গে দড়াজাল দিয়ে মাছ ধরার রীতি প্রচলিত আছে।

ব্যাধবৃত্তির পরিচয় পাই ভুসুকুর দুটি চর্যায় (৬, ২৩)। চারদিক থেকে জাল পেতে হাঁক পেড়ে শিকার ধরা হত—

'কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।' (৬)
'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।'

এই পদটি হরিণ-মাংসের জনপ্রিয়তা ও বহুল ব্যবহারের সাক্ষ্য বহন করছে। ধুনুরিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় শান্তিপাদের ২৬ সংখ্যক চর্যায়—

'তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।'

চাটিল্লপাদের ৫, কাহ্নপাদের ৪৫ সংখ্যক পদে বৃক্ষছেদনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কুঠারের প্রচলনও জানতে পারা যায়। ২৫ সংখ্যক চর্যায় মাদুর ও মোটা কাপড় বোনার বিবরণ আছে।

মদের দোকান খোলা ও মদ্য বিক্রয়ের ব্যবসাও তৎকালীন সমাজে জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল—

'এক সে সুন্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।।' (৩, বিরুআপাদ)

কৃষিবৃত্তির বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া না গেলেও, হাজার বছর আগে বাংলাদেশে ভাতই যে প্রধান খাদ্য ছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। যেমন—

'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' (৩৩)

চাষবাসের জন্য বলদের ব্যবহার ছিল। গো-পালনের খবরও চর্যাগানগুলিতে পাওয়া যায়। দুধের জোগানের জন্য গাই ছিল। দোহন পাত্রের নাম ছিল পিটা (২)। দুধ ঘন করে জাল দিয়ে সর তোলার ব্যাপারটি তৎকালীন বাঙালিরা জানত।

'দুধ মাঝেঁ লড ণচ্ছন্তেঁ দেখই।' (৪২, কাহ্ন)

তবে ভাত, মাংস, দুধ ছাড়াও মদ্যপানের বিবরণ চর্যাগানের মধ্যে অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

শুঁড়িখানার দরজায় বা দেয়ালগাত্রে কোনো চিহ্ন থাকত, যা দেখে মদ্য পিপাসুরা নিজেদের ঈপ্সিত জায়গাটি বুঝে নিতেন। গরু ছাড়াও হাতি পোষা ও মাহুত বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। (কাহ্ন-৯)

ঈশ্বরী পাটনীরা সে যুগেও ছিল, কড়ি নেই বললে যাত্রীর গুপ্ত অঙ্গ তল্লাসির রীতিও ছিল। (৩৭, তাড়ক)। নৌবৃত্তির পাশাপাশি নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা ক্ষীণ আভাস পাই। সোনা-রুপোর বাণিজ্যও বাংলাদেশে ছিল,

'সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নহিকে ঠাবী।' (৮, কম্বলাম্বরপাদ)

এই বণিক অথবা ধনী গৃহস্থরা যে নিম্নবঙ্গে জলদস্যুর আক্রমণে নিমেষেই নিঃসম্বল হত— ভুসুকু আমাদের সে খবরও দিয়েছেন—

'বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' (৪৯, ভুসুকু)

অতএব জানা গেল, পর্তুগিজ বা হার্মাদের আগেও বাংলাদেশে দস্যুবৃত্তি ছিল। চৌর্যবৃত্তির খবরও অপরিজ্ঞাত নয়—

'কানেট চৌরি নিল অধরাতী।' (২, কুক্কুরী)

চোরের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিতও আছে কৃষ্ণাচার্যের পদে—

'সুণ বাহ তথতা পহারী।' (৩৬)—

৪ সংখ্যক চর্যায় তালাচাবির উল্লেখ সেই সতর্কতার পরিচায়ক। নদীমাতৃক বাংলাদেশে খালবিলের আধিক্যহেতু নানাবিধ সাঁকোর সঙ্গেও বাঙালির পরিচয় অনেকদিনের। চর্যাগানের যুগেও এপার ওপারে গমনাগমনের জন্য সাঁকোর প্রচলন ছিল। বড়ো বড়ো গাছ কেটে সাঁকো তৈরি করাটা Social work হিসাবে গণ্য হত। পুণ্যার্থে বা ধর্মার্থে কেউ কেউ সাঁকো গড়ে দিতেন—

'ধামার্থে চাটিল সান্ধম গঢ় ই।' (৫, চাটিল্লপাদ)

দুঃখ, যন্ত্রণা, অশান্তি সে জীবনে ছিল, ছিল অর্থাভাব—

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' (৩৩, টেণ্টণ)

ছিল অসঙ্গতি। যে চোর সেই আবার ত্রাতা—

'জো যো চৌর সৌ দুষাধী।' (৩৩, টেণ্টণপাদ)

মাতাল স্বামীর জন্য স্ত্রীর কষ্টের সীমা ছিল না, নেশাগ্রস্ত স্বামী তার পত্নীকে ভুলে যেত—

'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়ী তোহোরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী।।' (২৮, শবরপাদ)

অবস্থা বিপাকে পড়ে 'তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' (৬)

চুরি ছিল, লুণ্ঠন ছিল, অস্পৃশ্যতা ছিল আর ব্যভিচারিতা ছিল। একটি চর্যাতে

গৃহবধূর ব্যভিচারের ইঙ্গিত বড়ো স্পষ্ট—

'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।' (২, কুক্কুরীপাদ)

কাহ্নের একটি পদে ব্রহ্মণের সঙ্গে ডোম, শবর ইত্যাদি কন্যার অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে—

'ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।' (১০, কাহ্ন)

কৃষ্ণপাদের আরেকটি চর্যায় তৎকালীন সমাজের বিবাহের একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়—

'ভব নিব্বাণে পড়হমাদলা।
মণপবণ বেণি করন্ড কসালা।।
জঅ জঅ দুংদুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।
ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।" (১৯, কৃষ্ণপাদ)

দুন্দুভিনাদে জয়ধ্বনি উঠিয়ে কাহ্নপাদ ডোম্বীকে বিয়ে করতে চলেছেন। বাঙালি বিবাহের বরযাত্রার চিত্র সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে এখানে। সেকালে যৌতুক প্রথাও চালু ছিল। যৌতুকের লোভে সেকালে নিচু জাতের মেয়েকে বিবাহে আপত্তি ছিল না। বর যেতেন কর্পূর দিয়ে পান খেয়ে—

'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।' (২৮, শবর)

আচার অনুষ্ঠান বিয়ে ছাড়াও তৎকালে বিধবাবিবাহ বা 'সাঙ্গা'ও প্রচলিত ছিল—

'আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গা।' (১০, কাহ্ন)

শবরপাদের চর্যাগানগুলিতে শবর-শবরীর সুখী দাম্পত্যজীবনের ছবি পাওয়া যায়।

প্রসবকালে বধূকে আঁতুড়ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদের সঙ্গে 'বহুড়া' (বধূ)-কে ঘর করতে হত। স্ত্রীর ভগ্নি বা শ্যালিকাও সম্ভবত ভগ্নিপতির ঘরে থাকত। রমণীকুল নানা অলংকার পরিধান করত— কাঙ্কান (কঙ্কণ), ঘণ্টা, নেটর (রাজনূপুর), মুত্তিহার (মুক্তাহার) ইত্যাদি অলংকার ছাড়াও প্রাকৃত রমণীর নিজস্ব বেশভূষার মধ্যে খোঁপায় ফুল, ময়ূরের পাখা, গলায় ফুলের মালা ও কর্ণে পুষ্পাভরণের উল্লেখ বিভিন্ন চর্যাগানে পাওয়া যায়।

বিলাসের মধ্যে মদ্যপান ছাড়াও নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। যাযাবর নৃত্যগীতের দল ছিল, পারদর্শিতাও অপূর্ব ঃ

'এক সো পদমা চৌসট্ঠী পাখুড়ী।।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।' (১০, কাহ্ন)

লাউয়ের আগায় বাঁশের ডাঁটি পরিয়ে একতারা তৈরি হত, ভ্রাম্যমাণ নৃত্যগীতের দল নাচের মাধ্যমে বুদ্ধনাটক পরিবেশন করে বেড়াত—

'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।" (১৭, বীণাপাদ)

অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে দাবা খেলা তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল। কাহ্নের ১২ সংখ্যক চর্যায় দাবার রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।

জীবনযাত্রার যে সমস্ত উপাদানের নাম চর্যাপদে আছে, তার মধ্যে হাড়ি, পিটা, ঘড়ি, কানেট, কুন্তল, আরশি, কুঠার, তালাচাবি, টাঙ্গি, চীরা (পতাকা), সোনা, রুপা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় রূপটিও চর্যাপদে প্রকীর্ণ। সমাজে তখন কাপালিক, যোগী, ক্ষপণক ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধক ছিল। তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে এগুলির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এদের জীবনযাত্রার অনেক খণ্ড খণ্ড চিত্র চর্যাপদে উপস্থিত। উলঙ্গ হাড়মালা পরিহিতা সাধনসঙ্গিনী সমভিব্যাহারী কাপালিকের উল্লেখ সবচেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি অশ্রদ্ধাও আছে।

সমাজজীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণই চর্যার গানে পাওয়া যায়। শবরের মৃত্যুর পর সৎকারের বাস্তব চিত্র আছে ৫০ সংখ্যক চর্যায়। ধনীর ঘরে আগুন লাগার বিবরণ দিলেন ধামপাদ (৪৭), সৈন্যসহ পররাজ্য অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন কুক্কুরীপাদ ৪৮ সংখ্যক চর্যায়। ধার্মিক লোক আগম পুথি পড়ত, কোশাকুশি দিয়ে পুজো করত, মালা জপ করত, বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন সম্মানী। থানা-কাছারিও ছিল। কৃষকের জীবনে ইঁদুরের উপদ্রবের আরও বিবরণ ভুসুকু দিয়েছেন ২১ সংখ্যক চর্যায়।

চর্যাপদে প্রাপ্ত এই সব দৈনন্দিন জীবনের লৌকিক উপাদানগুলি সিদ্ধাচার্যদের সুগভীর আধ্যাত্মিক দর্শন ও গুহ্য সাধন পদ্ধতিকে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছিল, ঐতিহাসিকের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে নয়। তবু সুগভীর জীবনবোধের প্রেরণায় এই কবিরা কোথাও অলৌকিক অদ্ভুত, অবাস্তব, অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। নিত্য দ্রষ্টব্য বস্তুই কাব্যের রূপক-উৎপ্রেক্ষার স্থান অধিকার করেছে। যার ফলে, এই সব সাধনসংগীতে তৎকালীন জীবনযাত্রার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্র সমুদ্ভাসিত, তা বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসকারের কাছে ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেই সংশয়াতীত স্বীকৃতি পাবে। ড. সুকুমার সেন, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ ক্ষণোদ্ভাসিত এই জীবনচিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সে যুগের আধ্যাত্মিক সাধন সংগীতে জীবনের যে পরিচয় আমরা পেলাম— তা বাঙালি জাতির চিরকালীন পরিচয়। ঘরে হাঁড়িতে চাল নেই, পোষ্যেরও অবধি নেই— অতিথিরও শেষ নেই। কারো ভাগ্য এমনি অপ্রসন্ন যে অতি কষ্টে সে যা কিছু সংগ্রহ করে গভীর রাতে তা মুষিকের উদরস্থ হয়। তথাপি তারা নাচ-গান-নাটকে বিভোর, অবসরের সময় দাবা খেলে, তাদের ঘরের রমণীরা ময়ূরের পাখা পরে, কণ্ঠে গুঞ্জার মালা পরে, কর্পূর সুবাসিত তাম্বুলরসে অধর রঙিন করে বিলাসচর্চা

করে। এরা ত্রয়োদশ শতকের নয়, চিরকালের মানুষ জাতি। চর্যার পদগুলি সিদ্ধাচার্যদের কবি প্রতিভার অমৃতস্পর্শে শাশ্বত মানুষের চিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বাঙালি জীবনের মর্মমূলে।

৩.৪ চর্যাপদের কাব্যিক উৎকর্ষ ও সাহিত্যিক মূল্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের বিশিষ্টতা এখানেই যে এই পদগুলি বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্যের এতাবৎকালের প্রাপ্ত আদিতম উপাদান। সাহিত্য হিসাবে চর্যার সার্থকতা বা পদগুলির কাব্যমূল্যের নির্ভুল এবং নির্মোহ বিচার করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভাবও বদলায়। চর্যাপদ যে সময়ে রচিত, তখন বাংলা ভাষার নিতান্ত অপরিণত অবস্থা। সবেমাত্র সে অপভ্রংশের হাত থেকে বহির্গত হয়ে নতুন আলো হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে শুরু করেছে। তাই এই ভাষা অনেকটাই দুর্বোধ্য আর এই দুর্বোধ্যতার জন্য এর রসোপব্ধির ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। ভাবের বিবর্তনের ব্যাপারটিও বাধার সৃষ্টি করে। স্থায়ী ভাবগুলো পরিবর্তনশীল না হলেও, কাব্য সৃষ্টির উপাদান বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবগুলো সতত সঞ্চরণশীল। স্থায়ীভাবই রসসৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়, তাই পৃথিবীর কোনো সাহিত্যই চিরকাল সমানভাবে রস সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং চর্যাগীতিগুলির রস তৎকালীন পাঠকের মধ্যে যতটুকু ছিল, আজ তার সম্যক ধারণা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, চর্যার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুখ্যত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্ব, যা গুরু পরম্পরায় ব্যাখ্যাগম্য। কাব্য ব্যাখ্যাগম্য হলে ধীমান ব্যক্তির উৎসবের কারণ হতে পারে, কিন্তু এই কষ্টসাধ্য এবং দুর্গম রসাভিসার সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। চর্যার সাহিত্যমূল্য বিচারে এই অসুবিধাগুলোর কথা অনিবার্যভাবেই সর্বাগ্রে মনে আসে।

দার্শনিক ও ধর্মীয় স্বরূপ চর্যাগীতিগুলি সহজিয়া সাধনার অন্তর্গত। সাধনার ক্ষেত্রে এই সহজিয়া ভাব বাঙালির জন্মগত। বাঙালির এই একান্ত পরিচিত সাধনাধারা জাতির মনে একটা চিরকালীন আবেদন সঞ্চারিত করে। চর্যাকাররা যখন বলেন—

> 'কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
> বাল তিল একু বাঙ্ক ণ ভুলহ রাজপথ কণ্ঢারা।।
> মাআমোহাসমুদা রে অন্ত ণ বুঝসি থাহা।
> অগে নাব ণ ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা।।' (১৫, শান্তিপাদ)

সহজ বৈরাগ্যের এই আবেদন বৈষ্ণব কবিতায়ও সঞ্চারিত। কাব্যের এই আবেদন বাঙালির অন্তরে চিরকাল অনুভূত হয়েছে রাগ-রাগিণীর বিচিত্র স্পন্দনের মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিকতা চর্যাগীতির উদ্দেশ্য হলেও এতে এমন অনেক রূপকল্পের ব্যবহার হয়েছে যার আবেদন চিরকালীন রসের ভূমিতে। এই চিত্ররূপময়তার অন্তর্গত সুগভীর কাব্যরস আমাদের পৌঁছে দেয় উপলব্ধির জগতে।

আকাশের নীচে পূর্ণতার অনুসন্ধানে উন্নত মস্তক পর্বতে যে শবরী বালিকাটি বাস করে, তার কথাই ধরা যাক— সর্বাঙ্গে তার অপরূপ আরণ্য-সৌন্দর্য, তার খোঁপায় গোঁজা শিখীপুচ্ছ, বুকের উপর দুলে দুলে উঠছে গুঞ্জমালা, তার কানের কুন্তলে সকালের রোদ উঠছে ঝিকমিকিয়ে, আর নির্জন পার্বত্য প্রদেশ জুড়ে তার সহজ সরল সৌন্দর্য আলো বিচ্ছুরণ করছে। পরিবেশটিও চমৎকার— সামনে, পেছনে, চারপাশে নানা গাছ, কত বিচিত্র ফুলের সম্ভার, আকাশছোঁয়া গাছের ডাল, আর এই উদার বিস্তৃত মহাসৌন্দর্যের মাঝে পুষ্পিত লতার মতো দাঁড়িয়ে শবরী—একাকিনী সেই বালিকার সাজপোশাক আর তার পরিবেশটি যেন শিল্পীর তুলির টানে অপরূপ হয়ে উঠেছে। এই বালিকা নীল আকাশের উদার বিস্তৃতির নীচে পাহাড়গাত্রে চাঁচড়ের বেড়া দেওয়া ঘরে বাস করে; বাড়ির সামনে তার ছোটো খেত, সেই খেতে সদ্য ফোটা কার্পাস ফুলগুলি কালো মাটির বুকে ছোটো হিরের টুকরোর মতো শিশুসুলভ আনন্দে বিহ্বল, পেছনে ছোটো খেতে কঙ্গুচিনা ফলের গাছ। সুপক্ক কঙ্গুচিনা দিয়ে হাড়িয়া তৈরি করে শবর-শবরী। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ আশীর্বাদে বেড়া বাঁধা বাড়িটি একটি সাদা ফুলের মতো অবাক উল্লাসে হেসে ওঠে। আঁধার রাতে সেখানে নামে মৃত্যুর বিশুদ্ধতা, দূর শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার সিঁদুর রঙের লাল আগুনের আভা চোখে লাগে, স্তব্ধতাকে খানখান করে দেয় শিয়াল কুকুরের কান্না। স্বল্প কথায় পরিমিত বাক্ প্রয়োগে আমাদের পাশের পাহাড়ের আদিবাসী রমণীর পরিপূর্ণ সুখে সাজানো বাড়ি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-বিলাসের আনন্দ-বেদনাময় চিত্তের নিষ্পাপ রূপায়ণ— হাজার বছর আগেও অধ্যাত্মসাধন সংগীতে এগুলির অস্তিত্ব আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে, আনন্দে করে অভিভূত। বসন্তের আগমনে—

'নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' (২৮, শবর)

বনভূমির এই প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের বসন্ত পর্যায়ের গানগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়— 'আজি ফাগুন লেগেছে বনে বনে।'

এই ছবি আঁকার দিকে চর্যাকারদের প্রবণতার নিদর্শন সর্বত্র পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পাঠককে কবি সিদ্ধাচার্য নিয়ে গেছেন সেই নদীর ধারে, গহন গভীর এবং প্রবল বেগে নিয়ত ধাবমান তরঙ্গসংকুল যে নদীর জলে কী যেন রহস্য নিত্যই ঢেউয়ের দোলায় দুলছে, দূরে দেখা যায় নদীর পার। তীরভূমি ঢালু হয়ে এসেছে নদীর মধ্যে, অথবা—

গঙ্গা জউণা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পরা করেই।। (১৪, ডোম্বী)

গঙ্গা যমুনার শান্ত নীল জলরাশির মাঝে ছোটো ডিঙ্গি নৌকা সাবলীল নিরুদ্বেগ অবহেলায় বেয়ে চলেছে ডোম্বী রমণী। যোগতত্ত্বের রহস্য বলতে গিয়ে এভাবে বারবার নদীর ছবি এঁকেছেন চর্যাগীতিকাররা; বাংলা সাহিত্যে রূপক উৎপ্রেক্ষায় যে নদীর ব্যবহার পরবর্তীকালে আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত রূপ নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-র রহস্যময় কাব্য চেতনায়, জীবনানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশৈলীতে অথবা নজরুলের গানে।

বাস্তব এবং আশ্চর্য কাব্যময় নিখুঁত দৃশ্য, চর্যাপদে বিরল নয়. ওই যে টিলার উপর ঘরটি যেখানে হাঁড়িতে নেই ভাত, ঘরে নিত্য অতিথি, নতুন বধূটি আলস্যে কানের 'কানেট' খুলে ঘুমায়নি, চোর চাই নিয়ে গেছে, শ্বশুর ঘুমে, অর্ধরাত্রের এই সর্বনাশের খবর তার অজানা। জাগ্রত বধূর বিষণ্ণ উদ্বেগাকুল মুখ; একতারা বাজিয়ে যোগী নেচে চলেছে ভাববিভোর চিত্তে, অথবা মাদল বাজিয়ে হাঁক করে বর চলেছে বিয়েতে, সেখানে মেয়েলি আচার, বাসর ঘরে নববধূ— দুচারটি কথার বিদ্যুৎঝলকে এসব চিত্রের সঙ্গে আমাদের চিরকালীন পরিচয় হয়ে গেল। হাঁক পেড়ে জাল বিছিয়ে শিকারির হরিণ ধরা, বিপাকে পড়ে ভীত হরিণের জলগ্রহণ না করা, মুক্তির আশায় ছুটে বেড়ানো, শান্ত পাহাড়, নদী, ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব— এই বাস্তুয় অথচ কাব্যমধুর চিত্রগুলি ধর্মের উপাদান, কিন্তু কাব্যের সামগ্রী।

ভাবের জগতেও সিদ্ধাচার্যরা পাঠককে নিয়ে গেছেন। চিত্ত ও চিত্তজ মোহের উপাদান হিসাবে কাব্যে এসেছে বৃক্ষ ও তার ডালপালাসহ বিস্তৃতি। বাইরের জিনিসের বিনিময়ে পরমকে লাভ করা যায় না। বাইরের আড়ম্বরটাই বড়ো নয়, বাইরের রাস্তাটি ভেতরে যাওয়ার প্রবেশ পথ মাত্র— এই তত্ত্বটি সুগভীর কাব্যময় বোধের দ্বারা চর্যাপদে প্রকাশিত। পরম প্রিয়ই সিদ্ধাচার্যের চরম কামনার ধন। কাহ্নপাদের পদগুলি এই প্রিয়সঙ্গ কামনার ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রেমের কাব্য হিসাবে আবেদনযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ধরা দিয়েও ধরা দেয় না সেই পরমপ্রিয়। কত বেদনা, কত যন্ত্রণা নিয়ে, কত দুঃখময় পথ, উত্তাল তরঙ্গসংকুল নদী পেরিয়ে সাধক আসছেন। তবু সেই ডোম্বী ছলনাময়ী নারীর মতোই দূরে সরে যাচ্ছে। এই পেয়েও না পাওয়ার বেদনা চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে, কাহ্নের চর্যায়—

'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।।
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।। (১০, কাহ্ন)

—'ডোম্বী তোমার জন্য আমি নটসজ্জা ছাড়িলাম— তোমার জন্য আমি হাড়ের মালা পর্যন্ত পলায় পরিলাম— এখনও কি তোমার সহিত আমার সাঙ্গা হইবে না?'— এই আত্মনিবেদন ও সুগভীর আকাঙ্ক্ষা পদাবলির রাধার কথা মনে করিয়ে দেয়—

'চীর চন্দন উরে হার না দেলা—
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।'

গীতিকবিতার 'subjectivity'-র প্রবণতাও চর্যাপদের কবিতাগুলোতে লক্ষ করা যায়। বহিরঙ্গে কবিতাগুলোকে Lyric বলা না গেলেও অন্তরঙ্গে চর্যাগানে Lyric সুর ধ্বনিত। যে ধর্মমত সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ ও প্রচার করতে চেয়েছেন, তা মূলত মনোময় অনুভূতি-প্রধান ও উপলব্ধি সর্বস্ব; সে কারণেই ধর্মব্যাখ্যা হয়েও চর্যাপদ সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হতে পেরেছে।

৩.৫.১.১ ধ্বনিতত্ত্ব

(১) প্রাকৃতের স্তরে সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের ক্ষতিপূরণমূলক দীর্ঘতা ঃ জন্ম>জম্ম>জাম, কর্ম>কম্ম>কাম— জামে কাম কি কামে জাম। বানানে কোথাও কোথাও এই দীর্ঘীকরণের চিহ্ন অনুপস্থিত— মধ্যেন>মজ্ঝেন>মঝেঁ-র পরিবর্তে মাঝেঁ—সরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে লিপিকর প্রমাদও ঘটতে পারে।

(২) অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জনের সংরক্ষণ ঃ দুর্লক্ষ্য>দুলক্খ—দুলক্খ বিণানা, মিথ্যা>মিচ্ছা— উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা, মৌক্তিক>মুত্তি-লব এ মুত্তিহার।

(৩) পদান্তের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন— ভণতি>ভণই, কোথাও কোথাও পদান্তের ইঅ (-ইআ) ই (ঈ)-তে রূপান্তরিত হয়েছে, যথা- উত্থিত>উট্ঠিঅ>উঠিঅ>উঠি।

(৪) য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়; যেমন, নিকটে>নিয়ড্ডি (=নিঅড্ডি); আয়াতি>আবই (=আআই) ইত্যাদি।

(৫) উচ্চারণে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর, তিন 'স', দুই 'ন' এবং 'জ' ও 'য' ইত্যাদির মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

(৬) পদের আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে কোথাও কোথাও আদ্য অ-কারের দীর্ঘীভবনঃ কক্ষিকা>কচ্ছিআ>কাচ্ছি; অহকং>হকং>হউঁ>হাউঁ ইত্যাদি।

৩.৫.১.২ রূপতত্ত্ব

(১) চর্যায় ক্লীব লিঙ্গ নেই। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে অতীতকালের ক্রিয়া প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ হত— লাগেলি আগি। সম্বন্ধপদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত এবং প্রয়োজন বিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ হত— হাড়েরি মালী। স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় হিসাবে ই (ঈ) র ব্যবহার ছিল। কদাচিৎ 'নি' ও ব্যবহৃত হত— শুণ্ডিনি।

(২) দ্বিবচনের ব্যবহার নেই। একবচন ও বহুবচনে শব্দরূপে কোনো পার্থক্য নেই। বহুত্ব বোঝানোর জন্য সকল, সব লোঅ, জন অথবা কোনো সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ হত। শব্দদ্বৈত দ্বারাও বহুবচন করা হত— উঁচা উঁচা পাবত ইত্যাদি।

(৩) একই বিভক্তির দ্বারা একাধিক কারকের অর্থজ্ঞাপন ঃ —এ—এঁ—তেঁ, এতেঁ করণ ও অধিকরণ উভয় কারকেই প্রযুক্ত হত। করণ ঃ সুখদুখেতেঁ, অপণে, বেগেঁ; অধিকরণ ঃ ঘরে, চীএ, হিএঁ। করণ ও অধিকরণের বিভক্তি অপাদানেও ব্যবহৃত। যথা ঃ জামে কাম কি কামে জাম; কুলেঁ কুল। গৌণ কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তি একই, রে-রেঁ-ক—পথক, নাশক।

(৪) বিভিন্ন কারক-বিভক্তি ছাড়াও বিনা, অন্তরে, মাঝ, দিআ, সম ইত্যাদি কারক বাচক অনুসর্গের ব্যবহার ছিল। এগুলি আধুনিক কালের মতো বিশেষ্য বা সর্বনামের অব্যবহিত পরে বসে— তোএ সম, তোহোর অন্তরে।

(৫) বিভিন্ন সংখ্যাশব্দের ব্যবহার চর্যায় আছে। যথা— একু, দুই, চারি, অঠ, বতিশ, চৌষট্ঠী ইত্যাদি।

(৬) পুরুষ অনুসারে ক্রিয়া রূপের পার্থক্য বজায় ছিল। বর্তমান কালে উত্তমপুরুষে 'মি' এবং অহমজাত হুঁ যোগ করা হত। মধ্যম পুরুষে 'সি' অথবা অনুজ্ঞায়—অ, -হ ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। প্রথম পুরুষে ক্রিয়া বিভক্তি ছিল—ই<-তি।
ভবিষ্যৎ কালে উত্তমপুরুষে তব্যজাত— ইব, মধ্যমপুরুষে—হসি এবং প্রথম পুরুষে-য্যাতি জাত হই>হ যুক্ত হত।
শুধু 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত অথবা এর সঙ্গে-ইল (-এল) যুক্ত হয়ে অতীতকালের রূপ গঠিত হত। ফুলিঅ=ফুলিলা।

(৭) সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়াদির দ্বারা পদগঠনের রীতি প্রচলিত ছিল, যথা—সন্ধি—অজরামর, ভাবাভাব ইত্যাদি। সমাজ—রবিশশি (দ্বন্দ্ব), তিশরণ (দ্বিগু), মহাতরু (কর্মধারয়), নলিনীবণ (তৎপুরুষ)। বেশ কিছু রূপকের প্রয়োগ আছে।

৩.৫.২ সন্ধ্যাভাষা

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার অধ্যাত্মতত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে চর্যার কবিরা সরাসরি সর্বজনবোধ্য ভাষায় তা প্রকাশ করেননি। আসল বক্তব্যকে কতকগুলি ভিন্ন অর্থবহ শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে আচ্ছন্ন করা হয়েছে। চর্যার টীকা রচনা করতে গিয়ে মুনিদত্ত চর্যায় ব্যহবৃত শব্দগুলির ভিতরে গূঢ় অর্থই প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর টীকার বিভিন্ন স্থানে এই দ্ব্যর্থ শব্দ ও প্রকাশ রীতিকে 'সন্ধ্যাভাষা', 'সন্ধ্যাবচন', 'সন্ধ্যাসংকেত' অথবা 'সন্ধ্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই টীকা অনুসরণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে চর্যাগীতি 'সন্ধ্যাভাষায়' লিখিত। কিন্তু এই 'সন্ধ্যাভাষার' বানান, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সন্ধ্যা' অর্থে এই ভাষার সঙ্গে 'সন্ধ্যার' নৈসর্গিক অস্ফুটতার সাদৃশ্য লক্ষ করে সন্ধ্যাভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'সন্ধ্যাভাষার মানে আলোআঁধারি ভাষা, ... খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' আবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, চর্যার ভাষা বিশেষ ভাষার গূঢ়রূপ নয়, আঞ্চলিক উপভাষা বিশেষ। অন্যদিকে, বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে, 'সন্ধ্যা' বানানটি লিপিকর প্রমাদ, প্রকৃত বানান 'সন্ধা', সম্—ধা ধাতু থেকে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সন্ধ্যাভাষার অর্থ— আভিপ্রায়িক ভাষা বা সাংকেতিক ভাষা। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেছেন। কিন্তু যুক্তির দিক থেকে এই মত গ্রহণযোগ্য হলেও পুথিতে প্রাপ্ত 'সন্ধ্যা' বানানটিও উপেক্ষণীয় নয়। কেননা এই পুথি ছাড়াও বৌদ্ধতন্ত্রের বহু পুথিতে 'সন্ধ্যা' বানানটি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 'যে ভাষার অভীষ্ট অর্থ সম্যক ধ্যান (সম্—ধ্যৈ) যোগে বুঝতে হয়'— এরকম ব্যুৎপত্তি করলে 'সন্ধ্যা' বানানটি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ভাষার অর্থবোধের সঙ্গে যে 'ধ্যানের' সম্পর্ক ছিল টীকাকার মুনিদত্ত ১২ সংখ্যক চর্যার টীকার গোড়াতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বস্তুত সন্ধ্যাভাষা কোনো আঞ্চলিক উপ-ভাষা নয়, তা আসলে গূঢ়ার্থ-প্রতিপাদক একধরনের বচন-সংকেত। যেখানে অভীষ্ট বক্তব্যকে সাধারণের অগোচরে রেখে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, সেখানেই এই ভাষার ব্যবহার প্রশস্ত। প্রাচীনকালের ধর্মচর্যায় যখনই

গোপনীয়তার দরকার হত, তখনই ধর্মগুরুগণ এই ধরনের সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ করতেন। চর্যাগান রচয়িতা তন্ত্রনির্ভর বৌদ্ধ যোগীরা সাধনার গুহ্যত্ব রক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকতে গিয়ে সচেতনভাবেই এই সন্ধ্যাভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে যে সমস্ত গানে তান্ত্রিক পদ্ধতির আলোচনা আছে সেখানে সন্ধ্যার প্রয়োগ বেশি; আবার যেখানে দার্শনিকতার প্রতি ঝোঁক বেশি সেখানে সন্ধ্যার প্রয়োগ কম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই অস্পষ্টতা শুধু চর্যাগীতির একক বৈশিষ্ট্য নয়, মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধকদের সকলের কবিতাতেই এই ভাষার হেঁয়ালি চাতুর্য লক্ষণীয়। কবির, দাদু, বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল, নাথপন্থা— সর্বত্রই ভাষারীতি উপমা-উৎপ্রেক্ষা, হেঁয়ালিপনা প্রায় এক।

৩.৬ চর্যাপদের অনুবর্তন বা উত্তরাধিকার

চর্যাগীতির ধারা বাংলা দেশে লুপ্ত হলেও তার ঐতিহাসিক প্রবর্তনা বাংলা সাহিত্যে একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বাঙালির জীবনধারার সূত্রপাতের এই চর্যাগুলি আবহমানকালের বাঙালি জীবনচর্চারও সাক্ষর বহনকারী।

চর্যাপদের ধর্ম ও দার্শনিকতার মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে এরূপ ঃ

(ক) সমন্বয়বাদ চর্যার দার্শনিকতার মূল সুর। বিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বেদান্ত, যোগ ও তন্ত্র ইত্যাদি সাধনার ধারা মিলিত হয়ে চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি রচিত হয়েছে।

(খ) চর্যার কবিদের জীবন সম্পর্কে একটা ঔদাসীন্যের ভাব কবিতায় বিধৃত।

(গ) এই কবি-সাধকদের সাধনায় আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য নেই, বরং আচারসর্বস্বতার প্রতি নেতিবাচক মনোভাবই সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে 'সহজ সাধনার' পথে। সহজ সাধনাই চর্যার সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) সহজ সাধনার অণুসিদ্ধান্ত হিসাবেই দেখা দিয়েছে মানবতন্ত্র।

মানুষের দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড— সহজ সাধনার এই তত্ত্বই সাধকের দৃষ্টিতে মানুষের গৌরব বর্ধিত করে। মানবতন্ত্র তাই সহজসাধনার অনুষঙ্গী।

বাঙালির সাধনা রূপে সমন্বয়ী, স্বরূপে তা সহজ। বাঙালির সমস্ত সাধনাতেই সমন্বয়বাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাঙালির সাধনায় বৈষ্ণব-শাক্ত-বেদ-তন্ত্র সব একাকার। অদ্বৈতবাদী বেদান্তের আনন্দভাবনাই বৈষ্ণব সাধনার মূলে। বৈষ্ণব তন্ত্রে এসে অদ্বৈতবাদী আনন্দ-ভাবনা সমন্বয়ের প্রভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদে রূপান্তরিত হল। দ্বৈতবাদী শাক্তরা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদে রূপান্তরিত হল। দ্বৈতবাদী শাক্তরা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে উচ্চারণ করলেন— 'তারা আমার নিরাকারা।" সাকার শক্তি নিরাকার পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন। মাধুর্যের উপাসক বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-রূপটিকেও বাদ দিতে পারলেন না। আবার ঐশ্বর্য সাধক শাক্তরা মাতৃকল্পনায়

মাধুর্যমিশ্র ভাবটিকেও রূপদান করেন। সাধনার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের এই ধারাটি আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখের Neo-Hinduism বা Revivalism আন্দোলনের ভিত্তি এই সমন্বয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের সাক্ষাৎ চর্যাপদের যুগ থেকে অদ্যাবধি বাঙালির সাহিত্য বহন করছে, শুধু বিষয়বস্তুতেই নয়— রূপকল্পে, form-এও।

চর্যা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেরও মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। এই সকল ধর্ম সাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও অপ্রত্যক্ষ কিছু সংযোগ ছিল। চর্যাসাধকদের ধর্মাচরণের রীতি-বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত না হলেও তাঁদের ধর্মসাধনার মূল সহজিয়া তান্ত্রিক প্রকৃতিটি পরবর্তী বাংলা দেশের নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া শাখায় এবং বাউল— কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মভাবুকতায় গৃহীত হয়েছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধকদের দ্বারা লিখিত আখ্যাননির্ভর কাহিনিকাব্যে সাধনা ও সাধনপদ্ধতির দিক থেকে চর্যাগীতির সঙ্গে মিল দেখা যায়। এমনকি নাথপন্থীদের রচনায় রূপক-কল্পনা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে চর্যাকবিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। চর্যার কবিদের চন্দ্রসূর্য, গঙ্গাযমুনা, দেহনৌকা— মনকেডুয়ালের উপমা নাথপন্থীদের রচনাতেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। নাথপন্থীদের কাব্য 'গোপীচন্দ্রের গান' এবং 'গোরক্ষবিজয়ে' চর্যার অনুরূপ রূপক-কল্পনা ও প্রহেলিকা ব্যবহারের রীতি লক্ষ করা যায়। যেমন—

'ইড়া পিঙ্গলা দুই নদীর যে মাঝে।
দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে।' (গোরক্ষবিজয়)

অথবা

'নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চালে।
আন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে। (গোরক্ষবিজয়)

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধধর্ম-বিশ্বাসের লৌকিক সংযোগ ছিল, ধর্মমঙ্গলে, ধর্মঠাকুরের ছড়ায় এবং শূন্যপুরাণে তাই চর্যাগীতির রূপকের অনুরূপ অঙ্কিত হয়েছে। যেমন—

'মন কর নৌকা পবন কেরআন।
আপুনি তো নিরঞ্জন হোইলা কান্ডার।'

অথবা ধর্মপূজাপদ্ধতিতে—

'পখুরপাড়েতে সদা-ডোমের কুড়িয়া।
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।।'

সাধনতত্ত্ব ও সহজিয়া ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চর্যার সাংগীতিক প্রকৃতিটিও অনুসৃত হয়েছে বৈষ্ণব সাধনার রাগাত্মিক পদাবলিতে এবং অষ্টাদশ শতকের কর্তাভজা বাউলদের রচনায়। চৈতন্য-তিরোভাবের পর বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় নানা শাখা উপশাখায় বিভাজিত হয় এবং সেই সূত্রে তন্ত্রাচারও বৈষ্ণব ধর্মের কোনো কোনো শাখায় স্থানলাভ করে ও সেই সকল বিশেষ শাখা থেকে উপজাত সাহিত্যে পূর্বতন তন্ত্রনির্ভর সাহিত্যের রূপ-রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদাবলিতে রূপক ব্যবহার, সন্ধ্যাবচনের প্রয়োগ

ও প্রহেলিকা বিলাসে চর্যাগীতির ঐতিহ্যই অনুসৃত হয়েছে। যেমন—

'ফলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ।।'

সহজিয়া বৈষ্ণব ও চর্যাসাধকদের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও সাধনা, সাধনতত্ত্ব, তত্ত্বপ্রকাশের রূপকভঙ্গি ও গুরুবাদ— এ সমস্ত লক্ষণের দিক থেকে সহজিয়া বৈষ্ণব ও বিশেষত চর্যাসাধকদের সঙ্গে বাউলদের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। চর্যাগানের মতো বাউল গানেও দেহতত্ত্বের প্রাধান্য, সন্ধ্যাভাষার আলো-আঁধারি প্রচ্ছন্নতা এবং গূঢ় প্রহেলিকা-বিলাস লক্ষণীয়। চর্যাগীতির মতোই জীবনের সহজ, ঘরোয়া ও লৌকিক উপকরণ থেকে তত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত ঃ

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম তাহার পায়।
আঠ কুঠুরি নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলক কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোটা—
আয়না মহল তায়।।'

অনেকে চর্যাগীতির উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তন্ত্রনির্ভর বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের অধ্যাত্মসংগীতের সরাসরি কোনো প্রভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে পড়েনি বা এর রীতি-প্রকরণও অনুসৃত হয়নি। বস্তুত উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তা ও বাউলদের মনের মানুষ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অধ্যাত্মচেতনার আধারে সুষ্ঠু সমন্বয় লাভ করেছিল। এই সমন্বিত অধ্যাত্মোপলব্ধির সঙ্গে প্রাচীন সাধনার কোনো পদ্ধতিগত সম্পর্ক নেই বটে, তবে মূলগত অনুভূতির দিক থেকে এক গূঢ় কিন্তু পরোক্ষ সারূপ্য ও সাযুজ্য বর্তমান। আর সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনাতেও অনেকাংশে প্রাচীন অধ্যাত্মভাবনা ছায়াপাত করেছে— একথা অনস্বীকার্য।

ভাবের দিক থেকে শুধু নয়, রূপের (Form) দিক থেকেও পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে চর্যাপদের পরোক্ষ যোগ লক্ষ করা যায়। কয়েকটি চরণের সমন্বয়ে একটি ভণিতা যুক্ত যে কাব্যরূপ চর্যাতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলিতে তারই অনুবর্তন ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের মূল সুর যে গীতিধর্মিতা তারও সূচনা চর্যাপদেই। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ এক মহৎ ঐতিহ্য, নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সেই ঐতিহ্য অদ্যাবধি বহমান।

৩.৭ কয়েকটি নির্বাচিত ছত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

আমরা এবার চর্যাপদের কিছু বিশেষ পঙ্‌ক্তির অর্থ এবং তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করছি। তবে পাঠ্যতালিকার দিকে নজর রেখে আমরা আমাদের এই বিশ্লেষণ শুধু কাহ্নপাদ ও ভুসুকুপাদ এই দুজন চর্যাকারের রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

(ক) তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।।

এই পঙ্‌ক্তিটি ৬ সংখ্যক চর্যার অন্তর্গত। চর্যাটি ভুসুকুপাদ রচিত। চর্যাটিতে হরিণ-হরিণী ও মৃগয়ার রূপকে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক নির্দেশিত চিত্তের সাংবৃতিক এবং পারমার্থিক এই দুই অবস্থা ও অবস্থান্তরের বলা হয়েছে। সাংবৃতিক চিত্ত চঞ্চলতার জন্য হরিণরূপে এবং পারমার্থিক চিত্ত হরিণী রূপে কল্পিত। সাংবৃতিক চিত্ত হরিণের চারদিকে কালরূপ শিকারি যখন বন্ধন সৃষ্টি করে তখন নৈরাত্মাকে গ্রহণ করে কীভাবে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এই চর্যায় আছে তারই বর্ণনা। অবিদ্যা প্রভাবিত চিত্তের দুর্গতি দেখে ভুসুকু গুরুরবচন রূপ বাণ দ্বারা চিত্তকে প্রহার করেন। এই প্রহারে প্রবুদ্ধ হয়ে চিত্ত হরিণ তার পারমার্থিক সহজরূপ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পানাহার রূপ জাগতিক ভোগ ত্যাগ করে হরিণীরূপা নৈরাত্মার কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু অশুদ্ধ অবস্থায় এই নৈরাত্মার সন্ধান মেলে না, তাই চিত্তহরিণের কাছে নৈরাত্মা হরিণীর আবাস অজ্ঞাত।

(খ) "আলিত্রঁ কালিত্রঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমল ভইলা।।"

উল্লিখিত এই অংশটি কাহ্নপাদ রচিত ৭ সংখ্যক পদের অন্তর্গত। এর বাচ্যার্থ হচ্ছে— আলিতে কালিতে পথ রুদ্ধ করল। তা দেখে কাহ্ন বিমন হলেন। গূঢ়ার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে দেখি এখানে সত্যের সাংবৃতিক ও পারমার্থিক এই দুটি রূপের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ চিত্তে সত্যের সাংবৃতিক রূপই ধরা পড়ে, জগৎকে তখন বহুধাবিভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু যিনি পরমার্থবিদ যোগী তাঁর এই ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। দেশজ্ঞান-কালজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান দূর হলে মহাসুখের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম পঙক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যা দুভাবে করা যেতে পারে— প্রথমত, আলিকালি অর্থাৎ লোকজ্ঞানের দ্বারা পরমার্থের পথ রুদ্ধ হতে কাহ্ন বিমনা হলেন। দ্বিতীয়, আলি ও কালি অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়-নাড়ীদ্বয়কে একত্র করে অবধূতীমার্গকে রুদ্ধ বা দৃঢ় করা হল। তা দেখে কাহ্ন বিমন অথবা বিশুদ্ধমনা হলেন।

(গ) জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ।।

এই পঙ্‌ক্তিটি ৯ সংখ্যক চর্যার অন্তর্গত। কাহ্নপাদ রচিত। আলোচ্য চর্যায় মত্ত হস্তীর উৎপ্রেক্ষায় মহাসুখ মত্ত প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত চরণে বলা হয়েছে হস্তিনীর আসঙ্গহেতু হস্তীগণ যেমন আসক্তিমদ বর্ষণ করে সাধক কাহ্নের হস্তী চিত্তও তেমনি নৈরাত্মা হস্তিনীর আসঙ্গলাভহেতু তথতারূপ মদ বর্ষণ করছে। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে তিনি ভাব ও অভাবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। ভাব ও অভাবে কোনো পার্থক্য না থাকায় সর্বত্র পারমার্থরূপ তথতা বিদ্যমান। অনুভব অভ্যাসের দ্বারা এই তথতা আহরণ করে অবিদ্যাজাত মিথ্যা জ্ঞান অক্লেশে দূর করা যায়।

(ঘ) এক সো পদমা চৌসটঠী পাখুড়ী।।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।

আলোচ্য চর্যার সংখ্যা ১০। এটিও কাহ্ন বা কাহ্নপাদের রচনা। এখানে সহজানন্দকে কাহ্নপাদ নারীরূপে কল্পনা করেছেন। সহজানন্দ ইন্দ্রিয়াতীত বলে উপমান রমণীও এখানে অস্পৃশ্য ডোম্বী। নৈরাত্মার সঙ্গে কাপালিক কাহ্নের লীলাই এই গানের মুখ্য বিষয়। নৈরাত্মা স্পর্শাতীত ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য বটে কিন্তু কাহ্নও সমস্ত লোকাচারের প্রভাবমুক্ত হয়ে মহাসুখ পালনের উপযোগী হয়েছেন। তাই তিনি অস্পর্শা নৈরাত্মার সঙ্গে মিলনে উৎসুক। নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয়েই চৌষট্টি দলবিশিষ্ট পদ্মের উপর নৃত্য করছেন, অর্থাৎ কাহ্ন পরিশুদ্ধমার্গে আরূঢ় হওয়ায় তাঁর নির্মাণচক্রে কল্পিত নাভিকমলে বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটেছে।

(ঙ) "তিশরণ নারী কিঅ অঠকমারী।
নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেলি।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ।।"

উল্লিখিত এই অংশটি চর্যার ১৩ সংখ্যক পদ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি কাহ্নপাদের পদ। এই বাচ্যার্থ হচ্ছে— আটকে মেরে ত্রিশরণকে নৌকা করা হ'ল। [এখন] নিজ দেহ [হ'ল] করুণা (অর্থাৎ পুরুষ) এবং শূন্য [হ'ল] মহিলা। মায়াস্বপ্নের মতো এই ভবজলধি পার হওয়া গেল। স্রোতের মধ্যে আমি তরঙ্গ অনুভব করলাম।

এর গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করলে দেখি পদটিতে রূপ ও রূপকার্থ প্রায় এক হয়ে গেছে। এখানে নৌকা হ'ল মহাসুখকায়ের প্রতীক। কায়-বাক-চিত্তকে চতুর্থ আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করে নৌকা গঠিত হয়েছে। এখানে করুণা ও শূন্যতা যুগনদ্ধ, অষ্ট বুদ্ধৈশ্বর্য এর অনুগত। এর কায় অর্থাৎ দেহ নিয়ে মায়াময় ভবসাগর পার হতে হয়। ধর্মকায়ে (মঝবেণী) পরমানন্দের তরঙ্গ অনুভূত হয়।

(চ) "ভব নির্ব্বাণে পড়হমাদলা।
মণপবন বেনি করণ্ড কসালা।।
জঅ জঅ দুংদুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।"

এই অংশটি চর্যার ১৯ সংখ্যক পদের অন্তর্গত। এটিও কাহ্নপাদের পদ। এর বাচ্যার্থ হচ্ছে— ভব ও নির্ব্বাণকে পটহ মাদল করা হ'ল, মন-পবন হল ঝাঁপান পাল্‌কি। জয় জয় করে দুন্দুভি শব্দ উঠল। কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চললেন।

এর গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করলে দেখি বর্তমান পদে বিবাহ ও বরযাত্রার বাদ্যযন্ত্রের রূপকে পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধক কাহ্ন এখানে বর এবং অপরিশুদ্ধাধূতী বা অবিদ্যারূপিনী ডোম্বী বধু। অবিদ্যাবধূকে বিবাহ করলে অর্থাৎ এ অবিদ্যার প্রবাহ ভঙ্গ করলেই পুনর্জন্মহীন নির্বাণলাভ হয— বর্তমান চর্যায় এই তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে। কাহ্ন এখানে বলেছেন যে, তিনি ভবনির্বাণকে পটহ-মাদলের মতো বিকল্পাত্মক বা পরস্পরে-সম্পৃক্ত জ্ঞান করেছেন এবং মন-পবণ এই দুইকে সংহত করায় তাঁর দেহে শূন্যতা-করুণার অভেদ মিলন ঘটেছে। এই অবস্থায় কাহ্ন অবিদ্যারূপিনী ডোম্বীকে বিবাহ করেছেন অর্থাৎ চিত্তে অবিদ্যার প্রবাহ নষ্ট করেছেন, ফলে অনাহত দুন্দুভি শব্দ বা শূন্যতাশব্দ উত্থিত হচ্ছে।

(ছ) জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।
হাণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পা ঘর ণ পইস হিণি।
মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।।

এই পঙ্‌ক্তিটি ২৩ সংখ্যক চর্যার। রচনাকার ভুসুকপাদ। বর্তমান চর্যায় শিকারের রূপকে অবিদ্যাহনন ও সহজসুখ লাভ করার কথা আভাসিত হয়েছে। মহাসুখচক্রে প্রবেশ করতে গেলে চিত্তেকে একমুখী করতে হবে। কিন্তু পঞ্চবিষয়ের ভ্রান্ত জ্ঞান জড়িত থাকলে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হয়। চিত্ত যখন অবিদ্যার প্রভাবমুক্ত হয় তখন তত্ত্বাজ্ঞানের আলোকে প্রভাত হয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান থাকলে চিত্ত রাত্রির মতো তিমিরাচ্ছন্ন থাকে। অবিদ্যার প্রভাবেই চিত্ত মিথ্যা মায়াজাল সৃষ্টি করে। তাই মই মায়াজাল অপসারিত করলেই মায়ারূপ হরিণীকে ধ্বংস করা যায়।

(জ) আইএ অণুঅনা এ জগরে ভারতিএ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই।।

আলোচ্য ৪১ সংখ্যক চর্যাটি ভুসুকুপাদ কর্তৃক লিখিত। এই চর্যায় জগৎসংসারের প্রতীয়মান অস্তিত্বকে অনাদি অবিদ্যাজাত এক ভ্রমাত্মক চিত্তবিকল্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত শূন্যবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। সিদ্ধাচার্য ভুসুকু বলেছেন যে, যে জগৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবগত হওয়া যায় তা আদৌ সৃষ্টি হয়নি, জগৎ সম্পর্কে আমাদের অনুভব রজ্জুতে সর্পদর্শনের মতোই ভ্রমাত্মক। রজ্জু যেমন সর্পবৎ দংশন করতে পারে না, ঠিক তেমনই জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানেরও কোনো প্রকৃত উৎস নেই। জগতে সকল জিনিসেরই স্বভাব মিথ্যাপূর্ণ।

৩.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা চর্যাপদের আলোচনা শেষ করেছি। আসুন একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক আমাদের আলোচনার দিকে।

আমরা দেখলাম যে চর্যার সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। এগুলি ২৩ জন কবির রচনা। কবি কাহ্নপাদ কে বা কজন এবিষয়ে সর্বজনসম্মত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আমরা একটা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে কাহ্নপাদের পদগুলিকে বিন্যস্ত করেছি। ভুসুকুপাদের রচিত পদগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা তাঁর বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকে চিহ্নিত করেছি। রূপক ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে উভয় কবিই সমকালীন বাস্তব এবং নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুকেই নির্ভর করেছেন। চর্যার গানগুলি বস্তুত সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রাকরণিক নির্দেশকেই ধরে রেখেছে। তাই এগুলিতে ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের বিশেষ প্রাধান্য সূচিত হয়েছে।

প্রথম সৃষ্টি হিসাবে চর্যাপদের কাব্যিক আবেদন যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এগুলিতে ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজবাস্তবতা এবং দৈনন্দিন জীবনের অনেক অনুপুঙ্খ উপাদান। বর্তমান কালের সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল সম্প্রদায় এবং এঁদের সাহিত্যেও অদ্যাবধি চর্যাপদের যথেষ্ট প্রভাব ক্রিয়াশীল।

৩.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ঃ দীপঙ্করের আর এক নাম অতীশ। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন, এর কিছু কিছু তিব্বতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও 'চর্য্যাসংগ্রহপ্রদীপ' নামক গ্রন্থে অতীশ-রচিত অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ পাওয়া যায়।

আলি-কালি ঃ চর্যায় আলি-কালি যথাক্রমে আলোকজ্ঞান ও আলোকভাস অথবা চন্দ্রসূর্য।

মহাযান ঃ বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখার অন্যতম শাখা। মহাযানীদের আদর্শ ছিল অপেক্ষাকৃত উদার।

হীনযান ঃ বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায়। হীনযানী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকেরা ঠিক মায়াবাদী নন, বরং বলা চলে বাস্তববাদী।

কায়াসাধনা ঃ তন্ত্রোক্ত দেহকেন্দ্রিক এক কার্যকরী সাধনপন্থা।

ইড়া-পিঙ্গলা ঃ দেহের বামদিকে অবস্থিত নাড়ি হল ইড়া আর ডানদিকেরটি পিঙ্গলা।

বামগা নাড়ি ঃ দেহের বামদিকের নাড়িকে বলা হয় বামগা নাড়ি।

দক্ষিণগা নাড়ি ঃ দেহের ডানদিকের নাড়িকে বলা হয় দক্ষিণগা নাড়ি।

শূন্যতা ঃ জাগতিক কোনো বস্তুর নিজস্ব কোনো ধর্ম বা স্বরূপ নেই, প্রত্যেকেই তার বর্তমান স্বরূপের জন্য অন্য কোনো স্বরূপের ওপর নির্ভরশীল সুতরাং অস্তিত্বহীন— এই জ্ঞানই শূন্যতা।

করুণা ঃ বজ্রযানে চিত্তের সাধারণ নাম করুণা।

প্রজ্ঞা ঃ পরম জ্ঞান।

উপায় ঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে উপায় শব্দটি পুরুষের রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বোধিসত্ত্বাবস্থা ঃ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ভগবান বুদ্ধের অনুরূপ মানসিক অবস্থায় বিচরণ।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ অচিন্ত্য, অনন্ত শক্তিশালী পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ এবং সেই শক্তি-পরিণত বস্তুসমূহের সঙ্গে পরতত্ত্বের যে অচিন্ত্য এবং যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ তাই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।

মায়াবাদী দর্শন ঃ শঙ্করাচার্য কৃত দর্শন, যাতে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জীব ও জগৎকে মিথ্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ঃ একই সঙ্গে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ সম্পর্কিত তত্ত্ব। এই মতবাদ অনুযায়ী জীব ও জগতের মধ্যে ভেদও সত্য অভেদও সত্য।

তেঙ্গুর তালিকা ঃ পি. কর্ডিয়ের রচিত বৌদ্ধতন্ত্রের তালিকা।

বেদান্ত ঃ ব্যাস প্রণীত দর্শনগ্রন্থ, এতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নির্ণীত হয়েছে।
রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ঃ শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য। এই কাব্যে শূন্যমূর্তি ধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম থেকে ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও শিবের উদ্ভব, প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

গোরক্ষনাথ ঃ নাথ ধর্মের গুরু পরম্পরায় তৃতীয় স্থানাধিকারী ব্যক্তিত্ব। গোরক্ষনাথকে শিবের অবতার বলে মনে করা হয়।

খনার বচন ঃ খনা নামে প্রাচীনকালের জনৈক বিদুষী রমণী কর্তৃক লিখিত বাংলার গ্রামজীবনে প্রচলিত নীতি-নির্ধারক শ্লোকসংগ্রহ।

উপনিষদ ঃ বৈদিক যুগের ধর্মীয় সাহিত্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্পর্কে এতে গভীর তত্ত্বকথা আছে। বেদের 'ব্রাহ্মণ' ভাগের শেষ অংশ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড।

ODBL ঃ ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ The Origin and Development of the Bengali Language।

কবির ঃ বিখ্যাত সন্ত। ইনি বিষ্ণুর উপাসন ছিলেন। কবিরের উপদেশমূলক দোঁহাগুলি সাহিত্যগুণসম্পন্ন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত ও এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায় কবিরপন্থী নামে অভিহিত।

দাদু ঃ বিখ্যাত সাধক। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম সম্ভবত মহাবলী। মুচির ঘরে তাঁর জন্ম। সাধনার বলে তিনি সাধকে পরিণত হন ও এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

বাউল ঃ ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সংস্কার থেকে মুক্ত সাধকসম্প্রদায়, যাঁরা আধ্যাত্মিক গান গেয়ে তাঁদের সাধনা প্রচার করেন।

৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। ভুসুকুপাদের একটি পদে আছে ঃ

'মা আঝাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।'

অন্য একটি পদে আছে ঃ

'তরঙ্গতে হরিণীর খুর ন দীসঅ'

হরিণীর মুক্তি ও বন্ধনদশার এই চিত্রে কবির কী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বুঝিয়ে দিন।

২। চর্যাগান শুধু তত্ত্বকথার দিক থেকে বিচার্য নয়, এর পশ্চাৎপটে যে কবিমনের স্বভাব সৌন্দর্য রয়েছে তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন।

৩। পদকর্তা ভুসুকুপাদ 'অহেরি' (শিকারি)—ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সাধ্য বিষয় ও তত্ত্বভাবনাকে কীভাবে প্রকাশ করেছেন এই বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করে কবিকৃতির পরিচয় দিন।

৪। দার্শনিক চিন্তা ও সাধনা প্রকরণের ইঙ্গিত যেমনই হোক না কেন কাহ্নপাদের

কিছুসংখ্যক পদ ভাবসমৃদ্ধ স্বাদু কবিতা হয়ে উঠেছে— এই মন্তব্যের সমর্থনে আপনার বক্তব্য নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন।

৫। আপনার পঠিত চর্যাপদে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের কী কী উপকরণ পাওয়া যায়, আলোচনা করুন।

৬। চর্যাপদের পাঠ আবলম্বনে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

৭। আপনার অধীত পদগুলো অবলম্বনে চর্যাপদে রূপক ব্যবহারের তাত্ত্বিক মূল্য নির্দেশ করুন। এর দ্বারা কোনো সাহিত্যিক উৎকর্ষ ঘটেছে, কি না আলোচনা করুন।

৮। 'কাহ্নপাদের গীতে কবিতা আছে, নাটকীয়তা আছে, আছে ছোটগল্পের দীপ্তি ও লোকচরিত্রের সমালোচনা'— মন্তব্যটির সারবত্তা প্রতিপাদন করুন।

৯। চর্যাগীতির কিছু পদে নারীর সঙ্গে কবির মিলনের কথা পরিস্ফুট হয়েছে। এই অনুষঙ্গ সাধনমার্গের বিশেষ ধারার ইঙ্গিতবাহী। কয়েকটি পদ বিশ্লেষণ করে এই বিষয়ে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

১০। সাধনতত্ত্ব ও ভাবের অভিন্নতা সত্ত্বেও কাহ্নপাদ ও ভুসুকপাদের পদে রূপকল্প সৃষ্টি, ভাষাবিন্যাস ও ভাবের উপস্থাপনার সুস্পষ্ট পার্থক্য উভয়ের কবি ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পাঠ্যাংশ থেকে সূত্র নির্দেশ করে মন্তব্যটি বিচার করুন।

১১। বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবনা ও তত্ত্বমুখীনতা সত্ত্বেও রচনার গুণে ভাষার পারিপাট্যে ও ভাবের রূপায়ণে চর্যাগীতিগুলি কবিত্বরসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে— উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করুন।

১২। 'চর্যাগান কবিতা হলেও তত্ত্ব ও দর্শনের দিক থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়'— পঠিত পদ অবলম্বনে সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় চর্যাপদের তত্ত্বদর্শন বুঝিয়ে দিন।

১৩। পঠিত যে কোনো একটি চর্যার সমালোচনামূলক পরিচয় দিন।

১৪। চর্যাগীতির কবিত্ব নির্ণয়ে প্রধানত কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত? উদ্ধৃতিসহ এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৫। 'চর্যাগান বাংলাদেশে রচতি এবং বাঙালির রচনা'— এই মন্তব্য চর্যাপদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

১৬। কাহ্নপাদের রচিত পদগুলিতে তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বের যেসব ইঙ্গিত পাই তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করুন।

১৭। চর্যাপদের অনেকগুলি পদে দেশ-কাল-পাত্রের যে বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিন।

১৮। চর্যাপদ ধর্মতত্ত্ব হলেও এর যথেষ্ট সাহিত্যমূল্য আছে। পঠিত পদগুলির সাহায্যে মন্তব্যটি পরিস্ফুট করুন।

১৯। ভুসুকু রচিত পদগুলির রূপক, তত্ত্ব ও ভাষাভঙ্গি বা রচনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করুন।

২০। কাহ্নপাদের নামে চিহ্নিত পদগুলিতে বস্তু-বিন্যাস, ভাব-ব্যঞ্জনা ও ভাষা ব্যবহারে স্তরভেদ লক্ষ করা যায় কি? এই সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করে উপযুক্ত সূত্র নির্দেশসহ কাহ্ন নামাঙ্কিত একাধিক কবির অস্তিত্ব সম্ভাবনা বিষয়ে মতামত দিন।

২১। ভুসুকুপাদ অথবা কাহ্নপাদের যে কোনো একটি পদ বেছে নিয়ে—

(ক) তত্ত্ব বিবর্জিতভাবে পদটির সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করুন।

(খ) তত্ত্বজ্ঞান চর্যাগীতি পাঠের আবশ্যিক শর্ত কি না বিচার করুন।

(গ) চর্যাগীতিতে রূপক-রূপকল্প সৃষ্টির সার্থকতা ও উপযোগিতা নিরূপণ করুন।

২২। চর্যাগানগুলির ভাষা যে প্রাচীন বাংলা তা তথ্যাদিসহ প্রমাণ করুন।

২৩। ভুসুকুর নামে চিহ্নিত চর্যার পদগুলো অবলম্বনে কবি হিসাবে ভুসুকুর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

২৪। বিভিন্ন পদকর্তার ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদে ও তত্ত্বপ্রতীকের আবরণে চর্যাগীতিকায় মূলত একটি ভাবসূত্র প্রকাশিত হলেও রচনার গুণে পদগুলি ক্লান্তিকর ও গতানুগতিক মনে হয় না। পাঠক্রমভুক্ত পদগুলো আলোচনা করুন।

২৫। কাহ্নপাদের পাঠ্য চর্যাগানগুলির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

২৬। কাহ্নপাদের গীতগুলি সাধনতত্ত্বমূলক হলেও এগুলির সাহিত্যমূল্য কম নয়— আলোচনা করুন।

২৭। ভুসুকুপাদের কিছু সংখ্যক পদে 'রাউতু' ভণিতা তাৎপর্যবাহী কি না আলোচনা করুন। কবির পদ বিশ্লেষণ করে রূপকল্প সৃষ্টিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।

২৮। চর্যাপদে ডোম্বী, চণ্ডালী ও শবরীর স্বরূপ পরিচয় পরিস্ফুট করুন। ভুসুকু ও কাহ্নের পদে এই নারীশক্তির মানবিক ও ভাবগত দিকটি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

২৯। চর্যাগীতি পদাবলির মধ্যে ধৃত কাহ্নের নামে চিহ্নিত পদের ভাবগত অর্থ ও বিন্যাস-বৈশিষ্ট্য বিচার করে একাধিক কাহ্নের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয়— এই বিষয়ে যুক্তি সমর্থিত অভিমত ব্যক্ত করুন।

৩০। সংক্ষিপ্ত উত্তর/টীকা লিখুন ঃ

(ক) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন ঃ ভুসুকুপাদ অথবা কাহ্নপাদ

(খ) টীকা লিখুন ঃ হরিণা-হরিণী ; আলি-কালি ; জিনউর।

(গ) 'কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস'— পদটির তাৎপর্য নির্দেশ করুন।

(ঘ) 'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা'— তাৎপর্য নির্দেশ করুন।

৩.১১ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

১। চর্যাগীতি পদাবলি— সম্পা সুকুমার সেন।

২। চর্যাগীতি পরিচয়— সত্যব্রত দে।

৩। চর্যাপদ— তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৪। চর্যাগীতি কোষ— নীলরতন সেন।

৫। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি— শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৬। চর্যাগীতির ভূমিকা— জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

৭। চর্যাপদ— অতীন্দ্র মজুমদার।

৮। চর্যাগীতি পরিক্রমা— ড. নির্মল দাশ।

* * *

চতুর্থ বিভাগ
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (জন্মখণ্ড ও রাধাবিরহ)

বিষয় বিন্যাস ঃ

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

  ৪.০.১ নামসমস্যা

  ৪.০.২ রচনাকাল

  ৪.০.৩ কাব্যের কবি ও চণ্ডীদাস সমস্যা

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ জন্মখণ্ড ঃ ভাগবতের অনুসরণ

৪.৩ চরিত্রবিচার

  ৪.৩.১ রাধা

  ৪.৩.৩ কৃষ্ণ

  ৪.৩.৩ বড়াই

৪.৪ সমাজচিত্র

৪.৫ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাট্যগুণ

৪.৬ 'রাধাবিরহ' প্রক্ষিপ্ত কি না বিচার

৪.৭ বৈষ্ণব পদাবলি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনামূলক আলোচনা

৪.৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা

৪.৯ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.১০ প্রাসঙ্গিক টীকা

৪.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৪.১২ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

আদি মধ্যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী গবেষক পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বাশুলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক এক বৃহৎ কাব্য আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পুথিটি, আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জনের সুযোগ্য সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** নামে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যের প্রাচীনতা ও বড়ু চণ্ডীদাস্যের যথার্থ পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হল। আসুন আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃত নাম, কাব্যটির রচনাকাল এবং চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

৪.০.১ নাম সমস্যা

আবিষ্কৃত পুথিটির আখ্যাপত্র এবং পুষ্পিকা নষ্ট হওয়ার ফলে কাব্যটির নাম, রচনাকাল, পুথি নকলের সন তারিখ সম্বন্ধে কোনো সঠিত তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্পাদক কাব্যটিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কাব্যটির যথার্থ নাম"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নয়। কাব্যের পুথির কোথাও কাব্যের নাম উল্লিখিত হয়নি। আবিষ্কারক কাব্যটির বিষয়বস্তুর বিচারে এর নাম দিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। তবে কাব্যটির প্রকৃত নামের একটি পরোক্ষ হদিস পাওয়া গেছে। পুথিটির মধ্যে প্রাপ্ত একটি চিরুকুটে কাব্যটিকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য কারো কারো মতে, চিরকুটের 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' শব্দটি শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'কে নির্দেশ করছে। কিন্তু সেরকম কোনো ইঙ্গিত চিরকুট থেকে পাওয়া যায় না। তাই অন্য কোনো বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে একে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বলা যেতে পারে। অবশ্য সম্পাদক প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটিই এখন বহুল প্রচলিত।

৪.০.২ রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নিয়েও মতভেদ কম নয়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পুথিটির কাগজ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে একে তত প্রাচীন বলে স্বীকার করতে আপত্তি করেন। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু পরে আরও দুটি তুলোট কাগজের পুথি আবিষ্কার করেন, যেগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির আংশিক অনুলিখন। এর মধ্যে দ্বিতীয় পুথিটির অনুলিখনের কাল ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, শতাধিক বৎসর পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপ্রচলিত হয়ে যায়নি।

পুথির প্রাচীনতার বিষয়ে বলা যায় যে, এটি সপ্তদশ শতকের আগেই রচিত হয়েছে। পুথির মধ্যে প্রাপ্ত রসিদে ১০৮৯ সালের উল্লেখ আছে— যা ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ বোঝায়। কবি নিশ্চয়ই এর অনেক আগে এটি লিখেছিলেন। প্রাচীন লিপি বিশারদ এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Paleography বা প্রত্নলিপির সাহায্যে এর লিপি পরীক্ষা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে এটি পঞ্চদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে অনুলিখিত হয়েছিল। অতএব মূল কাব্যটি নিশ্চয়ই এরও আগে লিখিত হয়েছিল। অনুলিখিত পুথিটি বাংলা অক্ষরে এবং বাংলা ভাষায় রচিত অদ্যাবধি প্রাপ্ত পুথির মধ্যে প্রাচীনতম। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং রাধাগোবিন্দ বসাকও লিপিতত্ত্বের সাহায্যে প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণের পুথির সঙ্গে অক্ষর মিলিয়ে এর রচনাকালকে আরও ২০০ বছর আগের বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে পুথিটি যে চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে লেখা এ বিষয়ে সকলেই একমত।

৪.০.৩ কাব্যের কবি ও চণ্ডীদাস সমস্যা

কাব্যের কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। ভণিতায় কবি এভাবেই নিজের নামোল্লেখ

করেছেন। কাব্যের ভিতরেও কবি নিজেকে এই নামে অভিহিত করেছেন। সুতরাং তাঁর নাম যে বড়ু চণ্ডীদাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবি শাক্ত দেবী বাশুলীর সেবক ছিলেন— একথাও ভণিতা থেকে জানা যায়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে অন্য এক চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান— যিনি পদাবলির চণ্ডীদাস। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পর একই নামে দুই কবির অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হল।

কেউ কেউ মনে করেন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি প্রামাণিক ও প্রাচীন কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য এবং কবি চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ব অর্থাৎ আদি-মধ্যযুগের কবি। তাঁদের মতে, দীন, দ্বিজ, পদাবলির চণ্ডীদাস এঁরা সবাই চৈতন্য পরবর্তী যুগের, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস অবশ্যই চৈতন্যপূর্ব যুগে আবির্ভূত।

অন্য মতে এই কাব্য আধুনিক যুগে রচিত— স্থূল রুচির গ্রাম্য ঝুমুর জাতীয় লোকসাহিত্য শ্রেণির রচনা। চৈতন্যদেবের পক্ষে কখনোই এরূপ অশ্লীল কাব্য পাঠে রুচি হওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা বলেন চণ্ডীদাস একজনই— যাঁর সাহিত্য বৈষ্ণবদের সাধনপথের অন্যতম অবলম্বন।

আবার কেউ কেউ এই দুই মতকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চণ্ডীদাসের প্রথম যৌবনের রচনা বলেই তা আদিরসযুক্ত, অশ্লীল। একই চণ্ডীদাস পরিণত বয়সে বৈষ্ণব পদাবলির পদ রচনা করেন— যেগুলি ভক্তি ভাবপূর্ণ, আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত।

মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে ১৯ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব সমাজে চণ্ডীদাসের নামে পদাবলি এবং রামীর সঙ্গে প্রেম-সম্পর্কের গল্প খুবই প্রচলিত ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ুর উল্লেখ একমাত্র সনাতন গোস্বামীর ভাগবতের টীকা বৈষ্ণবতোষণীতে পাওয়া যায়। তাছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'তেও এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গীতগোবিন্দ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ও রায় রামানন্দের নাটকাদির রসাস্বাদন করতেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস হওয়াই সম্ভব। তবে চৈতন্য তিরোভাবের পরে যেখানে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে পদাবলির চণ্ডীদাসকেই বোঝানো হয়েছে। তদুপরি বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এমন অনেক অপদার্থ পদ পাওয়া গেছে এবং সেগুলি সব যে একই চণ্ডীদাসের রচনা নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক বসন্তরঞ্জন এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনে মিলে প্রাপ্ত পুথির লিপি বিচার করে এর কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে আদিতম চণ্ডীদাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পরিশেষে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে বলা যায়— 'এখনো পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস সমস্যার নির্ভরযোগ্য কোনো মীমাংসা হয় নাই, নতুন উপাদান আবিষ্কৃত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহার সম্ভাবনা নাই।'

আমরা আমাদের এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এবারে আমরা কাব্যের নাট্য লক্ষণ, কাব্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র, ভাষাভঙ্গি, কাব্যের চরিত্র বিচার ইত্যাদি প্রসঙ্গ একে একে আলোচনা করব।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগকে সমালোচকগণ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন— আদি-মধ্যযুগ ও অন্ত্য-মধ্যযুগ। প্রাচীনযুগের চর্যাপদের পর আদি-মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটিও বংলা ভাষায় লিখিত কৃষ্ণকথামূলক কাব্য হিসাবে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ একটি কাব্য। আমরা এই উপবিভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হব। এই কাব্যের মানদণ্ডেই নির্ণয় করব তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলার সামাজিক অবস্থা। কাব্যের কবি ও চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোকপাত করব; কবির চরিত্রচিত্রণ-প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণের নিরিখে অনুসন্ধান করব বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যগত অনুপ্রেরণার মূল উৎস। বৈষ্ণব পদাবলি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনামূলক আলোচনা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালীন আদি-মধ্যযুগের বাংলার সমাজ পরিবেশের প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা অনুসন্ধান করব এই কাব্যে সমালোচক কথিত নাট্যগুণের; চিহ্নিত করব আদি-মধ্যযুগের বাংলাভাষার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ।

৪.২ জন্মখণ্ড ঃ ভাগবতের অনুসরণ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বড়ু চণ্ডীদাসের মতো আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন এমন এক কবির আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়কর। গভীর বাস্তবজ্ঞান, মানব চরিত্রের অনুপুঙ্খ রূপায়ণ, প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ উপস্থাপনা, নাটকীয়তার সঙ্গে গীতিধর্মের সংযোগ, উপমা এবং অলংকার প্রয়োগের অসাধারণ নৈপুণ্য, নিসর্গচিত্রের সুদক্ষ ব্যবহার ও জীবনরস রসিকতা— সব মিলিয়ে বড়ুর এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনি বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনির প্রথম রোমাণ্টিক কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যটির কাঠামো পরিকল্পনায় দুটি উপাদান গ্রহণ করেছেন। একদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলির রাধাকৃষ্ণ কাহিনি এবং অন্যদিকে লোকজীবনে প্রকীর্ণ কৃষ্ণকথার গ্রামীণ লোকায়ত কাহিনি। যদিও এখানে কাব্যত্বের সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশ্রিত হয়েছে নাটকীয়তা— তবু অস্বীকারের উপায় নেই যে একটি রাখালিয়া প্রেমকাহিনিকে অবলম্বন করে বড়ু চণ্ডীদাসের কবি প্রতিভা প্রশংসনীয় সার্থকতা অর্জন করেছে।

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গটি মনে রেখেই বলা যায় যে, লোকজীবনের কবি হলেও বড়ুর সংস্কৃত ও পুরাণ জ্ঞান ছিল অসাধারণ সমৃদ্ধ। তাঁর পুরাণ জ্ঞানের নানা পরিচয়, যেমন সংস্কৃত পুরাণ থেকে গৃহীত ভাব-বিষয়-শব্দ-অলংকার এবং জয়দেবের কাব্য ও কালিদাসের রচনা থেকে ঋণ গ্রহণের প্রমাণ এই কাব্যে যথেষ্ট আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ড থেকেই কবির এই সংস্কৃত পুরাণ অনুসরণের সাক্ষর মূর্ত হয়েছে এ কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান কাহিনি ভাগবত থেকে সংকলিত হয়েছে।

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, যে এ কাব্যে বড়ুর অন্বিষ্ট ছিল একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিলব্ধ পৌরাণিক প্রভাব এবং অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক কাহিনি নির্ভর গ্রামীণ সংস্কৃতি। কিন্তু আলোচ্য জন্মখণ্ডে দেখি গ্রাম্য লোককথার কোনো চিহ্ন নেই, এখানে তিনি যেন সম্পূর্ণই পুরাণের, বিশেষত ভাগবতের দ্বারা প্রভাবিত। উক্ত পুথির প্রথম শ্লোকটি ভাগবত থেকে নেওয়া হয়েছে, যার ভাবার্থ হল— পৃথিবী গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করলেন। তৎশ্রবনে দেবতাবৃন্দ সত্বর কংসনিধনের জন্য মনোযোগ দিলে। বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত প্রথম দুটি পংক্তিতেও এই ভাবেরই অনুসরণ লক্ষ করা যায়—

"সবদেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।।"

অর্থাৎ পুরাণের মতোই পৃথিবীর ভারমোচনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিলেন একথা বড়ু চণ্ডীদাসও লিখেছেন। এবার লক্ষ করতে হবে যে, জন্মখণ্ডের এই উদ্দেশ্য পরবর্তী খণ্ডগুলি থেকে উপসংহার পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে কিনা। এর পূর্বে জন্মখণ্ডে বর্ণিত বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

এই গ্রন্থের জন্মখণ্ডে আমরা দেখলাম বিষ্ণু জন্মালেন অবতার হয়ে— উদ্দেশ্য কংস বধ। কৃষ্ণ যে বসুদেবের অষ্টম পুত্ররূপে ধরায় অবতীর্ণ হলেন সে কথা কংস জানতে পারলেন নারদের কাছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের কারণে লক্ষ্মী রাধারূপে পদুমার গর্ভে সাগর গোয়ালার ঘরে জন্ম নিলেন। দেবতাদের অভিপ্রায়েই নপুংসক আইহন হলেন রাধার স্বামী— বড়ু চণ্ডীদাস একে ভাষা দিলেন—

"কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।।
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার।।
তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে।।"

জন্মখণ্ডের এ অংশটুকু এবং কংসের কৃষ্ণকে বধের নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবনের সমস্তটুকুই পুরাণকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এভাবে পুতনা রাক্ষসী বধ, যমল-অর্জন বধ, অশ্বরূপী দৈত্য কেশিকে নিধন— সব ঘটনাই পুরাণানুসারী। শুধু বড়াই চরিত্রের প্রবেশ এবং রাধার সঙ্গে তার সখ্য স্থাপন— এই ঘটনা কিন্তু পুরাণে নেই। এখানে লোকায়ত কাহিনির প্রভাব। এইভাবে পুরাণের একটি আবহের মধ্য দিয়ে চণ্ডীদাস গ্রামীণ কৃষ্ণকথায় প্রবেশের সূচনা করলেন। ভাগবতে বা বিষ্ণুপুরাণে রাধা চরিত্র একেবারেই নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাই প্রধান। তাই এখানে পুরাণোক্ত লীলাবর্ণনার তুলনায়, সম্ভবত গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত অপৌরাণিক কাহিনির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণ, ভাগবত এবং জয়দেবের পদ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে এবং কৃষ্ণ, বলরাম, বড়াই প্রভৃতির মুখে কৃষ্ণের পৌরাণিক অবতারত্বের বর্ণনা করে মাঝে মাঝেই পুরাণের সঙ্গে একটা সম্পর্কসূত্র আগাগোড়াই বজায় রাখা হয়েছে।

এই কাব্যের জন্মখণ্ডে কাহিনির নাট্যধর্মিতা এবং দ্রুত গতিবেগ অত্যন্ত বিস্ময়কর। প্রথমেই দেবতাদের সভা, তারপরেই শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার জন্ম, নারদের বিবরণ দান, তারপরেই শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার বড়ো হওয়ার সংবাদ, কৃষ্ণকে বধের জন্য কংসের বিভিন্ন চেষ্টা, তারপরই আবার বড়াইয়ের আগমন— সমস্ত ঘটনা যেন মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে একসঙ্গে জমাট বেঁধে উঠেছে। কাহিনির এই ক্ষিপ্রতা, ঘটনাস্রোতের এই বিদ্যু-চঞ্চল গতি— বাংলা সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোট তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত— জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ। কংসকে বধের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, সূচনার এই উল্লেখ পরবর্তী খণ্ডগুলিতে রক্ষিত হয়েছে কিনা তা লক্ষ করবার জন্যই আমরা সংক্ষেপে প্রতিটি খণ্ডের সারবস্তু সূত্রাকারে উপস্থিত করে দেখব।

(১) জন্মখণ্ড ঃ দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য রাধা-কৃষ্ণের জন্মকাহিনি বর্ণিত। বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে বসুদেব-পুত্র হয়ে জন্ম এবং বৃন্দাবনে নন্দের ভবনে স্থানান্তরিত করণ। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে লক্ষ্মীদেবীর রাধারূপে জন্ম।

(২) তাম্বুলখণ্ড ঃ রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে বড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমন্ত্রণসূচক তাম্বুলাদি পাঠালেন। এটিই শ্রীকৃষ্ণের দেহজাত পূর্বরাগ। রাধা যে মূলে গোলোক নিবাসী লক্ষ্মীদেবী সেই স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার দরুন রাধা-চন্দ্রাবলী কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান এবং বড়াইকে অপমান।

(৩) দানখণ্ড ঃ রাধাকে কীভাবে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াইয়ের ষড়যন্ত্র। দানী সেজে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধ নষ্ট করা এবং রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ।

(৪) নৌকাখণ্ড ঃ কৃষ্ণের মাঝিবেশে গোপীদের যমুনা পারকরণ এবং নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে রাধা-কৃষ্ণের জলবিহার। রাধার প্রতিকূল বা কষ্টভাব পরিত্যাগ।

(৫) ভারখণ্ড ঃ ভারবাহী রূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধের পসরা বহন।

(৬) ছত্রখণ্ড ঃ রাধার দেহে যেন রৌদ্রকিরণ না লাগে সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ছত্রধারণ এবং রাধার মিলনে সম্মতি দান।

(৭) বৃন্দাবনখণ্ড ঃ গোপিনী সহিত কৃষ্ণের বনবিলাস এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন।

(৮) কালীয়দমনখণ্ড ঃ কৃষ্ণ কর্তৃক ভীষণ কালীয়নাগকে সংহার।

(৯) যমুনাখণ্ড ঃ কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে জলবিহার ও গোপীদের বস্ত্রহরণ।

(১০) হারখণ্ড ঃ কৃষ্ণ রাধার কণ্ঠহার চুরি করলে যশোদার কাছে রাধা কৃষ্ণের দুষ্কর্মের জন্য অভিযোগ করেন।

(১১) বাণখণ্ড ঃ অপমানিত কৃষ্ণ প্রতিশোধ নেবার জন্য রাধার প্রতি মদনবাণ নিক্ষেপ করলেন এতে রাধা মূর্ছিতা হয়ে পড়লে কৃষ্ণ অনুতপ্ত হলেন। বড়াই ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণকে বাঁধল এবং কৃষ্ণের কাতর অনুরোধে বন্ধন মোচন করে দিল। রাধার মূর্ছা ভঙ্গের পর দুজনের মিলন।

(১২) বংশীখণ্ড ঃ বাঁশির ডাক শুনে রাধার উৎকণ্ঠা, বড়াইয়ের উপদেশে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বাঁশি অপহরণ। কৃষ্ণের কাতর অনুনয়ে রাধা বাঁশিটি ফিরিয়ে দিলেন।

(১৩) রাধাবিরহ ঃ কৃষ্ণের মিলনোৎকণ্ঠায় রাধাবিরহ, রাধাকৃষ্ণের মিলন, রাধা ক্লান্ত হয়ে নিদ্রা গেলে সেই অবকাশে কংস বধের জন্য কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা।

এভাবে সুদীর্ঘ তেরোটি খণ্ডের মধ্য দিয়ে বিস্তৃতকারে কামকলায় অভিজ্ঞ এক পূর্ণ যৌবন যুবকের দ্বারা ছলে-বলে-কৌশলে নিতান্ত নাবালিকা এক পরবধূর দেহসম্ভোগের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন এতে কেউ কেউ মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে চরিত্র চিত্রণের বাস্তবানুগামিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, আবার প্রশ্নও উঠেছে যে, এতে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা রক্ষিত হয়েছে কিনা; এ প্রশ্ন উঠেছে মূলত জন্মখণ্ডে বর্ণিত কৃষ্ণের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্যটিকে কেন্দ্র করেই। অর্থাৎ বড়ু চণ্ডীদাস জন্মখণ্ড অনুযায়ী সম্পূর্ণ পৌরাণিক পটভূমিকায় কৃষ্ণকে স্থাপন করলেও গোটা কাব্য জুড়ে তাঁর কৃষ্ণচরিত্র পূর্বপরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে।

কিন্তু এই বিরোধিতা আপেক্ষিক, কাব্যে দেখি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পৌরাণিক মহিমা, জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য, অবতারত্ব এবং স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন; কিন্তু স্বর্গ থেকে লক্ষ্মী যখন গোপবালিকা রাধা রূপে মর্তে জন্ম নিলেন তিনি কিন্তু তাঁর মহিমা ও স্বরূপ একেবারেই ভুলে গেছেন। তাই কৃষ্ণ বারবার বৈকুণ্ঠের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যদিও কাব্যে আমরা দেখব যে, রাধাকে স্বরূপে সচেতন করতে গিয়ে কৃষ্ণ তাঁর দেহের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে ক্রমে ক্রমে রাধার প্রতিকূল মনোভাব, ভীতি ও সংকোচ লোপ পেয়েছে এবং তিনি কৃষ্ণ অনুরাগিণীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এ বোধ তাঁর কখনও জাগেনি।

প্রথমাবধি কৃষ্ণকে অবতাররূপে আঁকার চেষ্টা করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যে কৃষ্ণ নিজে, বড়াই এবং অন্যান্য সকলে, বিশেষত বলভদ্র, কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন। কালীয়দমনখণ্ডে কৃষ্ণ যখন দুর্দান্ত বিষধর নাগ কালীয়কে দমন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন জন্মখণ্ডের সঙ্গে এর সংগতি লক্ষ করে পাঠক মনে মনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের কল্পনা করেন। এবং কালীয়নাগের ধ্বংসস্তূপের উপর নৃত্যরত কৃষ্ণকে দেখে তাঁর দ্বারা কংস বিনাশের আর দেরি নেই— এমন একটি ভাবে যখন বিভোর হয়ে পড়েন, তখন দেখা যায়— নাগের বিষে জর্জরিত কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন। সেই সময় বলভদ্রই তাকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে জাগ্রত করেছেন। এরপরই আবার নিতান্ত গ্রাম্য প্রেমিকের মতো কৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্রহরণে মেতে উঠেছেন। জনমনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিক বিরূপতা দেখা যায় তা শুধুমাত্র আদিরসাত্মক স্থূলতার জন্য নয়, বরং কৃষ্ণ চরিত্রের অন্তর্নিহিত অসংগতি ও অসামঞ্জস্যই এজন্য অনেকাংশে দায়ি।

কাজেই জন্মখণ্ডকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নগুলি উঠেছে সেগুলির সূত্রকারে এভাবে নিরসন করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) একাব্যের প্রথমেই জন্মখণ্ডে পুরাণ-ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণের যে পৌরাণিক মহিমা এবং অবতার গ্রহণের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তার সঙ্গে গ্রামীণ লৌকিক ভাব এমনভাবে মিলে গেছে যে পরবর্তী খণ্ডগুলোতে কৃষ্ণের দৈবমহিমা অক্ষুণ্ণ থাকেনি— আচ্ছন্ন হয়েছে। মনে হয় কৃষ্ণের পৌরাণিক লীলা নয়, লৌকিক জীবনলীলা প্রকাশ করাই কবির অভিপ্রায় ছিল।

(খ) 'কংসের কারণ হএ সৃষ্টির বিনাশে'— কৃষ্ণ যে কংসকে বধ করার জন্যই জন্ম নিয়েছেন, সে ব্যাপারে কৃষ্ণ নিজে যেমন সচেতন তেমনি রাধাকেও তিনি জাগরিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপবিস্মৃতা রাধা যেমন একটি গ্রাম্য যুবতী— কৃষ্ণও কিন্তু নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত থেকেও তার বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেননি। পৌরাণিক-লৌকিকের দোলাচলতায় চরিত্রটি দোলায়িত— তাই যে কৃষ্ণ 'শঙ্খ চক্রগদাশারঙ্গ ধরে' সেই কৃষ্ণই আবার রাধা তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বলেন, 'বলে ধরি তোকে তবে দিবোঁ আলিঙ্গন।' —এখানে কৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেও প্রেমের জন্য এক গ্রাম্য নারীর ভার বহন করেছেন, ছত্র ধারণ করেছেন। রাধার দুর্ব্যবহারে কৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া যতই নিন্দনীয় হোক না কেন মথুরায় যাওয়ার আগে রাধার যত্ন নেওয়ার জন্য বড়াইয়ের প্রতি অনুরোধ, দেহ কামনার আড়ালেও কৃষ্ণের হৃদয়ানুভূতির উন্মেষর স্বাক্ষরবাহী।

(গ) শেষে রাধাকে রেখে কৃষ্ণের মথুরাগমনের মাধ্যমে কবি সুকৌশলে জন্মখণ্ডের সঙ্গে রাধাবিরহে এসে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের একটা উদ্দেশ্যের পরিণামবাহী রূপ সৃষ্টি করেছেন বলা যায়। একদিকে পরনারীর সঙ্গে যমুনাতীর বহুবিধ বিলাসকলার আকর্ষণ, অন্যদিকে কংস নিধনের মতো মহত্তর দায়িত্বের আহ্বান— এই দুই আকর্ষণে কাব্যের শেষে দ্বিখণ্ডিত সত্তার প্রকাশ কৃষ্ণের মধ্যে।

গ্রন্থটি সমাপ্ত কীভাবে হয়েছিল জানা যায় না। হয়তো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগের সাহিত্যের সেই বিরলতম কবিকৃতি যা বিরহে সমাপ্ত; কিন্তু রাধার এই বিরহের সমান্তরালে আছে কৃষ্ণের দায়িত্ববোধের জাগরণ।

কেউ কেউ বলেন যে, ঘুমন্ত নায়িকাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরাগমন আসলে রাধিকার প্রতি তার আকর্ষণের অবসান; কিন্তু আমাদের ধারণাটি ভিন্ন। ঘুমন্ত নায়িকাকে কোল থেকে নামিয়ে চলে যাওয়ার সময় কৃষ্ণকে প্রেমদয়াহীন নায়কের তুলনায় এক দায়িত্বশীল প্রেমিক বলেই মনে হয়। এই সময়ে কৃষ্ণের আচরণে একদিকে আছে আত্মসমর্পিতা নারীর প্রতি গভীর স্নেহ ও দায়িত্বজ্ঞান, অন্যদিকে আছে বৃহত্তর জীবনের দায়বদ্ধতার প্রতি আকর্ষণ। কৃষ্ণ যখন বলেন 'জাইবোঁ আহ্মে মথুরা নগরে'— সেই মুহূর্তেই কংস নিধনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অর্থাৎ জন্মখণ্ডের সঙ্গে উপসংহারের একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায়। পুথি খণ্ডিত না হলে হয়তো এরপর কংস বিনাশকারী কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার বর্ণনা আমরা মুগ্ধবিস্ময়ে লক্ষ করতাম— এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৪.৩ চরিত্র বিচার

বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নে যে দুটি কাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি হল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত এই কাব্যখানি কিছু কিছু জায়গায় রুচির দিক থেকে অশালীন। এর চরিত্রগুলির মধ্যে স্থূল কামনা-বাসনা এবং নানা অশ্লীল আচার-আচরণের দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাব্যের চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ঘটেছে। স্থূল কামনা-বাসনা পুতিগন্ধময় জীবনের উর্ধ্বে যেমন প্রেমের মহিমাময় রূপের স্বর্গীয় সুর ধ্বনিত করে তুলেছেন কবি, তেমনি আবার মানবিকতা ও বাস্তবতার দিকটিকেও পরিস্ফুট করে তুলেছেন। কৃষ্ণ, বড়াই এবং রাধা এই তিনি মুখ্য চরিত্রের কথোপকথন এবং ক্রিয়াশীলতা, ঘটনা-সংঘাতই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেহের আশ্রয়ে দেহাতীত প্রেমের সুররাগিণী, সীমার মধ্যে অসীমের সংগীত মূর্ছনা ও রাধা চরিত্রের অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিবর্তন, বিকাশ ও পরিণামের মধ্য দিয়ে কাব্য-কাহিনি ও চরিত্রগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আসুন, এই কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র একে একে আলোচনা করা যাক।

৪.৩.১ রাধা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সামগ্রিক ঘটনাবলি যে চরিত্রকে আশ্রয় করে রসঘন নাট্যিক পরিণাম লাভ করেছে সে হলে রাধা; যে এক চিরন্তনী নারী— 'তিনভুবনজনমোহিনী', 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী', 'অদভূত কনক পুতলী', 'চন্দ্রাবলী রাহী'। এই রাধা রক্তমাংসে গঠিতা, প্রাণের উত্তাপে উচ্ছল অথচ বেদনায় ব্যথাতুর, জীবনের কঠিন সংগ্রামে আত্মজয়ী আবার প্রেমের উষ্ণতায় আত্মহারা। এই রাধা-সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে অপর চরিত্রগুলি দেখা দিয়েছে শুধু এই নারীর রূপচিত্রটিকে সার্থকতা দানের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নায়িকা রাধার বয়স যখন এগারো বৎসর, তখনই তাকে আমরা দেখতে পাই। 'কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে' দেবতারা লক্ষ্মীকে মর্তে প্রেরণ করেন। এই লক্ষ্মীই মর্তে রাধা নামে মর্তমানবী হয়ে উঠেছে। তার পিতা সাগর গোয়ালা ও মাতা হলেন পদুমা এবং বাস হল বৃন্দাবনে। শিরীষকুসুম কলির মতো আধ-প্রস্ফুটিত, আধ-উন্মোচিত তার কৈশোর-যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে ত্রিভুবনমোহিনী এই নারীর রূপ-চর্চায় দশদিক উজ্জ্বল। রাধার রূপতৃষ্ণায় কাতর, মোহিনী মায়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল কৃষ্ণ। কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য ও নির্লজ্জ ব্যবহারে এই গ্রামীণ কুলবধূটির পথ চলা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাম্বুলখণ্ডে শেষপর্যন্ত অধৈর্য হয়ে একদিন কৃষ্ণ বড়াইকে দূতী করে পানতাম্বুলের অর্ঘ সাজিয়ে শ্রীমতী রাধার কাছে মনের গোপন বাসনাটি উথাপন করল। কিন্তু এগারো বছরের বিবাহিতা কিশোরী রাধার তীব্র ব্যক্তিত্ব, প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধির কাছে বড়াইকে পর্যুদস্ত হতে হল। সর্পিনীর মতো তীব্র তেজে রাধা গর্জে উঠল এবং 'যত নানা ফুল পান করপূর সব পেলাইল পাএ'।

তারপরই ধিক্কার ও গঞ্জনা দিল বড়াইকে এবং আরও বলল 'নান্দের ঘরের গরু

রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।' কিন্তু ধূর্ত বড়াই সহজে হার মানার পাত্রী নয়। বড়াই যখন পুনরায় রাধার কাছে কৃষ্ণের প্রস্তাব উত্থাপন করল তখন 'কোঁপে গরজিলী রাধা যেন কালসাপ'। তীব্র ক্ষোভে রাধা তখন বড়াইকে গঞ্জনা দিয়ে বলে 'এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা'/আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা'। কিন্তু তাতেও যখন বড়াই নিরস্ত হল না তখন রাধা 'বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে'। তেজস্বিনী প্রাণোচ্ছলা এই রমণী হিন্দু ঘরের কুলবধূ, দেহমনে তার তীব্র সতীত্ববোধ, স্বামী যতই ব্যক্তিত্বহীন হোক না কেন, পরপুরুষের প্রতি তার মনে দুর্বলতার কোনো স্থান নেই। এই স্বামীর গরবেই সে গরবিণী, তাই তার মুখেই শোনা যায়— 'বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী', স্বামীকে নিয়ে তার কোনো অভিযোগও নেই। স্বামীকে সে চিরদিনই চায় 'চিরকাল জীউ মোর সামী আইহন'। 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল'-এর সঙ্গে তার আবার কী সম্পর্ক! এখানে রাধা কোনো দেবী নয়, সাধারণ মানবীর মতো তার সতীত্ববোধ; সেই সঙ্গে আছে ক্রোধ এবং পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম যে সামাজিক নীতিগর্হিত কাজ, সেই সম্পর্কে সচেতনতা। এই রাধার মধ্যে সাধারণ মানুষের মতো পাপ-পুণ্যের বিচারও আছে, তাই সে পরপুরুষ সঙ্গ অভিলাষী নারী সম্পর্কে ধিক্কার জানিয়েছে— 'ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসূ তার পতী/পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী।' বৈষ্ণব পদাবলির রাধার মতো এই রাধা বিশেষ ভাবের মূর্তরূপ নয়, কৃষ্ণ-প্রেমই তার একমাত্র লক্ষ্য নয় এবং 'জনম হৈতে বঁধুর সহিতে, পরাণে পরাণে নেহা'-র বোদ্ধাও সে নয়। এখানে তার স্বামীই সব।

কিন্তু ক্রমে এই রাধার কাছে বড়াই ও কৃষ্ণের আচরণ অসহনীয় হয়ে উঠল। দানখণ্ডে দুঃখ-গ্লানিতে ও মর্ম-পীড়ায় অসহায় রাধা নিজের রূপকে ধিক্কার জানাতে থাকে। তার মন শঠচরিত্র কৃষ্ণের হাত থেকে মুক্তির জন্য গোকুল ছেড়ে দূর অনির্দেশ্য জগতে পালিয়ে যেতে যায়। সে বলে— 'পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ/যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতে না পাওঁ/হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরিজাওঁ/মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।'

এইভাবে খণ্ড পরম্পরায় নানা ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে বংশীখণ্ডে এসে কৃষ্ণবিরহিণী এই রমণীকেই কৃষ্ণগতপ্রাণা রূপে দেখা যায়। রূপ-যৌবন-পতি-পরিজন-লজ্জা-কুল-মান সবকিছু ভাসিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের অন্বেষণে ঘর ছাড়তে চায় এই রাধা, যে একদিন কৃষ্ণের হাত থেকে মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জন দিতে চেয়েছিল। রাধা চরিত্রের এই যে মানসিক পরিবর্তন তথা অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ফুটে উঠেছে তা বড়ু চণ্ডীদাসের অসাধারণ শিল্পকুশলতার ফল। কবি রাধাকে এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে উত্তরণের মধ্য দিয়েই প্রেমিকা করে তুলেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির মতো প্রথম থেকেই বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা'র প্রকাশ ঘটেনি। তাম্বুলখণ্ড ও দানখণ্ডে কৃষ্ণের নিবেদিত প্রেমকে রাধা প্রত্যাখ্যান করেছে, শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার কোনো উপায় না দেখে কংসের ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে। তারপর রাধা কোনো উপায় না দেখে সামাজিক সম্পর্কের কথা উত্থাপন করে 'তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মোত মাউলানী'— সুতরাং মিলন অসম্ভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে

আত্মসমর্পণ করতে হয় কৃষ্ণের কামনার নিকট। বৈষ্ণব পদাবলির মতো এখানে রাধার পূর্বরাগ নেই— বরং পূর্বভোগ ঘটেছে। রাধিকা এখানে পূর্বভোগ থেকে পূর্বরাগে পৌঁছেছে। কারণ মন ছাড়া তো দেহ নয়, তাই রাধা ক্রমশ কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হল এবং এটাই প্রাকৃত ও বাস্তব। অপ্রাকৃতের, অবাস্তবতার কোনো ছোঁয়া লাগেনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধায়। ধীরে ধীরে প্রেমের দেবতার স্পর্শে লালসাক্লিষ্ট বাসনা প্রেমমহিমার পবিত্রতায় উত্তীর্ণ হল। আত্মধিক্কারে যে রাধা একদিন নিজরে রূপ যৌবনকে 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী'-র সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং তীব্র বেদনায় যে রাধা 'লোটায়াঁ লোটায়াঁ কান্দে', সেই রাধিকাই রাধাবিরহ পর্যায়ে এসে প্রেম পাগলিনীরূপে কৃষ্ণলাভের আশায় সমগ্র ভূখণ্ডকে হাহাকারে পরিপ্লাবিত করে তুলেছে। তার প্রেম আর সীমা মানছেনা, যত প্রেম তত অশ্রু; কৃষ্ণবিরহে রাধিকা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে যে রাধা শাশুড়ির সতর্ক পাহারায় আত্মগোপন করে থাকত, সেই রাধাই এখন শাশুড়ির ভয়ে বৃন্দাবন যেতে পারছে না। কালীয়দমনখণ্ডে তার কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ অকুণ্ঠ ও অনাবৃতভাবে প্রকাশ পেল। যমুনাখণ্ডে দেখা যায় কৃষ্ণদর্শন মানসে ঘাটে থাকার জন্য রাধার আর তর সয় না। বংশীখণ্ডে ও রাধাবিরহে সেই আকর্ষণ স্বর্গীয় প্রেমের মহিমাস্পর্শে সার্থক হয়ে উঠেছে। একদিন যে কৃষ্ণকে সে উপেক্ষা করেছিল পরে সেই কৃষ্ণকেই একান্তভাবে কামনা করেছে। বংশীখণ্ডে এই প্রেমের সূচনা, রাধাবিরহে ঘটেছে তার ব্যাপ্তি। এতদিন যে প্রেম ছিল দেহকেন্দ্রিক, দেহের আরতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বংশীখণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুলচিত্ত রাধিকার মধ্যে সেই প্রেম দেহ ছেড়ে মনের দিকে ঝুঁকেছে— 'আকুল শরীর মোর বেআকুল মন'। বিরহসন্তপ্তা রাধা এখন সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। এই পর্বে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অসীম অপার্থিব প্রেম মহিমার প্রথম পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসকে যদি বৈষ্ণব পদাবলির প্রাণ বলা হয় তবে সেই প্রাণধর্মের প্রথম সুরটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ পর্যায়ে শোনা যায়। পরবর্তী চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে বিরহিণী নারীর যে আর্তি ফুটে উঠেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার 'চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা'-র মধ্যে সেই আর্তিই যেন ভাষারূপ পেয়েছে।

বিরহ যন্ত্রণায় বড়াইয়ের সঙ্গে কথোপকথনে রাধার মধ্যে হৃদয়ভেদী বুক নিঙড়ানো ব্যথার সুর ধ্বনিত হয়েছে। কখনও করুণ কাতর অশ্রুনিষিক্ত কণ্ঠে বড়াইকে আবেদন জানিয়েছে, 'কাহ্নাঞি মোরে আণিআঁ দে আল পরাণের বড়ায়ি/কাহ্নাঞি মোকে আণিআঁ দে।'— তার এই আবেদন কত করুণ ও মর্মস্পর্শী। বিরহ যন্ত্রণায় জাগতিক সবকিছুকে তুচ্ছ করে রাধা কণ্ঠের গজমুকুতার হার ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার চিত্ত আকুল। মনে হয় এই বাঁশির সুরে সমগ্র জগতে আহ্বান জেগে উঠেছে। এই বংশীধ্বনি অসীমেরই আহ্বান। গোষ্ঠ গোকুলে এই বাঁশির তরঙ্গ সকরুণ মূর্ছনা জাগিয়ে তুলেছে। অসহায় অভাগিণী রাধা বংশীধরকে লাভ করতে না পেরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কৃষ্ণপ্রেমে আর কোনো ক্লেদ নেই, সংশয় নেই। তাই বুঝি বিশ্বসংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুলবধূ উচ্চকণ্ঠে আপন বেদনাকে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত নয়। রমণীর সমস্ত বন্ধন, সাধ্বী বধূর সকল চিহ্ন ছিন্ন করতেও শ্রীমতী আর কুণ্ঠিত নয়—

'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচূর।"

একদিন ঠিক এই কথাগুলিই রাধা দুরাত্মা কৃষ্ণের হাত থেকে রক্ষা পেতে বলেছিল। একদিন যে কিশোরীটি দুই নয়নে অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সেই নারীরই নীতিবিগর্হিত প্রেমের জন্য দুই চোখে অশ্রু বাঁধ মানল না। কবি বড়ু চণ্ডীদাস অসাধারণ প্রতিভাবলে নারীসত্তার এই দ্বৈত রূপের এমন পরিণামমুখী রসভাষ্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রাধা কোনো দেবী নয়, বড়ু চণ্ডীদাস রাধার মধ্যে একজন মানবী— একজন কিশোরী-যুবতীর চিত্র এঁকেছেন। এই কিশোরীর চিত্তে প্রেমোন্মেষ ও তার পরিণতি তিনি দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি উদ্ধরণযোগ্য— "তাম্বুলখণ্ডে যে 'চন্দ্রাবলী রাহী'র সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইল, যে সংসারানভিজ্ঞ রূঢ় সত্যভাষিণী, অল্পবয়সী, অশিক্ষিত গোপবালিকা। কিন্তু ঘটনা-কৌশলে মূঢ় বালিকাচিত্তে কামের ও প্রেমের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া কবি যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি সেই গোপকন্য কখন যে শাশ্বতরসিকচিত্তবলভীর প্রৌঢ়পারাবতী শ্রীরাধার পরিণত হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই।"

বস্তুত বড়ু চণ্ডীদাস দেহমন্থনের মধ্য দিয়ে এক স্বামী-সুখ বঞ্চিতা নারীর মধ্যে যেভাবে হৃদয় চেতনার উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির স্তরগুলি পরিস্ফুট করেছেন, তাতে তিনি আধুনিক যুগের সীমানায় এসে পৌঁছেছেন, আর এখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্যে ও অনন্যতা।

৪.৩.২ কৃষ্ণ

বড়ু চণ্ডীদাস শুধু বাংলা কৃষ্ণকথার আদিকবি নন, আখ্যানকাব্য তথা জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের আদিকবি। চর্যার কবির মতো তিনি সাধন-সংগীত লিখেননি, তিনি লিখেছেন জীবনসংগীত। চর্যার পদগুলিতে মানুষ ও মানুষের জীবন বহির্বৃত, তত্ত্বই লক্ষ্য, পরমার্থই শেষ কথা। বড়ু প্রত্যাখ্যান করলেন তত্ত্বকে, মানুষের সাহিত্যে মানুষকে দিলেন প্রতিষ্ঠা। চর্যায় ছিল মানুষের রূপক, বড়ু চণ্ডীদাসের হাতে সময়ের সঙ্গে অন্বিত গোটা মানুষটি আত্মপ্রকাশ করল। বাংলার সাহিত্যভুবনে রক্ত-মাংসের মানুষকে নিয়ে আসেন বড়ুই প্রথম। সাধারণত যে কোনো প্রথম সৃষ্টিতে কিছু দুর্বলতা থাকে সেটা ক্ষমার চোখে দেখাও হয়। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্র পরিকল্পনায় পাঠকের করুণার কোনো সুযোগ দেননি; রুচি যতই গ্রাম্য হোক না কেন, চরিত্র সৃজনে তিনি নিখুঁত, যুগ যুগ ধরে তিনি পাঠকের সশ্রদ্ধ বিস্ময় আকর্ষণ করেন।

পরকীয়া প্রেম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়। এই লৌকিক জীবননাট্যের নায়ক-নায়িকা রাধা ও কৃষ্ণ, ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে লোকোত্তর মহিমায় অধিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার

জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও পুরাণাদির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্রমাহাত্ম্যকে স্বীকার করেছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, যখনই পৃথিবীতে অসত্য মাথাচাড়া দিয়ে সত্যকে পরাভূত করবে তখনই—

'পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

ধর্ম সংস্থাপন ও ভূভার হরণের নিমিত্তই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরি কৃষ্ণরূপে জন্ম নেবেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রারম্ভে 'সূত্র'রূপী জন্মখণ্ডে এই প্রত্যয়কে স্বীকার করেছেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস। পৃথিবীর দুঃখ ও পীড়ার কথা শুনে দেবগণ অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণের কাছে গিয়ে জানালেন— 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে'— তখন নারায়ণ নিজের দুটি চুল উপড়ে নিয়ে বললেন— 'এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে/হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে।।' এই বনমালীর হাতেই হবে কংসের বিনাশ। দৈবকীর অষ্টম গর্ভে, ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীতে কৃষ্ণের জন্ম, প্রহরীর নিদ্রা, নন্দের ঘরে বসুদেব কর্তৃক কৃষ্ণকে রেখে মহামায়াকে নিয়ে আসা, কংসের উদ্দেশ্যে মহামায়ার আকাশবাণী, শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক পুতনা, যমলার্জুন, কেশি প্রমুখ দানবদের বধ— এই সমস্ত অলৌকিক প্রসঙ্গ জন্মখণ্ডে পুরাণের পুচ্ছগ্রাহিতার সূত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবৃত হয়েছে। 'কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে'— দেবী কমলাও রাধারূপে বৃন্দাবনের গোয়ালার ঘরে জন্ম নিলেন।

কিন্তু সময় ও পরিসরের প্রভাব অস্বীকার করেন কেমন করে আখ্যান কাব্যের কবি। দার্শনিক ভক্তের মতো অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের কথা নয়, তিনি যে শিল্পীর নিস্পৃহ দূরত্ব থেকে মানবজীবনকে দেখতে চান, রূপ দিতে চান। পরিপূর্ণ যৌবনে কৃষ্ণকে যখন কবি স্থাপন করলেন সমকালীন সামাজিক পারিপারিক জীবনবৃত্তে, তখন কৃষ্ণ চরিত্রের পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিস্মৃত হলেন কবি। তাঁর কাব্যনায়ক কৃষ্ণ হয়ে উঠল তুর্কি আক্রমণোত্তর সময়ের বাংলার বুকের আইন-শৃংখলা-শাসনবিহীন নৈরাজ্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা অসংস্কৃত গ্রাম্য গোঁয়ার। সময়ের টানে বড়ুর কাব্যনায়ক হল অবক্ষয়িত যুবমানসের প্রতিনিধি। তাম্বুলখণ্ডে বড়াইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ই এই অসংস্কৃত যুবকটির ভিতরটা যেন দেখা গেল। বড়াই একটি মেয়েকে খুঁজছে শুনেই যে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটির রূপ কেমন, তারপর রাধার রূপবর্ণনা শুনে কৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া—

"তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনা।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।।"—

এই সংলাপটি শুনে বোঝা যাচ্ছে এ নামশ্রবণজাত পূর্বরাগ নয়— এ রূপোন্মাদের দেহকামনা। রাধা-সম্ভোগের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে সে। বড়াইয়ের মাধ্যমে রাধার নিকট সে প্রেমের নয় 'সুরতি'র প্রস্তাব দেয়। হৃদয়ের বালাই নেই কৃষ্ণের। সে রাধাকে স্বপ্নে দেখে, কিন্তু কীভাবে দেখে জানা যাক বড়াইয়ের জবানিতে—

"নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ।
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ।।
কনকপদ্মকোরক সম দুঈ তনে।
পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে।।"—

রাধার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই গোঁয়ার লম্পট, বালিকাবধূটিকে কীভাবে শাস্তি দেবে তার পরিকল্পনা বড়াইয়ের কাছে ব্যক্ত করে। কত নিষ্ঠুরভাবে রাধাকে হেনস্তা করবে, তার বিবৃতি আছে ৩১ সংখ্যক পদে, যেখানে যুবকটির গ্রাম্যরুচি, রিরংসা ও প্রতিহিংসার খেলামেলা প্রকাশ ঘটেছে। রাধাকে ভোগ করে মদনবাণ অস্থির করে মুনিবেশ ধারণ করে চূড়ান্ত অপমান করবে সে, বড়াই যেন তখন রাধাকে উপহাস করে। কোথাও প্রেমে রাধাকে জয় করার কোনো অঙ্গীকার কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। কাব্যশেষে মথুরা যাওয়ার আগে রাধাকে ভালো করে দেখা-শুনার জন্য বড়াইকে তার অনুরোধ ভালোবাসায় নয়, নেহাৎ করুণায়। এই বৃত্তিটিও তার মধ্য দুর্লভ।

দান-ভার-ছত্র-বৃন্দাবন খণ্ডে পূর্বপরিকল্পনারই রূপায়ণ; মহাদানী সেজে রাজার কর সংগ্রাহক পরিচয় দিয়ে মথুরার পথে সে রাধাকে আটকে দেয়। বারবার কুৎসিত কদর্য বাক্য প্রয়োগে অবতার হয়ে ওঠে পর্ণোগ্রাফির চরিত্র। দানখণ্ডে এগারো বছরের বালিকার উপর অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হল না 'দেবরাজ কৃষ্ণ'। নৌকাখণ্ডেও রাধার অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিল কৃষ্ণ। রাধার কোনো অনুরোধ, শত অনুনয় তার মধ্যে এই নারীর জন্য একটুও সহানুভূতি জাগায়নি। রাধা পাপের ভয় দেখিয়েছে, রাজার ভয়। গোঁয়ার যুবকটি এতে বিন্দুমাত্রও ভয় পায়নি। রাধা বারবার বলেছে মাতুলানির সঙ্গে এমন আচরণ অন্যায়, পাপ; কামনা-বিহ্বল কৃষ্ণ গায়ের জোরে অস্বীকার করেছে সামাজিক সম্পর্ক— 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী' এবং রাধাকে হুংকার দিয়ে বলেছে—

"হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞি গোআল।।"—

তার একই কথা 'দেহ আলিঙ্গন'। কংসের বিনাশ কারণে যে ধরাধামে অবতীর্ণ সে সুরতি আশায় অপটুহাতে রাধার দুই-দই-এর ভার বয়, রাধার মাথায় ছাতা ধরে। মজুরি সে চায়, কিন্তু কড়ি নয়, তার মজুরি সম্ভোগ— সম্ভোগ ছাড়া শব্দ নেই, সম্ভোগ ছাড়া জগৎ নেই তার। সময় অসময় বোঝে না, একই কথা তার— 'দান বিনী আজি কাহ্ন না জাএ।'

বৃন্দাবনখণ্ডে অত্যাচারে অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে রাধা শেষে হারখণ্ডে যশোদার কাছে কৃষ্ণের নামে নালিশ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোঁয়ার। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করে রাধাকে।

শরাঘাতে রাধা মূর্ছা গেলে বড়াই ও সখীগণ বারবার তাকে অভিযুক্ত করে। এরপর নিজেই প্রযত্ন করে রাধার চেতনা উদ্ধার করে কৃষ্ণ। কিন্তু এই কাজটি সে মমত্বের বশে করে না, মুখে 'মুখ তুলি চাহ মোর পালাউক পাপ'— বললেও পাপ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই পাপে যে চিরকাল অকুতোভয়। রাধার চেতনাসঞ্চার করেছে যে ভয় পেয়ে— সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ভয় পেল কৃষ্ণ।

ক্রমাগত দেহ-মন্থন ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রাধা কৃষ্ণকে ক্রমশ ভালোবাসতে লাগল। উপাখ্যানের শেষপর্বে রাধা যখন হয়ে

উঠেছে প্রেমিকা নারী, তখন প্রমাদ গুণল গোঁয়ার কৃষ্ণ। কামনার দায় নেই, প্রেমের যে দায় আছে— সে দায়িত্ব কৃষ্ণ নিতে পারে না। অতএব বাসি ফুলের মতোই রাধাকে ফেলে চলে গেল মথুরায়। রাধার বিরহ-বেদনা ও ক্রন্দন তাকে এতটুকুও স্পর্শ করে না। রাধাবিরহে শুনি হৃদয়হীনের নির্মম পরিহাস, যখন সে রাধাকে বলে—

"এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সবজন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।।"—

দায়িত্বের প্রশ্ন যখন এল, সে হয়ে গেল রাধার ভাগ্নে। রাধা যখন কায়মন তাকে সমর্পণ করেছে, কৃষ্ণ তখন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় স্মরণ করিয়ে দেয় রাধার দেওয়া সব অপমানের কথা। এও জানায় দশম দুয়ারে তালা দিয়ে সে এখন যোগী হয়েছে। বড়াইকে বলেছে রাধার মুখ দর্শনের কোনো বাসনা নেই তার। এইতো কৃষ্ণ চরিত্র— কাব্যের যত কিছু দুর্নামের আশ্রয়। কাব্যমধ্যে সে গ্রাম্য গোঁয়ার হলেও পৌরাণিক প্রসঙ্গের অলৌকিক মহিমা ভুলেন না কবি, ভুলে না সেও। কাব্যমধ্যে অসংখ্যবার সে বলেছে— 'আহ্মে হরি আহ্মে হর আহ্মে বনমালী', 'তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী', 'আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জানি' ইত্যাদি বাক্য। নিত্যপ্রিয়া রাধাকে অন্তত একবার গীতগোবিন্দের নায়কের ভাষায় সে বলেছে— 'তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ, তোহ্মে সে মোরে জীবন'। কালীয়দমনখণ্ডে বলরামের দশাবতার স্তোত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তির কথা রয়েছে। কিন্তু এই অলৌকিক প্রসঙ্গ যে নিতান্ত বহির্বৃত তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না পাঠকের। কৃষ্ণ ঈশ্বর নয়, তৃতীয় স্তরের মানুষ, আদিম আরণ্যক, অসংস্কৃত গ্রাম্য।

পরিশেষ একটা কথা বলতে হয়, কৃষ্ণকে এরূপ অপরিশীলিত পাষণ্ড করে আঁকার পেছনে শিল্পীর অভিপ্রায়টিকেও বুঝে নেওয়া দরকার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থনামে 'কৃষ্ণ' থাকলেও কবির লক্ষ্য রাধা, তার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক উত্তরণ। ক্রমাগত দেহমন্থনের মধ্য দিয়ে এই উত্তরণকে যথার্থরূপে ব্যঞ্জিত করতেই কৃষ্ণচরিত্রের এই রকম পরিকল্পনা। 'কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য' কথাটি অসত্য নয়, কিন্তু এটি যদি শেষ কথা হয়, তবে অবিচার করা হবে কবিকে। পরোক্ষে, কৃষ্ণই এই কাব্যের সাফল্যেরও কারণ। রাধার যে মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন কাব্যদেহে আধুনিকতা সঞ্চার করেছে, যে রাধা বড়ুর কীর্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী, সেই রাধার উত্তরণ, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি কৃষ্ণেরই সান্নিধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের পরিকল্পনাই রাধা-বিরহের উৎস; প্রাকৃত রমণী রাধা ক্রমশ মহাভাবস্বরূপা প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধিকা হয়ে উঠেছেন কাব্যে, অসংস্কৃত নায়ক কৃষ্ণই রাধাকে সেই স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, কৃষ্ণ নিন্দাভাজন হওয়া সত্ত্বেও বড়ুর চরিত্র পরিকল্পনার সার্থক নিদর্শন।

৪.৩.৩ বড়াই

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগুণবিশিষ্ট গীতিকাধর্মী লোকায়ত কাব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই অভিনব এবং আকর্ষণীয় কাব্যটিতে রয়েছে অফুরন্ত জীবনরস এবং অভাবনীয় নাট্যরস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনিকাব্যের আকারে প্রথিত হলেও প্রকারে

রীতিমতো নাটক, যার প্রতি পর্বে নাটকীয়তার সুমধুর সমাবেশ, প্রতি ছত্রে নাট্যরসের সুবিপুল সমারোহ। আমাদের আলোচ্য বড়াই চরিত্রটি এই নাট্য সমাবেশকে প্রার্থিত গতিবেগ দিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আখ্যান কাব্য হলেও মূলত নাট্যরসাশ্রয়ী। নাটকের চরিত্রগুলি যেমন বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্বসংঘাত যেমন নাটকের চরিত্রগুলিকে নতুন নতুন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাঙ্খিত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়— শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রগুলিতে সেই লক্ষণ কমবেশি পরিমাণে আছে। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি— রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই। অপ্রধান চরিত্র— যশোদা, বলভদ্র, আইহন এবং তার মাতা।

চরিত্রগুলি প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, কাব্যের জন্মখণ্ডে কাহিনির প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের কৌশলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রেই আমরা আলোচ্য বড়াই চরিত্রটির কথা জানতে পারলাম, অভিমন্যু-জননী কর্তৃক বড়াই রাধার পার্শ্বচররূপে নিযুক্তা হয়েছে, এবং রাধা মধুর ব্যবহারে সুনিপুণা এই বৃদ্ধার প্রহরায় মথুরার পথে পা বাড়িয়েছে, দেখা যায় কাহিনির পটভূমিকা বা প্রস্তাবনা থেকেই বড়াইয়ের প্রসঙ্গ এসেছে এখানে।

কাহিনিতে আছে নপুংসক আইহন, অসাধারণ সুন্দরী যুবতী রাধিকার রূপ-যৌবন দেখে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাকে অনুরোধ করেছে বড়াইকে এনে দিতে—

"দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে।।
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।"—

পুত্রের অনুরোধে মাতা গিয়ে পদুমার কাছ থেকে রাধার তত্ত্বাবধানের জন্য 'চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই/তার পিসী রাধার বড়ায়ি/নিয়োজিলী নানা পরকারে/হাট বাটে রাধা রাখিবারে।।'— এই ভাবে যার সূচনা, সেই পার্শ্বচরিত্র বড়াই অপ্রধান হয়েও এ কাব্যে যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক গ্রামের কবির চরিত্র সৃষ্টির আশ্চর্য দক্ষতার পরিচায়ক হয়ে আছে।

এই কাব্যে অন্য চরিত্রগুলির বর্ণনাতে এবং প্রেক্ষাপটে পৌরাণিক অলৌকিকতা থাকলেও বড়াই চরিত্রটির বর্ণনা কিন্তু একান্তই মানবিক। বার্ধক্যের ছাপ তার চেহারায় স্পষ্ট। শ্বেত চামরের মতো পাকা চুল, কপাল দুদিকে বসানো, ভ্রূকুটি যেন চুনের রেখা, চোখ কোটরে। তার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি এভাবে বলেন—

"শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে।।
....
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী।।
....
কুটিল গমন ঘন কাশে।"—

বড়াই চরিত্রে পূর্বতন ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের ছায়াপাত সম্পর্কে ড° সুকুমার সেন, ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড° সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ড° কৃষ্ণপদ গোস্বামী প্রমুখ সকলেই জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকর', দামোদর গুপ্তের 'কুট্টিনীমতম্' এবং বাৎসায়নের 'কামসূত্র'-এর কুট্টিনী চরিত্রের ছায়া লক্ষ করেছেন। এই কুট্টিনী বা দূতী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল, তাকে চতুরা, প্রগলভা, পরবিত্তজ্ঞাননিপুণা, ও বক্রোক্তিতে পারদর্শিনী হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইয়ের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি থাকলেও সে শেষপর্যন্ত কুট্টিনী বা দূতী হয়েই থাকেনি, প্রথম দিকে সে যদিও কৃষ্ণের দূতীর কাজ করেছে; কিন্তু কাব্য পরিণামে তার মানবিক রূপটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু দূতীয়ালি নয়, রাধার জন্য তার 'আকুলপরাণ'-এর সন্ধানও পাওয়া যায়।

অবশ্য কৃষ্ণ ও রাধা প্রেম-কাহিনির মধ্য সে যে দূতীয়ালি করেছে তা ঠিকই, কিন্তু এতে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। তার আচরণ স্নেহময়ী মাতামহীর। রাধার কিন্তু এতে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। তার আচরণ স্নেহময়ী মাতামহীর। রাধার অভিভাবকরূপে এই কাব্যে বড়াই প্রথম থেকে তার দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। তাম্বুলখণ্ডে রাধাকে পথে হারিয়ে ফেলে তাকে খুঁজে বের করার জন্য তার উৎকণ্ঠা থেকে রাধাবিরহে চিরদিন ঘরের বাইরে থাকা রাধাকে ঘরের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তার ব্যস্ততা পর্যন্ত— কবি সবসময়ই বড়াই চরিত্রে রাধার প্রতি তার আন্তরিক স্নেহ এবং সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বড়াই চরিত্রটির বাস্তবজ্ঞান এবং মানবিকতার বোধ কত প্রখর তা বিচার করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বড়াই দেখেছে রাধার মতো একটি সুন্দরী যুবতীর বিয়ে হয়েছে নপুংসক এবং বয়স্ক এক যুবক আইহনের সঙ্গে। অর্থাৎ সমাজের আচারের যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দেওয়া হয়েছে। এই মেয়েটির জীবনে সাধ-আহ্লাদ বলতে কিছুই কি থাকতে নেই? সমাজের এই অবিচারের বিরুদ্ধে বড়াইয়ের মনে সূক্ষ্ম হলেও একটি বিদ্রোহের মনোভাব লুকিয়ে ছিল বলেই, সে রাধার প্রতি মাতামহীর অন্ধস্নেহবশেই সুন্দর যুবক 'কাহ্নাঞি'র প্রেম প্রস্তাব পাওয়া মাত্র দুজনের মিলনে মধ্যস্থতা করেছে। রাধা নিজের প্রতি সচেতন নয়— কিন্তু বড়াই তার অন্তরে বাসনা জাগ্রত করতে সচেষ্ট।

কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাব নিয়ে রাধার কাছেই সে দুই দুইবার প্রত্যাখ্যাতা এবং তৃতীয়বার অপমানিতা, এমনকি মার খেয়েও সে আশা ছাড়েনি। এরপর অবশ্য নিতান্ত মানবিক কারণে সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে বাণখণ্ডে কৃষ্ণকে উত্তেজিত করেছে। এবং এরপর কূটকৌশলের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের মিলনরূপ অসম্ভব ঘটনাকেও সাময়িকভাবে হলেও সম্ভব করে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। এবং এও ঠিক যে বড়াইয়ে কাছে প্রশ্রয় পেয়ে রাধা সমাজের কঠিন অনুশাসন লঙঘন করতে সাহস পেয়েছে।

তবে কবি বড়াইয়ের দূতীর ভূমিকার মধ্যেও বারবার তার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঐশী সত্তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ও বলেছেন— 'সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।।'— যদিও কৃষ্ণের দেবত্ব বা পৌরাণিক মহিমা এ কাব্যে তাঁর কথায় ও কাজে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবুও রাধিকার দিক থেকে সামাজিক সমালোচকদের

কাছে এটি একটি ভালো কৈফিয়ত যে রাধাকৃষ্ণের অবৈধ মিলনে উৎসাহ দেখিয়ে বড়াই কোনো অন্যায় করেনি। বড়াই নর-নারীর গোপন মিলনের পেশাদারী দূতী নয়। সে রাধারও স্নেহময়ী বড়মা— তাই মায়ামুগ্ধ গোয়ালিনি রাধার মোহ দূর করে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন সাধনে বড়াইয়ের এত আগ্রহ।

রাধাবিরহ পর্যায়ে বড়াই কৃষ্ণেরও দূতী আবার রাধারও দূতী। আবার কখনও কখনও সে সখীর ভূমিকাও পালন করেছে। রাধাবিরহে রাধা যখন কৃষ্ণের বিরহবেদনায় কাতর, তখন বড়াই সখীর মতোই বিরহ নিবারণের জন্য তাকে কখনও চন্দ্রকিরণে শয়নের, কখনও বা শীতল চন্দন লেপনের পরামর্শ দিয়েছে। কৃষ্ণহারা বিরহিণী নাতনিটিকে সান্ত্বনা দিতে তার দুঃখে সেও সমান দুঃখিত হয়েছে। সে বৃদ্ধা, পথ চলতে তার কষ্ট হয়, তবু রাধার সুখের জন্য সে কষ্ট করে পথ অতিক্রম করতেও সম্মত হয়েছে। কৃষ্ণকে পাবার জন্য সখীর মতোই তাকে বলেছে কখনও বা চণ্ডীপূজা করতে, কখনও বা বাসকসজ্জিকা হয়ে কদমতরুতলে অপেক্ষা করতে। বনে বনে রাধার জন্য কৃষ্ণকে খুঁজে ফিরেছেও বড়াই।

অবশেষে দূর থেকে গোচারণরত কৃষ্ণকে দেখে রাধা আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লে বড়াই তাকে পরিচর্যা করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে। রাধার অনুনয় বিনয় কৃষ্ণ অগ্রাহ্য করলে বড়াই কৃষ্ণকে মিলনে রাজি করিয়েছে এবং প্রসাধনকলা-নিপুণার মতো নিজ হাতে রাধিকাকে অভিসারিকার বেশে সাজিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে পাঠিয়েছে।

রাধাকৃষ্ণের মিলন হল, মিলনে শ্রান্ত রাধিকাকে নিদ্রায় অচৈতন্য রেখে কৃষ্ণ মথুরা যাবার আগে বড়াইয়ের কাছে অনুরোধ করে— 'তাক রাখিহ যতনে আপন অন্তরে/জাইবোঁ আহ্মে মথুরা নগরে।'— কৃষ্ণ ভালোভাবেই জানে যে রাধার অভিভাবিকা রূপে এত কর্তব্য-সচেতন আর কেউ নেই। সে-ই এক মাত্র পারবে প্রবোধ দিয়ে, শাসন দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে প্রাণের রাধিকাকে ঘিরে রাখতে। তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বড়াইয়ের সর্ববিধ রূপের মধ্যে দূতী রূপটিই প্রধান। পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দূতীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বড়াইয়ের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। যেমন—

(ক) বাকচাতুর্য ঃ এই কাব্যের প্রথম অংশে মিলনে অনিচ্ছুক রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে মেলানোর জন্য সে যে উপায় উদ্ভাবন করেছে সেখানে তার বাক্‌চাতুরীর পরিচয় পাই, কবি একে ভাষা দিয়েছেন এভাবে—

"কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক বিমুখ বদনে হাসে।।"

এরপর এসব এল কোথা থেকে ইত্যাদি রাধিকার প্রশ্নের উত্তরে বড়াই সুবক্তার মতোই উত্তর দিল এভাবে—

"আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জারিলা পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ।।"

(খ) পরচিত্তজ্ঞান ঃ এর অর্থ হচ্ছে পরের মনের কথা জানার ক্ষমতা। বড়াইয়ের এই পরিচয় কাব্যটির সর্বত্রই আছে। যেমন— দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ডের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যথেষ্ট অগ্রগতি হবার পর, বৃন্দাবনখণ্ডে এসে রাধা নিজেই যখন কৃষ্ণ দরশনে উৎসুক হয়েছে, তখন শাশুড়ি তাকে বাধা দিল। কীভাবে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় তা ভেবে রাধা আকুল, তখন বড়াই যে উপায় নির্দেশ করে তা বড়াইয়ের মানবচরিত্র জ্ঞানের পরিচয়বাহী—

"ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরোঁ।
বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে।।"

(গ) পুরুষচরিত্রজ্ঞান ঃ কৃষ্ণ সম্পর্কে বড়াই যে সব বক্তব্য পেশ করেছে তাতে নাগর-স্বভাব চতুর পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে তার বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"পুরুষ ভ্রমর দুই হো এক মান।
নানাথান ভ্রমি ভ্রমিক রএ মধুপান।।"

তবে এ সব বৈশিষ্ট্য আপেক্ষিক— পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের কাহিনির ছায়ায় রচিত এই লৌকিক প্রেমকাব্যে মানবজীবনরসই প্রধান হওয়ায় বড়াইয়ের মানবিক দিকটাই আমরা লক্ষ করতে পেরেছি এবং দেখেছি এ কাব্যে তা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। এই কাব্যে রাধার দূতী, অভিভাবিকা বা সখী যে ভূমিকাই বড়াই পালন করুক না কেন, নায়ক এবং নায়িকা দুটি চরিত্রেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী রূপেই তার বিকাশ ঘটেছে।

বড়াইয়ের যে রূপ বর্ণনা করেছেন কবি, এতে তাকে সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু সে জীবন্ত বলেই এ কাব্যে সত্য হয়ে উঠেছে। তার চরিত্র ভোলার নয়, যেমন ভোলা যায় না কবিকঙ্কনের ভাঁড়ুদত্তকে কিংবা সেক্সপিয়রের ফলষ্টাফকে, তাকে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়াই যেন তাকে সমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া। আর এ কাব্যে বড়াইকে এই সমগ্রভাবে দেখানোতেই বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব। মধ্যযুগের এক গ্রাম্য কবি হয়েও চরিত্রাঙ্কনে তিনি আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকের দক্ষতা দেখিয়েছেন; এ কাব্যের মূল তিনটি চরিত্রই তার প্রমাণ।

বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যকাব্যে নাট্যকারোচিত দক্ষতা নিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস যে তিনটি প্রধান চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তা তাঁর মৌলিক সৃষ্টি না হতে পারে, কিন্তু তারা যে ভাববৃন্দাবনের অপ্রাকৃত চরিত্র নয়, এবং এই চরিত্রগুলি যে এক বিশেষ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শিল্পের মূর্তি হয়ে উঠতে পেরেছে— বড়াই চরিত্রটি তারই সার্থক প্রমাণ।

৪.৪ সমাজচিত্র

যে কোনো সার্থক সাহিত্যকর্মে সমকালীন যুগ পরিচয়, মানুষের মনন, মানসিকতা, সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা এককথায় সমগ্র সমাজজীবনের প্রতিফলন অনিবার্য গতিতেই আত্মপ্রকাশ করে। সেজন্যই বোধহয় সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়েছে। সেটা কখনও সাহিত্যকার সচেতনভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেন, কখনও বা অবচেতনেই সমকালীন যুগধর্ম ও সমাজ পরিবেশের প্রভাত তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আসুন,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সূত্র ধরে সমকালীন যুগপরিবেশকে আমরা অনুসরণ করি।

আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এতাবৎ কালের আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে চর্যাপদের পরবর্তী দিনগুলোর তুর্কি আক্রমণোত্তর গ্রামীণ বাঙালির লোকজীবনের একটি ছবি ফুটে উঠেছে। প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো সমাজজীবনের ইতিহাসটি জানা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ইতিহাসের পাতায় যে সামাজিক জীবন, তা মুখ্যত রাজনৈতিক ঘটনানির্ভর, সেখানে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ আশা করা যায় না। একমাত্র সাহিত্যকর্মের মধ্যেই সমকালীন জীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি সমকালীন জীবনের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবেও বিশ্লেষণযোগ্য।

দ্বাদশ শতকের শেষভাগেই পূর্বভারতে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়। এরপর প্রায় দুশো বছর ধরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায় অনিশ্চয়তা, অরাজকতার উন্মত্ত ঝটিকাপ্রবাহ। গুপ্তশাসন থেকেই সাহিত্যচর্চা দুটি স্বতন্ত্র পথ লাভ করেছিল। একদিকে চলছিল গতানুগতিকতার অনুবর্তন। অন্যদিকে রাজসভা ও নাগরিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে তৈরি হয়েছিল এক নতুন সাহিত্যাদর্শ। এর রূপকারগণ ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী, মনোধর্মের দিক দিয়ে চিন্তাশীল, শাস্ত্রাদর্শবাদী, মহৎপরায়ণ, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও সংযমনিষ্ঠ। অন্যদিকে গতানুগতিক পথের অনুসারী সাহিত্যসেবীরা ছিলেন দৈববাদ, ও ভাববিলাসী। দুই স্তরের ঐক্যবোধের মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল। প্রথম স্তরের শিব যোগীশ্রেষ্ঠ আর প্রবীণদের দেবতা শিব— গঞ্জিকা ধুতুরাসেবী ভোলানাথ, পরনারী লোভী, দীনকর্মে রত। প্রথম স্তরের কৃষ্ণ গোবর্ধনধারী কংসাসুর মর্দন, মহাভারতনাটে সূত্রধার, দ্বিতীয় স্তরের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ উচ্ছৃংখল, কামুক রাখাল। দেবচরিত্র কল্পনায় এই পার্থক্য দুটি স্বতন্ত্র জীবনধারার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জীবন এই দ্বিতীয় স্তরের। সামাজিক জীবন, নাগরিক জীবন ও রাজনীতির সঙ্গে এই জীবনের কোনো সংযোগ নেই। তবে স্থানে স্থানে নবীন জীবনচর্চার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এবারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাচীন বঙ্গদেশ ও তার লোকজীবনের ছবি কতখানি প্রস্ফুট সে আলোচনায় যাওয়া যাক।

পুরাণাশ্রিত রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। রাধাকৃষ্ণ যেখানে প্রধানতম উপজীব্য, সেখানে কোনো বিশেষ অঞ্চলের নরনারীর জীবনযাত্রার ছবি আশা করা যায় না। কিন্তু বড়ু নিছক পুরাণ অনুসৃত কাব্য রচনা করেননি। তিনি এমন অনেক স্বাধীন কাহিনি ও ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে কবির আপন দেশ ও কালের কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

গ্রন্থের প্রথম পর্বেই একাদশবর্ষীয়া রাধার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, এই রাধা বিবাহিতা, আইহন ঘরণী ও গ্রন্থারম্ভের বহু আগে থেকেই সে স্বামীর ঘর করছে। বাল্যবিবাহ যে প্রাচীন বঙ্গদেশের সাধারণ নিয়ম সেকথা রাধার বাল্যবিবাহের মাধ্যমে জানতে পারি।

রাধাসহ ষোলোশত গোপিনীর দধিদুগ্ধ নিয়ে মথুরার হাটে গমনের চিত্র থেকে জানা যায় সেকালে নারীরা পরনির্ভরশীল ছিল না। সকল স্ত্রীলোকই যে ঘরের বাইরে

যেত এমন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও গোপজাতির কন্যা আপন ব্যবসা ও জীবিকার কাজে দুধ দধি পসরা নিয়ে বাজারে যেত এই তথ্য জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গোপজাতি ছাড়াও কুমার, নাপিত প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিনির্ভর জাতির পরিচয় পাই। কুমারের প্রসঙ্গে ঃ "এবেঁ মোর মণের পোড়নী/ যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।" তেলিদের উল্লেখ— "কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ'। অথবা "....তেলিনি তেল বিচিতেঁ।" নাপিত প্রসঙ্গে— 'আন ডাক দিয়া বড়ায়ি নাপিতের পো' ইত্যাদি। গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৈদ্য এদের প্রসঙ্গও আছে।

বৃন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত দু-একটি স্থানে গ্রামবাংলার সমাজজীবনের বেশ কয়েকটি সুন্দর ছবি রয়েছে। রাধা কৃষ্ণ-মিলনে উৎসুক কিন্তু শাশুড়ির অনুমতি না পাওয়ায় বড়াই নতুন করে গোপীদের ঘরে গিয়ে মথুরার হাটে যাওয়ার প্রস্তাব দিল, আইহনের মায়ের জন্যই কিছুদিন ধরে সখীদের হাটে যাওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছে। বড়াইয়ের কথায় সবাই ঘরের বউকে হাটে পাঠাতে সম্মত হয়; শুধু তাই নয়, আইহনের মাকে শাসিয়ে দেয়—

"আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্নপানি না খাইব।।"—

অর্থাৎ আমাদের বধূর সঙ্গে তোমার বধূকে হাটে না পাঠালে তোমাদের ঘরে জলস্পর্শ করব না। তখন 'এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ' রাধাকে যাওয়ার অনুমতি দেয়, নইলে 'একঘরে' হতে হবে। এই 'একঘরে' করে রাখাটা বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে দণ্ডদানের একটি প্রক্রিয়া।

দানখণ্ডের কৃষ্ণকে মহাদানী বা করসংগ্রাহক দেখে মনে হয়, সেকালে বাজারের ব্যবসায়ীদের উপরও taxation ব্যবস্থা ছিল।

বড়ু চণ্ডীদাস চারপাশে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন দেখেছেন তাই আইহনের পরিবার-রূপায়ণেও সেই প্রভাব পড়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরণী রাধা, কৃষ্ণের জন্য মন বৃন্দাবনে পড়ে থাকলেও সমস্ত কাজ তাকে করতে হয়, জল আনতে নদীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে স্বামী শাশুড়ির জন্য রান্না করতে হয়। বংশীখণ্ডের দু-একটি পদে রাধার বেদনাঘন বিলাপের মধ্যেও বাঙালির রন্ধনশালার এক চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে— ভাত, ডাল, শাক, ভাজা, ঝোল, অম্বলের গন্ধ বাংলার হেঁশেলে চিরদিন পাওয়া যায়।

সেকালের কিছু প্রচলিত সংস্কারের পরিচয় কবি দেন এভাবে—

"কমণ আসুভক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা।।"

অযাত্রা-কুযাত্রা সম্পর্কিত প্রচলিত সংস্কারের আরও কিছু পরিচয়—

"শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।।....
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।।"—

এই সংস্কার কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগেরই নয়, পুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য বা পরবর্তী কালের সাহিত্যগুলিতেও শুভাশুভের এই সংস্কার দেখা যায়। আজও বঙ্গভূমির গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো মানুষ এইসব প্রাচীন সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকেন।

সমকালীন গ্রাম্যজীবনের কপটতা, অশ্লীলতা কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন কবি। কৃষ্ণ এখানে ভাগবতের কংসমর্দন কৃষ্ণ নয়, অস্থির সমাজের এক লম্পট রাখাল যুবকমাত্র। বনের পথে সে গ্রামের বউয়ের উপর অত্যাচার করে, মামির সঙ্গে দেহসম্ভোগের পাপবোধও তার নেই। রাধা-কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশ ধরা পড়ে।

কৃষ্ণ বলে— 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'— এই সম্বন্ধের কথা সে বলায় রাধা তাকে দেয় অভিশাপ।

কৃষ্ণ রাধাকে 'পামরী ছেনারী নারী' বলে গালি দিয়েছে, রাধাও বাপ তুলে গালি দেয়—

'বান্ধিতে না পারে তোহ্মার বাপে।'

এই দু-একটি সংলাপে গ্রামের স্ত্রীলোকদের নিজস্ব ভাষা ফুটে উঠেছে। তৎকালীন মানুষের মনে বিশ্বাস ছিল—

"পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ— নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল।।"

শুভ কাজে হাত দেবার আগে শুভ তিথি, বার, ক্ষণ বিচার করারও প্রবণতা ছিল। 'শুভ তিথি বার শুভক্ষণে..... বন্দিআঁ সব দেবগণে"— বড়াই রাধার নিকট কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাব উথাপন করেছে।

মন্ত্র-তন্ত্র তুক-তাকের উপর মানুষের আস্থা ছিল। বাণখণ্ডে মূর্ছিতা রাধাকে ঝাড়ফুঁকের দ্বারা কৃষ্ণ পুনরায় জাগিয়ে তোলে—

"ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী।।"

বংশীখণ্ডে বড়াইয়ের পরামর্শ—

"নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘরজাইহ তুহ্মি।।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রূপবর্ণনাত্মক পদের মধ্যে প্রাচীন বাংলাদেশে স্ত্রীলোকের অলংকারব্যবহার ও প্রসাধনচর্চার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা যে বিচিত্র অলংকারে সজ্জিতা, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে না হলেও উৎসব অনুষ্ঠানে 'হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজমুকুতার হার', শ্রবণে রতনকুণ্ডল, কটিদেশে কনককিঙ্কিনী পরত, মাথায় কর্ণাপখোঁপা (কানড়ী) বাঁধত, এমন অনুমান করা যায়।

শক্তিপূজার প্রচলনেরও প্রমাণ মেলে আলোচ্য কাব্যে। রাধাবিরহে বড়াই রাধাকে

বলছে চণ্ডীকে পূজা করে সন্তুষ্ট করতে পারলে কৃষ্ণের দেখা পাবে।

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।"

রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আমরা তৎকালীন সমাজজীবনের যে খণ্ডচিত্র পাই তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বঙ্গদেশ ও বাঙালিমনের ছাপটি যেভাবে পাওয়া যায় চর্যাপদেও সে সুযোগ ছিল না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাঙালি-ভাবচেতনা ও জীবনবোধের প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে।

৪.৫ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাট্যগুণ

আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন হল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এই গ্রন্থ আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ক্রমপর্যায়টি নির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই কাব্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যের পাশাপাশি সাহিত্য হিসাবে একটি বিশিষ্ট গুণ রয়েছে। চরিত সাহিত্যপাঠে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও আলোচনা কাব্যের রস আস্বাদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গুণাদির মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার নাট্যগুণ। এই কাব্যের নাটকীয়তার স্বরূপ বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন একে নাট্যগীতি আখ্যা দান করেছেন।

আমরা জানি, নাটকে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনি এক নিটোল প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। আর এই কাহিনিস্রোতের মধ্যে ঘটনার উত্থান-পতন, পাত্র-পাত্রী, চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ও পরিণতি দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল উপজীব্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাহিনি। কৃষ্ণ এই কাব্যে ষড়ৈশ্বর্যময় কিংবা সচ্চিদানন্দময় পুরুষরূপে মহিমান্বিত গৌরবে চিত্রিত হননি। সমকালীন সাধারণ সমাজের উচ্ছৃঙ্খল লম্পটরূপে তিনি কাব্যে বিশাল অংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাগবত মহাভারত কিংবা পরবর্তী চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব পদসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বরিক প্রেমঘন করুণাময় রূপ দেখা যায় সেই স্বরূপের প্রকাশকে প্রাক্ চৈতন্যপর্বের অবক্ষয়িত মনন মানসিকতার প্রেক্ষিতে আশা করাটা অসমীচীন। অবশ্য কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের সূচনায় জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে ভাগবত অনুসারী ঐতিহ্য ও আদর্শের কথা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের মধ্যভাগে কিংবা পরিণতিতে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই কাব্যের মূল কাহিনি হল রাধা নামে পরস্ত্রীর প্রতি কামনাসক্ত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অত্যাচার এবং পরবর্তীকালে কৃষ্ণবিরাগিণী রাধার কৃষ্ণপ্রেমে মত্ততা এবং পরিণামে প্রিয়বিরহে আকুল বেদনার মধ্য দিয়ে প্রেমিকা নারীর ব্যর্থ জীবনের চিত্র অংকন। এই কাব্যের মধ্যে বংশীখণ্ডের আগে শিষ্ট সভ্য উন্নত রুচিশীল চিন্তা কিংবা আদর্শের কোনো পরিচয় জেগে ওঠেনি। কিন্তু রাধাবিরহ অংশে দেহাতীত প্রেমের এক মহিমাময় সুরতরঙ্গ সমগ্র কাব্যখানিকে অসাধারণ মহত্ত্ব দান করেছে।

রাধা, বড়াই, কৃষ্ণ এই তিন পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে পয়ার, লাচাড়ী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীর মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব-ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করে কাব্যটিকে নাটকীয় চমক দান করা হয়েছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনি এক ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করেছে। আইহন গৃহিণী কিশোরী রাধার 'শিরীষ কুসুম কোঁঅলী' সদৃশ রূপ ও লাবণ্যে মুগ্ধ কৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলনের আশায় ব্যাকুল হয়ে বড়াইয়ের দ্বারস্থ হলেন। এই বড়াইয়ের সক্রিয় মধ্যস্থতায় নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে রিরংসা-প্রবৃত্তি তৃপ্ত হল। কিন্তু ভোগ শেষে বাসি ফুলের মতো রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়। আকুল রাধার ক্রন্দন সমস্ত জগৎকে বিরহকাতর করে তুলল। এই সকরুণ কাহিনি-উপস্থাপনা, বিন্যাস ও রাধা চরিত্র চিত্রণের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে এই কাব্যের নাটকীয়তা। কাহিনিসূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় যে বর্ণনাত্মক ঘটনা, নাট্যরস ও গীতিরস এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে কাব্যকাহিনি অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য ঘটনা কিংবা গীতিরস অপেক্ষা কাব্যে নাট্যরসের প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে। একের উক্তির সঙ্গে অপরের উক্তির সংযোগসূত্র রক্ষা করে কাহিনির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই কবি যেন অজ্ঞাতসারে নাট্যকারসুলভ বস্তুপ্রধান ঘটনাকে আশ্রয় করেছেন। কবির ব্যক্তিসত্তা কাহিনির নেপথ্যে থেকে পাত্র-পাত্রীর ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে কাহিনির মধ্যে নাটকীয় গতিবেগকে প্রবহমান করে তুলেছে। চরিত্র-চিত্রণ, অলংকার প্রয়োগ ও যথাযথ ক্রিয়াশীল সংলাপের মধ্য দিয়ে আলোচ্য কাব্যকাহিনির নাটকীয় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে উঠেছে।

নপুংসক আইহনের স্ত্রী গোপিনী রাধা। সম্পর্কে তিনি কৃষ্ণের মাতুলানী। এ ধরনের গুরুস্থানীয় সম্মানিতা নারীর প্রতি প্রেম নিবেদন এবং সম্ভোগবাসনা জ্ঞাপন অশালীন ও নীতিবিরুদ্ধ। কৃষ্ণের হীন প্রস্তাবকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানিয়ে প্রথমে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেছিলেন রাধা। দূতী বড়াইকে তিনি শুধু তিরস্কারই করেননি, শাস্তিও দিয়েছিলেন। এই ঘটনার মধ্যেই নাটকীয়তা দানা বেঁধে উঠেছে। পরবর্তী ঘটনার জন্য স্বভাবতই তখন কৌতূহল জাগে। কুট্টিনী বুড়ি বড়াইয়ের কাজই হচ্ছে দুইটি মনের মিলনসূত্র বেঁধে দেওয়া। বড়াইয়ের মুখে 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী' 'চন্দ্রাবলী রাহীর' তিন ভুবন বিজয়ী রূপের কথা শুনে ব্যাকুল কৃষ্ণ বড়াইকে দূতী করে রাধার কাছে প্রেরণ করেন। কর্পূরবাসিত তাম্বুল, ফুলমালা ও সন্দেশ সাজিয়ে বড়াই কৃষ্ণের হয়ে প্রণয় প্রস্তাব নিবেদন করে। বড়াইয়ের কথা শুনে মুহূর্তে রাধার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসম্মানবোধ জেগে উঠেছিল। ক্রোধে রাধা, 'হান এ সকল গাএ' তার ঘরে স্বামী আছে, সম্মানিত পদে তার অধিষ্ঠান। অভিজাত স্ত্রীর কণ্ঠ থেকে তাই জেগে ওঠে তীব্র ধিক্কার— 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা, কিন্তু রাধার অপমান ও প্রত্যাখান কৃষ্ণকে একটুকুও নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়নি। ক্রমে কৃষ্ণ রাধার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠলেন। রাধা বুঝতে পারলেন তাঁর রূপযৌবনই কৃষ্ণের মনে রূপতৃষ্ণা-মাদকতা জাগিয়ে তুলেছে। গভীর দুঃখে ও মর্মবেদনায় বড়াইকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন—

"আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো।"—

এখানে রাধার চিত্ত ব্যাকুলতা এক অসামান্য আর্তির প্রকাশকে জাগিয়ে তুলেছে। অসহায় নারী আত্মসম্মান রক্ষা করতে না পেরে নিজেকেই ধিক্কার জানিয়ে বলেন—

"কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী"
আপণার মাঁসে হরিনী জগতের বৈরী।"—

শুধু তাই নয়, আত্মরক্ষার্থে তিনি পালিয়ে বাঁচতে চান। দুঃখিনী রাধা আক্ষেপ করে বলেন—

"পাখীজাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নঞির মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ।।
হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরিজাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।"—

রাধার এই সংলাপের মধ্যে গভীর সংকটে নিপতিত অসহায় নারীর আর্তি ও বেদনা এক চমৎকার নাট্যিক মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণের আহ্বান, রাধার প্রত্যাখ্যান এই পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব ঘটনাকে অপূর্ব নাট্যধর্মী করে তুলেছে। বড়াই সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে কৌতূহলে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। নাটকের প্রাণ যাই হোক্ না কেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দ্বান্দ্বিক সংঘাতই এর মূল বিষয়। সেই দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা বহির্দ্বন্দ্ব যাই হোক না কেন সংলাপই এই দ্বন্দ্বকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করে তোলে এবং ঘটনার ক্রিয়াশীলতাকে তীব্র গতি দান করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সংঘর্ষে বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ জানেন যে তিনি ভগবান এবং কংস বধের জন্যই তিনি মর্তে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীমতি রাধাও জানেন তাঁর মূল প্রকৃতি স্বয়ং লক্ষ্মী। এখানেই বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ যখন সেই সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন রাধা কৃষ্ণের কথায় কর্ণপাতও করেননি। বরং তিনি কৃষ্ণকে বিরক্তভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নটবর কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা। তিনি রাধাকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, রাধা 'নহসি মাউলানী' সম্বন্ধে শ্যালিকা মাত্র। এখানেই দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। এর তীব্র প্রকাশ ঘটেছে কালীয়দমন ও যমুনাখণ্ডে। বাণখণ্ডে নাট্যরস আরও ঘনীভূত হয়েছে। কৃষ্ণের অশিষ্ট আচরণের কথা যশোদার কানে তুললে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ বড়াইয়ের পরামর্শে চন্দ্রাবলীর উদ্দেশ্যে পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন এবং শরাহত মূর্ছিত রাধাকে উদ্দেশ্য করে কৃষ্ণ বললেন—

"মাএর আগে কৈলী আহ্মার খাঁখার।
এবে মরসিল রাধা জিঅ একবার।।"

দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার উপর বলপ্রয়োগ করলেন। নৌকাখণ্ডেও রাধা পরিত্রাণ পাননি। এরপর এল বংশীখণ্ড। বংশীখণ্ড থেকে উভয়ের চরিত্রে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিল। যে রাধা এতদিন ছিলেন কৃষ্ণ বিরাগিণী তিনিই হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ অনুরাগিণী। কিন্তু তখন রাধার প্রতি কৃষ্ণের আর কোনো আকর্ষণ নেই। তখন রাধা চরিত্রের যে

ব্যাকুল আর্তি, অতৃপ্তি ও গগনবিদারী হাহাকার ধ্বনিত হয় তা স্পষ্টই মর্মস্পর্শী। বিরহিণী নারীর চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা প্রেমরসের মধুর সুরমাধুরীকে জাগিয়ে তুলেছে—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।"

কাহ্ন অভিলাষে অতৃপ্তির যে হাহাকার তার বীজ উপ্ত হয়েছিল বাণখণ্ডে। এই খণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তা চরমে পৌঁছেছে। রাধাবিরহ পর্যায়ে কৃষ্ণপ্রেম বিলাসিনী বিরহিণী রাধা যখন বলেন—

"এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।"

শুধু তাই নয়—

"যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ।
বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে
হেনমনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।"

তারপর বিরহাকুল রাধাকে নিয়ে বড়াই গেলেন বৃন্দাবনে। রাধা তখন কৃষ্ণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কৃষ্ণের দেওয়া যে কোনো শাস্তি তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। অবশেষে সুখনিদ্রায় মগ্ন রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ চলে গেলেন মুধুরায়। উপেক্ষিতা বিরহিনীর আকুল আর্তনাদে পরিসমাপ্তি ঘটল কাব্যকাহিনির। কাহিনির গতি, স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য, ঘটনার সংহতিই এমন নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে যা নিঃসন্দেহে নাট্যগীতিমূলক আখ্যান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এবং এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

৪.৬ 'রাধাবিরহ' প্রক্ষিপ্ত কি না বিচার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সর্বশেষ অংশ বা পর্যায় 'রাধাবিরহ'। এই রাধাবিরহ' নামের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নয়। যেহেতু কাব্যের অন্যান্য অংশের প্রত্যেকটির সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে, তাই 'রাধাবিরহে'র সঙ্গে খণ্ড শব্দটির অনুপস্থিতির জন্য অনেকে 'রাধাবিরহ'কে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ধারাবাহিকতা 'রাধাবিরহে' নেই; এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত। ড° বিমানবিহারী মজুমদার সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে যে সমস্ত মন্তব্য করেছে সেগুলি আমরা সূত্রাকারে উল্লেখ করতে পারি।

(ক) 'রাধাবিরহে'র পূর্ববর্তী সকল অংশকে 'খণ্ড' বলা হয়েছে, কিন্তু 'রাধাবিরহে' 'খণ্ড' শব্দটি নেই, তাই সম্ভবত এটি একটি স্বতন্ত্র কাব্য।

(খ) বড়াই চরিত্রের স্বভাব পরিবর্তন। তাঁর মতে 'রাধাবিরহে'র বড়াই রাধার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা। অন্যান্য খণ্ডগুলিতে সে কৃষ্ণের দূতী বা কুট্টিনী মাত্র।

(গ) 'রাধাবিরহ' অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে রাধা-কৃষ্ণের দৈহিক মিলনের পূর্ব প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।

(ঘ) 'রাধাবিরহ' থেকে 'রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে'— এই ছত্রটি উদ্ধার করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে কাব্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় 'রাধাবিরহে'র ভাষা যথেষ্ট আধুনিক।

(ঙ) 'রাধাবিরহে'র আর্থিক পটভূমিকা ভিন্ন। পূর্বে 'দানখণ্ডে' কড়ির হিসাবে লেখা ছিল 'নব লক্ষ কড়ী', কিন্তু 'রাধাবিরহে' রাধার উক্তি 'শতপল সোনা বড়ায়ি, লআঁ সে মেল। প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশ্য চল।'

(চ) 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল।' 'বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ' ইত্যাদি আটটি ভণিতা শুধুমাত্র 'রাধাবিরহে'র আটটি পদেই ব্যবহৃত হয়েছে, পূর্ববর্তী অন্য কোনো খণ্ডে এই ভণিতাগুলো নেই।

এই সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, 'রাধাবিরহ' অধ্যায়ের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত হয়নি বলেই এই অধ্যায়টিকে প্রক্ষিপ্ত বলে চিহ্নিত করা যায় না। লিপিকরদের অনবধানে অনেক ক্ষেত্রেই এইরকম বিশেষ শব্দ বাদ পড়তে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতেই 'কালীয়দমন খণ্ডে'র পরবর্তী খণ্ডটির নাম বাদ পড়েছে। 'যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণ খণ্ড' বসন্তরঞ্জন কর্তৃক শুধুমাত্র 'যমুনাখণ্ড' বলে চিহ্নিত হয়েছে। পৃথক পাঠের মাপকাঠিতে যদি 'রাধাবিরহ' প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহলে জন্ম ও তাম্বুল খণ্ড দুটোকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে রাখতে হয়। কারণ 'দানখণ্ড' থেকে বিভিন্ন খণ্ডের সমাপ্তিবাক্য এরূপ— 'ইতি দানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', ইত্যাদি কিন্তু জন্ম ও তাম্বুল খণ্ডে আছে, 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং' ও 'ইতি তাম্বুলখণ্ডং সমাপ্তং'। তাছাড়া 'রাধাবিরহে'র শেষ পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। সেখানে 'খণ্ড' শব্দটি উপস্থিত থাকলেও থাকতে পারত। তাই 'খণ্ড' শব্দটি না থাকায় 'রাধাবিরহ' কাব্যবহির্ভূত, —এই সিদ্ধান্তের কোনো বলিষ্ঠ ভিত্তি নেই।

'রাধাবিরহ' অংশে বড়াই চরিত্রে কোনো অসঙ্গতি নেই, বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে বলায় প্রমাণিত হয় না যে, কৃষ্ণ বড়াইয়ের অপরিচিত। এই কাব্যে নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবির বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। কখনও কবি নিজে আবার কখনও অন্য চরিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের রূপ বর্ণিত হয়েছে। কবি যেখানে রূপ বর্ণনার অবকাশ পাননি সেখানে নিজেই সুযোগ তৈরি করে নিয়েছেন— প্রাসঙ্গিকতার খুঁটি-নাটির প্রতি তাঁর নজর ছিল না।

বড়াই যে শুধু 'রাধাবিরহ' অংশেই রাধার প্রতি সহানুভূতিশীল, তা নয়, 'বাণখণ্ডে' এবং 'বংশীখণ্ডে'ও রাধার প্রতি বড়াইয়ের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাণখণ্ডে' রাধা কৃষ্ণের পুষ্পবাণে মূর্ছিতা হলে বড়াই রাধার জন্য আকুল হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেছে, আর 'বংশীখণ্ডে' বড়াইয়ের তৎপরতায়ই রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে তার দর্শন লাভ করেছে। সুতরাং 'রাধাবিরহে' বড়াইয়ের আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

'রাধাবিরহে'র বহু স্থানেই রাধা-কৃষ্ণের পূর্ব মিলনের কথা বা প্রসঙ্গ আছে, কখনও তা স্মৃতিবাহিত, কখনও প্রাসঙ্গিক বা সূত্রে উল্লিখিত। যেমন 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' শীর্ষক 'রাধাবিরহে'র দ্বিতীয় পদটিতে কৃষ্ণের রাধা-বদন চুম্বন, বাঁশি বাজানো এবং রতিদানে রাধার অসম্মতির পূর্বস্মৃতি স্বপ্নে ফিরে এসেছে মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক পথে।

এছাড়া 'তাম্বুলখণ্ডে' রাধার কাছে প্রেম প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার জন্য রাধা বড়াইকে চড় মেরেছিল। সেই প্রসঙ্গেরও উল্লেখ আছে 'রাধাবিরহে'।

'রাধাবিরহে'র ভাষা আধুনিক এমন মন্তব্যও ভিত্তিহীন। যদিও 'রাধাবিরহে'র ভাব অন্যান্য খণ্ড অপেক্ষা গভীর ও সংযত, কিন্তু ভাবের গভীরতা ভাষার আধুনিকতা প্রমাণ করে না। তদুপরি 'রাধাবিরহে' আম্হি, তুম্হি, কাহ্নাঞি, দোষেঁ— ইত্যাদি আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণসূচক দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে।

'দানখণ্ডে' কৃষ্ণ রাধার কাছ থেকে 'নবলক্ষকড়ী' দান চেয়েছে, অপরদিকে 'রাধাবিরহে' রাধা বড়াইকে 'শতপল সোনা' উপহার দিতে চেয়েছে। শুধু কড়ি শব্দের অনুল্লেখে 'রাধাবিরহ'কে পৃথক বলে দাবি করা যায় না। 'রাধাবিরহে' রাধা যেমন বড়াইকে চারশত ভার সোনা উপহার দিতে চেয়েছে, তেমনি 'বাণখণ্ডে'ও বড়াইকে 'লাখেকের মুদড়ী' দিতে চেয়েছে। মুদ্রা হিসাবে কড়ির ব্যবহার থাকলেও স্বর্ণোপহার প্রসঙ্গকে অস্বীকার করা যায় না।

'রাধাবিরহে' ব্যবহৃত ভণিতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে সমালোচক কর্তৃক উদ্ধৃত আটটি তথাকথিত ব্যতিক্রমী ভণিতার মধ্যে পাঁচটিই অন্যান্য খণ্ডেও ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি 'বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ'— এই ভণিতা পূর্ববর্তী খণ্ডে দশবার ব্যবহৃত হয়েছে।

গঠনগত দিক থেকেও 'রাধাবিরহ' বিচ্ছিন্ন নয়। কাহিনি গ্রন্থনার পারম্পর্য, চরিত্র নির্মিতি, ভাষাছাঁদ, সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার, পদের শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ— ইত্যাদির দিক থেকে পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির সঙ্গে 'রাধাবিরহে'র অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য বর্তমান।

আবার কাব্যের প্রথমেই কংস নিধনার্থে কৃষ্ণের মর্তে আবির্ভাব— এই প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত। কাব্যের শেষে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই কৃষ্ণের মথুরা গমন ও রাধা বিস্মরণ। ব্যক্তিগত প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করে কৃষ্ণ এখন বৃহত্তর কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। কৃষ্ণের প্রস্থানকে এই ইতিবাচক দিক থেকে বিচার করলে 'রাধাবিরহ'কে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না; বরং তা পূর্বাপর সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষার দিক থেকে যথার্থ বলেই মনে হয়। আর এই ধারাবাহিকতার সূত্রেই 'রাধাবিরহ' অংশ সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়।

৪.৭ বৈষ্ণব পদাবলি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনামূলক আলোচনা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলি উভয়েরই মূল বিষয় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। তাই সংগত কারণেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের মতো সমালোচকদের নজর এড়ায়নি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলির তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গটিও। সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি বিষয়ের অবস্থান দুই যুগে বলে এদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুটোই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় পদাবলির ভাব-ভাষা-চরিত্রবিন্যাস ও রচনাশৈলী সবদিক থেকেই আলাদা— আবার অনেকস্থানে পদকর্তারা বড়ুর কাছ থেকে বহু উপাদানও নিয়েছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা পদাবলি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের ভাষার দিকটা দেখতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মধ্যেই এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ নিহিত আছে। এর ভাষায় আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ পরিস্ফুট। যেমন 'এন' বিভক্তি 'এঁ' হয়ে 'এ' তে পরিণত হয়েছে। আদিস্বরে শ্বাসাঘাত (আনুমতী, আসুখিলী), পদান্তস্থিত অ-কারের উচ্চারণ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। এছাড়া 'আহ্মার', 'তোহ্মার' শব্দের প্রয়োগ বহুবার হয়েছে। অন্যদিকে পদাবলির ভাষার মধ্যে আমরা প্রকৃত আধুনিক বাংলা ভাষার হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি।

শুধু ভাষা নয়, ভাব এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বৈষ্ণব পদাবলির কিছু চরিত্রগত প্রভেদ লক্ষ করা যায়। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'প্রেম' শব্দটি অপরিচিত। প্রেমের পরিবর্তে 'নেহা' শব্দ ব্যবহৃত।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের নাম হিসাবে 'শ্যাম' শব্দের ব্যবহার অনুপস্থিত। পদাবলিতে 'শ্যাম' বহুল প্রচলিত।

(৩) ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস কোথাও 'গাইল' ব্যতীত 'ভণ', 'ভণয়ে', 'কহে', 'কহয়ে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেননি।

(৪) বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র অন্ত্যচরণে ভণিতা ব্যবহার করেছেন, অন্যত্র নয়। পদাবলিতে অন্ত্য, উপান্ত উভয়েই ভণিতার ব্যবহার লক্ষণীয়।

(৫) রাধা এবং চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অভিন্না, পদসাহিত্যে কিন্তু চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা এবং রাধা নায়িকা।

(৬) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কোথাও রাধার ললিতা, বিশাখাদি কোনো সখীর নাম উল্লিখিত হয়নি। দূতী চরিত্র হিসাবে কেবল বড়াইয়ের সাক্ষাৎ পাই। অন্যদিকে পদাবলিতে দূতী চরিত্রের কোনো ভূমিকা নেই।

(৭) শ্রীকৃষ্ণের কোনো সখার নাম বা সখ্যরসের কোনো পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই।

(৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য ভাবের সংমিশ্রণ সমানভাবে বর্তমান। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে ঐশ্বর্যভাবকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

(৯) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের আবির্ভাবের মূলে কংস বধের ঐশ্বর্যমিশ্র কারণটিকে প্রধানভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে।

(১০) রাধা চরিত্রের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণবের রাধা যেখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত আনন্দাংশের হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ মহাভাব স্বরূপা, সেখানে বড়ুর রাধা স্বর্গের নারায়ণের স্বকীয়া নায়িকা লক্ষ্মীর মর্ত রূপ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের 'সম্ভোগ কারণে' তাঁর আবির্ভাব। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 'রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একহি স্বরূপ/লীলারসা আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।' সেখানে লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তই রাধার আবির্ভাব।

(১১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বনাম প্রয়োগে সর্বত্র আহ্মে, তুহ্মে ইত্যাদির ব্যবহার পদাবলির সঙ্গে একটি দূরত্বই সূচিত করে। কৃষ্ণের নাম হিসাবে ব্যবহৃত 'কাহ্নাঞি' শব্দটি পদসাহিত্যে সরলীকৃত হয়ে হয়েছে 'কানাই' 'কানু' ইত্যাদি।

(১২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নায়কের পূর্বরাগই প্রথম দেখানো হয়েছে। সে রাগ আবার রূপজ মোহ জাত, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার বারিসিঞ্চনে তার অঙ্কুরোদ্‌গম। অপরদিকে সমর্থা রতিতে জাত পদাবলির পূর্বরাগ কৃষ্ণ বিষয়ক শব্দমাত্র শ্রবণেই উন্মীলিত হয়েছে। অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা পদাবলিতে বিপ্রলম্ভ হয়েছে। কিন্তু এই বেদনাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম দিয়েছে।

(১৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার বয়সের উল্লেখ রয়েছে— "এগারো বৎসরের বালী।" অপরদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাভাবের বিমূর্ত বিগ্রহ রাধিকার বয়সের উল্লেখ— 'এহো বাহ্য'।

(১৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রূপ বর্ণনা দেহকে অতিক্রম করতে পারেনি। পদাবলির রূপ বর্ণনায় ভক্তি এবং প্রেমের রসায়ন ঘটেছে।

(১৫) বড়ু চণ্ডীদাস রাধিকার পিতামাতার নাম প্রসঙ্গে যথাক্রমে সাগর ও পদুমার নাম উল্লেখ করেছেন। পদসাহিত্যে রাধিকা বৃষভানুনন্দিনী।

(১৬) বৈষ্ণব পদসাহিত্যে রাধিকার রূপচিত্র অঙ্কনে রাধার পরোক্ষে যে ভাববিগ্রহটি প্রকট হয়ে উঠেছে তা ছিল 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। বড়ুর মানসদৃষ্টিতে অনুরূপ কোনো ভাববিগ্রহের প্রতিরূপ ছিল না। তাই তাঁর রাধা একান্তই রক্ত মাংসের মানবী হয়ে ধরা দিয়েছে।

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব-ভাষা-বিষয় পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় এর অনুপ্রেরণামূলে উজ্জ্বলনীলমণিকারের বা চৈতন্যচরিতামৃত কারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যা পদাবলির প্রত্যেক কবিপ্রতিভার মূলে সক্রিয়। অপরদিকে বড়ুর সাহিত্যকৃতিতে জয়দেবের বিলাসকলার কৌতূহলই যেন সজীব হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত রাধা-কৃষ্ণ কাহিনি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা লক্ষ করলে দেখা যায়, এর মূলে কোনো ধর্মীয় প্রেরণা ছিল না।

একমাত্র কাব্যগত প্রেরণা থেকেই শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যে এর প্রচলন শুরু হয়। কবিগণের নিকট এই প্রেমলীলার কাহিনি ছিল একটি বিষয় মাত্র। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে এখানে আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়া স্ফুটতর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গেও এই উক্তি প্রযোজ্য। অধ্যাত্ম সুর অপেক্ষা 'বিলাসকলা'র সুরই এর মধ্যে বেশি বেজেছে। যাকে অনেকে কাব্যবিলাস বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবেরই উত্তরসূরি।

অন্যপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলি উভয় পর্যায়েই দানলীলার শেষাংশে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলির নৌকাবিলাসের কাহিনিগত কিছু কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশের আশ্চর্যজনক সুরগত মিল লক্ষিত হয়। এই পর্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলির বিরহিণী রাধার সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার বিরহ। বংশীখণ্ডে যে প্রগলভা রাধাকে দেখা যায়, বিরহ পর্যায়ে তিনি বিরহে কাতর। শত বেদনা ও আঘাত সত্ত্বেও রাধাকে কখনও স্থূল অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ করতে দেখি না। তিনি যেন আগাগোড়া পদাবলির সুরে বাঁধা। শ্রীকৃষ্ণের শত প্রত্যাঘাতেও রাধা এখানে স্থির, শান্ত ও মার্জিত। তিনি এখানে গোপ রমণী নন, রাধাবিরহ পর্যায়ে তাঁর একমাত্র পরিচয়— বিরহব্যাকুল রাধিকা। এই পর্যায়ে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা পদাবলির রাধার মতোই কৃষ্ণ-মিলনের জন্য অধীর। মিলনের এই ব্যাকুলতা অন্তরের আকুলতা থেকেই সঞ্চারিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহে রাধা বলেন—

"দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় আভাগিনী।।"

রাধার এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনি বৈষ্ণব পদাবলিতেও—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।"

বৈষ্ণব পদাবলিতে চণ্ডীদাসের রাধা যেমন যৌবনে যোগিনী হতে চেয়েছিলেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিরহব্যাকুল রাধা বলেন—

"মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের এই রাধাবিরহ অংশের প্রতি লক্ষ রেখেই প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও পদাবলীর রাধাকে যথাক্রমে বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ব-রাধা ও উত্তর-রাধা বলা চলিতে পারে।" প্রাজ্ঞ সমালোচকের এই প্রাসঙ্গিক মন্তব্য নিঃসংশয়ে মেনে নিতে হয়।

৪.৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা

চর্যাপদের পরেই ভাষাগত পরিণতির সার্থক রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্যগ্রন্থটিই আদি মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের মতো শক্তিশালী কবির হাতে পড়ে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি এবং রচনাশৈলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আপন স্বভাবে ভাস্বর। চর্যাপদের রচনাকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসরের ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যের আর কোনো প্রাচীন গ্রন্থ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। মনে হয় তুর্কি অভিযানের ফলে বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির এবং অন্যান্য স্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুথি পাণ্ডুলিপি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কতিপয় আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতকের পরে লিখিত হলে আরও বেশি পরিমাণে আরবি ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটত, এ অনুমান করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেশি। অনার্য ভাষা থেকে আগত কিছু শব্দ পাওয়া গেছে।

আরবি-ফারসি শব্দ ঃ মজুরি, কামাণ, খরমুজা, মিনতি, গুলাল ইত্যাদি।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ ঃ আগর, আনল, চন্দন, চুয়া, ময়ূর, মাল (মাল্য), মুক্তা, তন্তী, পণ, নীর, বলয়া।

কোল ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ ঃ কদলী, তাম্বুল, ডমরু, লগুড় ইত্যাদি।

দেশি শব্দ ঃ ছোলঙ্গ, টলে, টাভা, টেটন, টেণ্টন, টেটা, লোটলী, ডাকর, ডাল, ডুবিআঁ, টলবল, ডৌহাকু, ঢেউ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্নরূপ।

(১) শব্দে অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ স্পষ্ট।

(২) মহাপ্রাণ এবং আনুনাসিক ধ্বনির অজস্র প্রয়োগ। যেমন আহ্মি, তোহ্মা, কাহ্নাঞিঁ, কথাহোঁ, কভোঁহি ইত্যাদি।

(৩) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে অ-কার আ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন— আতিশয়, আনল, আভাগি, আমৃত, আধিক, আকারণ ইত্যাদি।

(৪) চর্যার অনাদ্য শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত কখনও কখনও পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার রীতি প্রায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন— আন্ধারী < অন্ধকার; আইহন < অভিমন্যু; আথান্তর < অবস্থান্তর; আমান < অমান্য ইত্যাদি।

(৫) ই-কার উ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—
দুগুণ < দ্বিগুণ; দুচারিণী < দ্বিচারিণী।

(৬) উচ্চারণে ই-কার এবং ঈ-কারের পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। যেমন—ই-কার থেকে ঈ-কার, তীন, চুরী, কুমতী, অনুমতী, অসম্মতী ইত্যাদি। আবার ঈ < ই, যেমন- সিতল (শীতল), সিতা (সীতা), সিশের (শীষের) ইত্যাদি।

(৭) ক্ষ > খ অথবা ছ। যেমন— খেমা < ক্ষমা, খঅ < ক্ষয়, ঝুরআ < ক্ষরতি, ছুইআঁ < ক্ষুভিত।

ধ্বনি পরিবর্তনের নিম্নলিখিত সূত্রগুলির প্রয়োগ লক্ষণীয় ঃ

(ক) **বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি ঃ** পরসন = প্রসন্ন, সিনান = স্নান, পরতয় = প্রত্যয়, বারিষা = বর্ষা, বেআকুল = ব্যাকুল, গেয়ান = জ্ঞান, আচরিত = আশ্চর্য।

(খ) **বর্ণ বিপর্যয় ঃ** দহ < হ্রদ, পহুাইল < পঢ়াইলো, আহ্নো = আর + হো।

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির একটি লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীকরণ। যেমন— নাতী < নপ্তৃক, চউথ < চতুর্থ, জীহের < জিহ্বার, পালঙ্কি < পর্যঙ্কিকা, খাটোআল < খট্টপাল।

(ঘ) **স্বতোমুর্ধ্বন্যী ভবন ঃ** কাণ্ডারী < কর্ণধারিকা, ডাহিন < দক্ষিণ।

(ঙ) **সাদৃশ্য ঃ** জরম < জন্ম (করম শব্দের সাদৃশ্যে)

(চ) **মিশ্রণ ঃ** খরল = খর + গরল, গৃহীন = গহন + গভীর।

(ছ) ষোড়শ মাত্রা বিশিষ্ট পাদাকুলক বা চতুষ্পদী থেকে ১৪ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের উৎপত্তি।

বচন— প্রাকৃতে এবং বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত দ্বিবচনের অনুরূপ লতা, মুনি, গুরু প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ই-কার এবং ঈ-কার দীর্ঘ উচ্চারণ প্রবণতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে গণ, সব, জন এবং রা, যোগ করে বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন— দেবগণ, গোপীজন, তরুগণ, সখীসবে, আহ্মারা ইত্যাদি। অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গেও গণ শব্দ যোগ করে বহুবচন করা হয়। যেমন— আভারণগণ, দুখগণ, বাদ্যগণ ইত্যাদি।

লিঙ্গ ঃ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগ। যেমন— উত্তরলী হয়িলী রাহী। বেআকুলী।

কারক বিভক্তি ঃ কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি— ভ্রমর না পাএ বসে, চলি গেলি রাধিকা হরিষে। কর্তৃকারকে এ, এঁ এন বিভক্তি। যেমন—

মাঅক বুয়িল আইহনে, গাইল চণ্ডীদাসে।

কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি। যেমন—

ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে,

এছাড়াও কর্মকারকে ক, কে, রেঁ, এ বিভক্তি এবং গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে কে, রে ইত্যাদি; করণ কারকে এ, এঁ < এন = স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে; সম্বন্ধে ক, র ইত্যাদি বিভক্ত ব্যবহৃত হত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ই, ঈ, উ, ঊ, ন-কার, ণ-কার, য-কার, জ-কার এবং শ, ষ, স ব্যবহারের কোনো বাঁধাধরা রীতি ছিল না। বিভিন্নত্র একই শব্দের ভিন্ন বানানের বিকল্প প্রচলিত ছিল। যেমন— আখি/আখী; উজল/ঊজল; মন/মণ, জান/যান; শীতার

(সীতার); শলিল (সলিল); ষেষ (শেষ) ইত্যাদি।

এবারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করা যেতে পারে ঃ

(১) আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় এবং পাশাপাশি স্বরধ্বনি দুটি দ্বিস্বরতা প্রাপ্ত হয়। যথা— আউলাইল, জিআইবারে।

(২) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ হয় অথবা ক্ষীণ হয়, অর্থাৎ 'হ্ন (ন্হ) > ন', এবং 'হ্ম (ম্হ) > ম'। যেমন কাহ্ন > কান, আহ্মি > আমি।

(৩) (রা) বিভক্তির যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন পদ সৃষ্টি হয়। যথা— আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি।

(৪) (-ইল) - অন্ত অতীতের এবং (-ইব)-অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ)। যেমন— 'মো শুনিলোঁ', 'মোই করিবোঁ'।

(৫) প্রাচীন (-ইঅ-) বিকরণযুক্ত কর্মভাব-বাচ্যের ক্রমশ অপ্রচলন এবং 'যা' ও 'ভূ' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাব-বাচ্যের সমধিক প্রচলন। যেমন— 'ততেকে সুঝাল গেল মোর মহাদানে।'

(৬) অসমাপিকার সহিত 'আছ' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন— লইছে < লই + (আ) ছে, রহিলছে < রহিল + (আ) ছে (= রহিয়াছে)।

(৭) বক্তার প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বোঝাতে 'গিয়া' ও 'সিয়া'— এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদে অনুসর্গরূপে ব্যবহার, যেমন— দেখ গিয়া > দেখ-গে, দেখসিয়া > দেখসে।

৪.৯ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কিত আমাদের সামগ্রিক আলোচনার বক্তব্যকে সংহত করলে আমরা দেখতে পাব যে, কাব্যটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কবির নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কাব্যটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কাব্যের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি আবিষ্কারক কর্তৃক প্রদত্ত। কবি বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যের প্রারম্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু হিসাবে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করলেও কাব্যের পরিণামে তিনি তা বজায় রাখতে পারেননি। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের বিলাসকলারই অনুবর্তন ঘটেছে। কাব্যের মূল চরিত্রগুলিতেও ঐশী মহিমার অভাব রয়েছে, কৃষ্ণ চরিত্রে প্রশ্রয় পেয়েছে অবারিত লাম্পট্য। অবশ্য রাধাবিরহে পৌঁছে রাধা চরিত্রে অনেকাংশেই পদাবলির রাধার চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নাট্যগুণ অনবদ্য সংহতি লাভ করেছে। এই কাব্যকে অনেকে নাট-গীতি-পাঞ্চালিকা হিসাবে অভিহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধরা পড়েছে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী বাংলার বিশৃঙ্খলতা ও অরাজক অবস্থা। এর ভাষায় ফুটে উঠেছে মধ্যবাংলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য।

৪.১০ প্রাসঙ্গিক টীকা

Poleography ঃ প্রাচীন লিপি-বিজ্ঞান।

শ্রীজীব গোস্বামী ঃ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত ও দার্শনিক। বৈষ্ণব-ষড়গোস্বামীর প্রসিদ্ধ একজন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, এগুলোর মধ্যে 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'মাধব মহোৎসব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সৃষ্টির আদি অবস্থা, ধ্রুব প্রহ্লাদ ও প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনলীলা এবং বর্ণাশ্রম ধর্মবিধান ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছেব্রতাচার, বেদান্ত এবং ধর্ম, অর্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা।

সনাতন গোস্বামী ঃ খ্যাতনামা বৈষ্ণব। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। বিখ্যাত শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর ভ্রাতা এবং তিনি বৈষ্ণব-ষড়গোস্বামীর একজন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ বিখ্যাত জীবনীকার। বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেবের জীবনচরিত প্রণেতা হিসাবে তিনি অমর হয়ে আছেন। তিনি রঘুনাথ দাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', এটি বাংলা ভাষায় লেখা।

রায় রামানন্দ ঃ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি। তাঁর রচিত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই নাটক স্বয়ং মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন। 'পদ্যাবলী' নামক গ্রন্থে তাঁর অনেক শ্লোক পাওয়া যায়।

কুট্টিনী ঃ পরপুরুষের সঙ্গে পরনারীর সংযোগকারিণী।

চন্দ্রাবলী ঃ চন্দ্রভানুর কন্যা, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা ও প্রতিপক্ষা যুথেশ্বরী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা এবং চন্দ্রাবলী অভিন্ন চরিত্র।

জয়দেব ঃ 'গীতগোবিন্দ' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গীতিকাব্যের রচয়িতা। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ভোজদেব এবং স্ত্রী পদ্মাবতী। মহাপ্রভু তাঁর গ্রন্থের অন্যতম আস্বাদক ছিলেন।

বিদ্যাপতি ঃ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি। তিনি মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন। 'পুরুষপরীক্ষা', 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী', 'বিবাদসার' প্রভৃতি পুস্তক তাঁর প্রণীত। মৈথিলি ভাষায় রচিত তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ঃ চারখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টি নিরূপণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে নারদ কর্তৃক কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন প্রভৃতি। তৃতীয় খণ্ডে গণেশ ও পরশুরামের উপাখ্যানাদি এবং চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার বিভিন্ন লীলা স্থান পেয়েছে।

ভাগবত ঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্। একে ভাগবতপুরাণও বলা হয়। এটি বেদব্যাস কৃত সংস্কৃত পুরাণ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত।

হ্লাদিনী শক্তি : ঈশ্বর আনন্দরূপ হয়েও সম্বিৎশক্তির উৎসরূপ যে শক্তিদ্বারা সেই আহ্লাদকে নিজে ভোগ করেন এবং অপর সকলকে অনুভব করান, তাই হ্লাদিনী শক্তি।

স্বকীয়া নায়িকা : যাঁরা বিবাহবিধি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আদেশ পালনে তৎপরা এবং যাঁরা শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্য ধর্মে অটলা-তাঁরাই বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে স্বকীয়া নায়িকা নামে খ্যাত। দ্বারকায় ১৬১০৮ মহিষীই স্বকীয়া।

সমর্থারতি : কৃষ্ণ সম্পর্কিত শব্দাদির যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে উৎপন্ন গন্ধমাত্র কুলধর্ম বেদধর্ম ভুলিয়ে দেয়, শুধু তাই নয়, সম্ভোগেচ্ছার পরিবর্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই এই রতিতে প্রবল হয়ে ওঠে। এই রতিকে তাই বলা হয় সান্দ্রতমা; এ রতি জন্ম-জন্মান্তরে নিত্য প্রবহমানা।

স্বরূপশক্তি : স্বরূপানুবন্ধি স্বভাবসিদ্ধ চিচ্ছক্তি। মায়াশক্তিকে পরাভূত করে ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ করাই এঁর কাজ।

৪.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'জন্মখণ্ড'-এর কাহিনি বর্ণনায় পুরাণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। 'রাধাবিরহ' অংশে কৃষ্ণের ভূমিকা কীরূপ? এই অংশে প্রেমের কাব্যের নায়করূপে কৃষ্ণচরিত্রের মূল্যায়ন করুন।

৩। রাধা চরিত্র সৃষ্টিতে বড়ু চণ্ডীদাসের নৈপুণ্য ও সৃষ্টিশীলতা কেমন বিচার করে দেখান।

৪। জন্মখণ্ডে রাধার জন্মসূত্র যে ভাবেই গ্রথিত হোক না কেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রন্থারম্ভে যে পৌরাণিক ভাবসূত্র উদঘাটিত হয়েছে কাব্যে তা অনুসরণ করা হয়নি। এ মন্তব্যটি বিচার করে কাব্যের ঘটনা-বিন্যাস সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করুন।

৫। জন্মখণ্ডটিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সূত্রখণ্ড বলা যায় কি? পরবর্তী খণ্ডগুলিতে ও উপসংহারে জন্মখণ্ডে ধৃত সূত্রের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে কিনা বিচার করুন।

৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা-বড়াই কথোপকথনে বড়াই চরিত্রে একজন সহানুভূতিশীলা ও ব্যাথাতুরা নারীর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। — এই মন্তব্যের আলোকে 'রাধা-বিরহে' বড়াইয়ের ভূমিকা ও চরিত্র পরিস্ফুট করুন।

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনারীতি যেমন অভিনব এর ভাষাভঙ্গি তেমনি অনুপম— বিচার করুন।

৮। রাধাবিরহ খণ্ডে কবি বড়ু চণ্ডীদাস যেভাবে রাধা চরিত্রের বিন্যাস করেছেন তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করুন।

৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডে আখ্যানধর্ম ও নাটকীয় ঘটনাবৈচিত্র্য কতদূর সমন্বয় লাভ করেছে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

১০। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ খণ্ডে গীতিরসের মূর্ছনা ও করুণ বেদনার উচ্ছ্বাস এই কাব্যের স্থূল ঘটনার উপর সূক্ষ্মরসের স্বর্ণজাল বিস্তার করেছে। এই মন্তব্যের আধারে মতামত দিন।

১১। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শুধু পৌরাণিক পটভূমিকা অবলম্বন করেননি, তাতে তাঁর

সমকালীন পরিবেশ ও চরিত্রের সমাবেশ করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। পঠিত অংশ অবলম্বনে বুঝিয়ে দিন।

১২। 'নাটকীয়তায় যার সূচনা, গীতিরসে তার সমাপ্তি' বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ অবলম্বনে এই মন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১৩। 'চরিত্র-চিত্রণ বড়ু চণ্ডীদাসের মহৎ গুণ।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আধারে মন্তব্যটি বিচার করুন।

১৪। রাধাবিরহ খণ্ডে কবি বড়ু চণ্ডীদাসের যে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি, ভূয়োদর্শিতা ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করুন।

১৫। সামগ্রিকভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর কাব্যগুণ বর্ণনা করে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

১৬। কবি বড়ু চণ্ডীদাস চরিত্র নিরপেক্ষ বহিঃ প্রকৃতিকে শ্রীরাধিকার বিরহ-তাপিত হৃদয়-বেদনার পটভূমিতে কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা বিশ্লেষণ করে কবির কাব্যনির্মিতির পরিচয় দিন।

১৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার চর্যাগীতির ভাষার সঙ্গে সাযুজ্য ও অভিনবত্ব নির্দেশ করুন। (সংকেত ঃ শব্দ ও ক্রিয়াপদের রূপ-বৈচিত্র্য ও শব্দের চরিত্র-প্রকৃতি অনুসরণ করুন।)

১৮। পরিবার, সমাজ ও সংস্কার চেতনার বহির্দ্বন্দ্ব অবলুপ্ত হয়ে রাধাবিরহে অন্তঃশীল বেদনার সংহত রূপ সুরময় হয়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্ব ও কাব্যনির্মিতির এই অপূর্ব সমন্বয়ই এই কাব্যের চমৎকারিত্ব। আলোচনা করুন।

১৯। জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসূত্রে ভাগবতের যে আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে, পরবর্তী খণ্ডগুলিতে কৃষ্ণের সেই দৈবী মহিমা অনুপস্থিত— এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য কিনা বিচার করুন।

২০। অন্যান্য 'খণ্ড'র মতো 'রাধাবিরহ' পর্যায়কে 'খণ্ড' নামে চিহ্নিত না করার ভাবগত যুক্তি আছে কিনা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন। 'রাধা-বিরহ' পর্যায়ে পদের ভাবগত পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে টীকা প্রস্তুত করুন।

২১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের জন্মখণ্ডে মূল চরিত্রগুলির যে ভাব ও রূপের পরিচয় দেওয়া আছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

২২। 'রাধাবিরহ' অংশের বিরহিণী রাধার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলির মাথুর পর্যায়ের রাধার একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রস্তুত করুন।

২৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডকে কি কাব্যটির প্রস্তাবনা হিসাবে ধরা যেতে পারে? এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

২৪। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কৃষ্ণ আছে, কিন্তু কীর্তন নেই'। উক্তিটির সমীচীনতা বিচার করুন।

২৫। 'রাধাবিরহ' খণ্ডে রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটি বিশদ করুন।

২৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশটি মূলত গীতিধর্মী। এ বিষয়ে মতামত দিন।

২৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাট্যলক্ষণগুলি উদাহরণ সহযোগে বিশদভাবে উল্লেখ করুন।

২৮। বিদ্যাপতির পদাবলির প্রথম পর্যায়ে নায়কের লীলাচাঞ্চল্য লক্ষণীয়, পদাবলি-চণ্ডীদাসে প্রথম থেকেই নায়িকার আত্মসমাহিত নিবেদনের আর্তি লক্ষণীয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উভয় কবির ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। মন্তব্যটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

২৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাহিনির নাটকীয় গতি ও বিস্তার রাধাবিরহ পর্যায়ে একটা স্থির বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে রসনিটোল ভাবমাধুর্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বনে একটি রসগ্রাহী আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৩০। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা পদাবলির রাধার মতো একটা ভাবের প্রতীকরূপী টাইপ চরিত্র না হয়ে স্বাভাবিক ও মানবিক হয়ে উঠেছে— কাব্য বিশ্লেষণ করে এই অভিমত সমর্থনযোগ্য কি না বিচার করুন।

৩১। 'রাধাবিরহে' কাহিনিকাব্যের বস্তুভার স্খলিত হয়ে কাব্যভাব-মূর্ছনায় সুরময় ও গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে— এই মন্তব্যটি বিশদ করুন এবং বড়ু চণ্ডীদাসের পদ রচনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পঠিত অংশের সাহায্যে কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৩৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশ অবলম্বনে রাধা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৩৪। বংশীখণ্ড যেখানে নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ, রাধাবিরহ অংশ সেখানে গীতিকবিতা।— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিন।

৩৫। 'জন্মখণ্ডে'র গ্রন্থসূত্র ও 'রাধাবিরহে'র মূল সুর বিচার করে বস্তুবিন্যাস ও ভাবের দিক থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণের সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

৩৬। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' পর্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে আপনার অভিমত যুক্তিসহ উপস্থাপিত করুন।

৩৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন/টীকা লিখুন—

(ক) রাধার রূপচিত্রণে বড়ু চণ্ডীদাস।

(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভণিতা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদের বর্ণনা।

(ঘ) জন্মখণ্ডে রাধার উদ্ভবের কারণ।

(ঙ) 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে'— নারায়ণ কেন, কাদের 'ধল কাল দুই কেশ' দিয়েছিলেন? এই দুই কেশ থেকে কী হয়েছিল?

(চ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করুন।

(ছ) বিরহ পর্যায়ে প্রকৃতির ভূমিকা।

(জ) বিরহ পর্যায়ে বড়াইয়ের ভূমিকা।

(ঝ) 'লগনী দণ্ডক' বলতে কী বোঝায়?

৪.১২ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

১। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— কৃষ্ণপদ গোস্বামী।

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৩। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

৪। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য— শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৫। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ— সত্যবতী গিরি।

* * *